মাঘোৎসবের বক্তৃতা

শিবনাথ শাস্ত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ কর্ণওআলিস স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

মাঘোৎসবের বক্তৃতা

ব্রাহ্মধর্মের উদার আদর্শ

আমাদের দেশে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই তিনটি পথ পৃথক্ পৃথক ভাবে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে নিত্য বিরোধ। অদ্বৈতবাদীদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিরোধের কথা চিরপ্রসিদ্ধ। জ্ঞান ও কর্মের উপর ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়। ভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অজামীলের উপাখ্যান তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অজামীল ব্রাহ্মণতনয়, বহু পাপের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণত্ব-চ্যুত হইল, এবং চণ্ডালতনয়াতে আসক্ত হইয়া চণ্ডালপল্লীতে গিয়া বাস করিল। অবশেষে অজামীলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। চণ্ডালীর গর্ভে অজামীলের নারায়ণ নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহাকে অজামীল বড় স্নেহ করিত। মৃত্যুসময়ে অজামীল তাহাকে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মরিয়া গেল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার আত্মাকে লইয়া যমদূতে ও বিষ্ণুদূতে বিষম কলহ উপস্থিত হইল। যমদূতেরা অজামীলকে মহাপাপী বলিয়া নরকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে বিষ্ণুদূতেরা তাহাদিগের নিকট হইতে অজামীলের আত্মাকে কাড়িয়া লইতে আসিল। তাহারা যমদূতদিগকে বলিল, 'তোমরা এ ব্যক্তিকে পাপী বলিতেছ; ভাল, তোমরা ধর্ম কাহাকে বল?" যমদূতেরা কিছু বিপদে পড়িল। তখন বিষ্ণুদূতেরা বলিল, "তোমাদের ধর্মরাজ যমের নিকট হইতে ধর্মের লক্ষণ জানিয়া এস।" তাহারা জানিয়া আসিয়া বলিল, "বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের আচরণ করাই ধর্ম।" বিষ্ণুদূতেরা বলিল, "ওরে মূর্খ! তাহাতে কি ধর্ম হয়? তদ্দ্বারা কি মানব-হৃদয়ে পাপের বীজ নষ্ট হয়? ভক্তির দ্বারাই পাপের বীজ নষ্ট হয়।"

এই উপাখ্যানে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, ভক্তির পথই মুক্তির একমাত্র পথ।

তৎপরে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধের কথা সকলেই জানেন, ইহা কর্ম ও ভক্তির বিরোধ মাত্র। মহাত্মা চৈতন্য তাঁহার সময়ের বহুপ্রচলিত তান্ত্রিক আচরণের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আপনার সমুদয় চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বহুকাল হইতে এ দেশে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম এই পথত্রয়ের মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম এই তিনের সামঞ্জস্য করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম বলেন, ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে এই তিনেরই সহায়তা চাই। মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন, "তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমগ্র মন, সমগ্র হৃদয় ও সমগ্র শক্তি দিয়া ভালবাস।" এই উপদেশেও আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছার সামঞ্জস্য দেখিতেছি। ফলতঃ প্রকৃত প্রেমের ধর্মে এই তিন পথের বিরোধ নাই।

ব্রাহ্মধর্মের গৌরব এই যে, যদিও ইহা দুর্বল ও ক্ষীণ তথাপি এই আশ্চর্য কথা বলিতেছে যে, মানব সাক্ষাৎ অব্যবহিত ভাবে প্রভু পরমেশ্বরের নিকটবর্তী হইবে। ইহাই যদি ব্রাহ্মধর্মের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কিরূপে এই লক্ষ্য চরিতার্থ হয়। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই তিন একত্র না হইলে পরমেশ্বরের ভাব সম্পূর্ণ রূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না।

জ্ঞান কি শিক্ষা দেয়? যখন জগতের মূলে যাই, যখন আত্মতত্ত্ব আলোচনা করি, যখন বিষয়-কোলাহল হইতে দূরে থাকি, তখন জ্ঞান আমাদিগকে কোন্ সত্য, ঈশ্বরের কোন্ ভাব শিক্ষা দেয়? জ্ঞান বলে, তিনি সার, তিনি সত্যম্। যতক্ষণ না এইরূপে

আপনার মধ্যে ডুবিয়া যাই, ততক্ষণ বাহিরে কোলাহলের মধ্যেই সার দেখি।

আপনার মধ্যে ডুবিয়া ঈশ্বরকে সার ও মহাশক্তি বলিয়া বুঝিলাম, তাহাতেই কি যথেষ্ট হইল? না, আমার হৃদয় আরও কিছু চায়। আমি তাঁহাকে কেবল সত্তা মাত্র জানিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না, আমি তাঁহাকে প্রেমময় পুরুষ রূপে চাই। ইহার পর প্রেমের চক্ষে যখন দেখি, তখন দেখিতে পাই, যিনি জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ শক্তি রূপে উপলব্ধ হইতেছিলেন, তিনি উদার প্রেম।

ইহাতেও আমি সন্তুষ্ট হই না। তাঁহাকে আরও নিকটে চাই। তিনি একজন আছেন, তাঁহার প্রেমও আছে, কিন্তু তাহা হইলেও ত তিনি দূরে থাকিতে পারেন। আমার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে। ইচ্ছার দিক দিয়াও তাঁহাকে চাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার যোগ আছে।

তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময়, ইচ্ছাময় পুরুষ— এই তিনটি না জানিলে ঈশ্বরের ভাব আমাদের আত্মার সম্বন্ধে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা মানবাত্মাকে জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন ইহা আপনার পথে— চিন্তার পথে— অগ্রসর হইতে হইতে অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী যেমন সমুদ্রে বিলীন হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায়, ইহা সেইরূপ নহে; কিন্তু ঐকতান বাদনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত যন্ত্র মিশিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও যেরূপ এক সুর বাজায়, সেইরূপ। সেইরূপ আমাদের মানবীয় প্রেম তখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, যখন উহা বিকশিত হইতে হইতে জগতের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর-প্রেমের সঙ্গে মিলিয়া যায়, যখন সেই প্রেম

আমাদের প্রেমকে চালিত করে। সুবিখ্যাত এমার্‌সন বলিয়াছেন, ধর্ম, উপদেশ, সংস্কার, সংশোধন এ সমুদায়ের একই লক্ষ্য— "It is engaging us to obey." অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির যে অসামঞ্জস্য বা বিরুদ্ধভাব তাহাকে ঘুচাইয়া দেওয়া। ঈশ্বরের প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতি মিশিয়া যাওয়া। মিশিয়া যাওয়া কিরূপ? না, ঈশ্বরের যাহা প্রিয় কার্য তাহাই আমার প্রিয় কার্য। অর্থাৎ হৃদয়ের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে যে, জগতে যাহা কিছু হিতকর, যাহা কিছু জীবের পক্ষে কল্যাণকর, তাহাতেই অনুরাগ; অনন্ত মহাশক্তির যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই আমার প্রাণে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন, সকল প্রকার অধীনতাতেই মানবাত্মা অসুখী, কিন্তু এমন একটি স্থান আছে, যেখানে মানুষ অধীনতাই চায়, তাহাতেই সুখ পায়, সে স্থান ঈশ্বর-প্রেম। ইহার গূঢ় অর্থ এই যে, প্রেম সেই বস্তু যাহাতে অধীনতাকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সুখ দিতে পারে, ইহাই প্রেমের মহত্ত্ব। যাহার প্রেম আছে, সে স্বভাবতই সমস্ত সৎকার্য করে, আনন্দে ঈশ্বরের বিধি ও ইচ্ছা পালন করে, অথচ সে মনে করে, মৎস্য যেমন জল-মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সেও সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তৃতীয়ত, মানব-প্রকৃতি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা মিলিয়া না যায়, যতক্ষণ ঈশ্বরের মহতী ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ইচ্ছা এক সুরে না বাজে। সেইদিন মানুষ ঠিক সত্য পথে দাঁড়াইতে পারিবে, যেদিন মানুষ বুঝিবে যে, এই পৃথিবীতে এমন একটিও পরমাণু নাই, যাহার গতি সত্যের দিকে নয়। যদি সৃষ্টিকর্তা জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা-পূর্ণ হন, যদি তিনি মঙ্গল-ইচ্ছাময় হন, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য, ধর্মকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই তিনটি যখন মিলে তখন বড় আশ্চর্য দেখি যে, একটি অপরটিকে উৎপন্ন ও প্রবল করে। তখন ভাবি, জগতে এই তিন পথের মধ্যে কেন বিরোধ? প্রথমত, জ্ঞানের দ্বারা প্রেমের উৎপত্তি হয়। যখন প্রেম-রঞ্জিত জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বস্তুর দিকে দেখি, তখন দেখিতে দেখিতে প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়। আবার প্রেম জ্ঞানকে উৎপন্ন করে। হৃদয়ের ও আত্মার গূঢ় তত্ত্বসকল সম্বন্ধে এ কথা অতীব সত্য যে, যাহার প্রেম নাই, সে অন্ধ, তাহার জ্ঞানও নাই। প্রেম-বিহীন হস্তে সে-সকল বিষয়কে স্পর্শ কর, দেখিবে অমনি তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এমন কতবার অনুভব করিয়াছি যে, পূর্বে যে-সকল কথা উপরে উপরে দেখিতেছিলাম, হঠাৎ প্রেমের আবির্ভাব হওয়াতে সকলই অপূর্ব দেখিলাম, প্রকৃত জ্ঞান হইল। যাঁহারা কেবল জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, প্রেমের চর্চা করেন নাই, তাঁহারা প্রেমহীনতা-বশত এমন কার্য করিয়া ফেলেন যাহাতে সামাজিক কর্তব্যের সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। যাহার যাহা নাই, সে তাহা দেখিবে কেন? নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক নরনারীর হৃদয়ের পবিত্রতার মর্ম কি বুঝিবে?

আবার জ্ঞান ও প্রেম মিলিত হইয়া প্রকৃত ভাবে চলিলে ইচ্ছা বা কার্যকে উৎপন্ন ও প্রবল করে। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ। ইহা সর্বদা লক্ষ্যস্থলে রাখিতে হইবে। আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রস্ফুটিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি কোথাও কাহারও দুঃখ দূর করিবার প্রয়োজন থাকে, যদি কোথাও কাহাকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা এই দেশে। দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে, দারিদ্র্যের যন্ত্রনায়, বিধবার হাহাকারে দেশ আজ পূর্ণ—আমাদের কি করিবার কিছু নাই? তোমরা সেই মহাশক্তির ও মহতী ইচ্ছার সহিত

নিজের ইচ্ছা মিশাইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যে ধর্ম তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, যে ধর্মে জগতের পরিত্রাণ হইবে, তাহার জয় হউক।

৪ মাঘ ১৮০৫ শক। ১৮৮৪ খ্রী

ধর্মপ্রচারের নিগূঢ় কথা

বর্তমান সময়ে প্রচারের কি কি বিঘ্ন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মপ্রচারের যত বিঘ্ন, এত আর কোনও সময়ে ছিল না। বর্তমান সময়ে যেমন বহু অনুকূল উপায় বিদ্যমান আছে, তেমনি ইহার প্রতিকূল কারণও অত্যন্ত অধিক। প্রাচীন কালের ধর্ম-সকল এত ব্যাপ্ত কেন? তাহার কারণ এই যে, সে সময়ে যে-সকল সুবিধা ছিল এক্ষণে তাহা নাই। তখন প্রায় প্রত্যেক ধর্মপ্রচারক মহাজনই অলৌকিক ক্রিয়াসকল প্রদর্শন করিয়া লোকের মন আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতেন। খ্রীষ্ট পাঁচখানি রুটি দিয়া পাঁচ সহস্র লোককে খাওয়াইলেন, চৈতন্য কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে রোগ-মুক্ত করিলেন, ইত্যাদি। এইরূপ নানাপ্রকার অলৌকিক কার্যের যোগ থাকাতে লোকের মন সহজে তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইত; লোকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মান্য করিত, সুতরাং তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের বিশেষ সুবিধা ছিল। বিজ্ঞানালোকিত ঊনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা ধর্মপ্রচারের সাহায্য হয় না। বরং যাহারা এই প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে পারে বলিয়া প্রকাশ করে, লোকে তাহাদের উপর আরও অধিক সন্দেহ করে। যে কোনও ব্যাপারের কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারে না, সে সম্বন্ধেও এখনকার লোকে মনে করে যে, অবশ্য কোনও নৈসর্গিক কারণ বিদ্যমান আছে। যদি আজ কেহ বলে যে. "আমি এখানে বসিয়া আমেরিকার সংবাদ বলিতে পারি", "ভাঙা জিনিস জোড়া দিতে পারি", তবে লোকে বলিবে যে, ইহার অবশ্য কোনও নৈসর্গিক কারণ আছে যাহার সাহায্যে সকলেই ইহা করিতে পারে। বর্তমান সময়ে এই সুবিধাটি নাই।

দ্বিতীয় কারণ, প্রাচীন সময়ে নাস্তিকতার ক্ষমতা এত প্রবল ছিল না। নাস্তিকতা যে ছিল না তাহা নহে। এতদ্দেশে চার্বাকদিগের মধ্যে এবং প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেও নাস্তিকতা ছিল, কিন্তু সে সময়ে ও বর্তমান সময়ে প্রভেদ এই যে, তখন তাহারা আপনাদিগের মত প্রকাশ করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে তাহারা প্রকাশ্য ভাবে তর্ক দ্বারা, পুস্তক প্রচার দ্বারা, নানাপ্রকার নাস্তিকতা প্রচার করিতেছে। জগতের নাস্তিকগণ এখন যেরূপ দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিতেছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। বিলাতে সেকুলারিস্ট বলিয়া নাস্তিক-দিগের এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা নাস্তিকতা প্রচারের জন্য বর্তমান ধর্মসমাজের ন্যায় নিয়মিত প্রচারক নিযুক্ত করিয়া কার্য করিতেছে। নাস্তিকতা এখন যেমন প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। শিক্ষিতদিগের শীর্ষস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারা পর্যন্ত এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নাস্তিকতার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। বর্তমান সময়ে ধর্মপ্রচারের এই এক ভয়ানক বিঘ্ন।

তৃতীয় কারণ, বর্তমান সময়ে যেমন শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারণ করাও কঠিন হইতে কঠিনতর ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। জীবন-সংগ্রাম বৎসরের পর বৎসর কঠিনতর হইয়া পড়িতেছে। এই যে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হইতেছে, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিবিধ ভোগ্য বস্তু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে ভয়ানক পরিশ্রম ও কর্ম-শীলতা বাড়িতেছে, ইহাতে ফল এই হইতেছে যে, লোকের আধ্যাত্মিক চিন্তা ম্লান হইয়া বৈষয়িক চিন্তা বাড়িতেছে। আধ্যাত্মিক চিন্তা হইবে কিরূপে? যে ব্যক্তি সামান্য উদরান্নের জন্য বার ঘণ্টা অবিশ্রান্ত খাটে তাহার আর ধর্ম চিন্তার অবসর কোথায়? পরমেশ্বরের কার্য সাধনের

জন্য জীবনধারণ উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার কার্যই লক্ষ্য, এই আসল কথা। কিন্তু উপলক্ষ্যেই যদি সময় কাটিয়া যায় তবে আর লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে কখন? বর্তমান সময়ে কেবল যে মানুষ পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না তাহা নহে, কিন্তু মনের ও হৃদয়ের সমুদয় কোমল ভাব, সমুদয় দেবভাব শুষ্ক হইয়া যায়। মানব-হৃদয় গুরুতর কায়িক শ্রমে পশুভাবাপন্ন হইয়া যায়। ইংলণ্ডে এইজন্য অনেক চিন্তার পর অনেক ভদ্রলোক শ্রমজীবীদের চিত্রশালা প্রভৃতি নানা সুন্দর সুন্দর স্থানে লইয়া যাইবার জন্য সভা স্থাপন করিয়াছেন। অনেকে বলিতে পারেন, ইহার জন্য আবার অর্থব্যয় কেন? শ্রমজীবীদিগকে আবার ছবি দেখাইবার আবশ্যকতা কি? ইহাতে কি মহৎ উপকার হয়? ইহার উত্তর এই, নিরন্তর কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিয়া মনের কমনীয় ভাবসকল কঠিন হইয়া যায়, ইহারই জন্য ইহাদিগকে এরূপ স্থানে মধ্যে মধ্যে লইয়া যাওয়া আবশ্যক, যেখানে চিত্তহারী মনোহর কমনীয় চিত্রসকল দেখিয়া প্রাণ একটুকু কোমল হইতে পারে। মানব-হৃদয় আগে কোমল হইলে তবে ত ঈশ্বরের কাছে যাইবে।

চতুর্থ কারণ, বর্তমান সময়ে নানা কারণে মানুষের অহমিকা বাড়িতেছে। যদি এ পর্যন্ত ধর্মের কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে এই বুঝিয়াছি যে, ধর্মের ভিত্তি বিনয়; যেখানে অহমিকা, সেইখানে ধর্ম তিষ্টিতে পারে না। এই যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের অদ্ভুত শক্তিসকল প্রকাশ পাইতেছে, বিজ্ঞানের চর্চা হইতেছে, ইহাতে মানুষের অহং-বুদ্ধি বাড়িয়া যাইতেছে; অর্থাৎ মানুষ সব করিতে পারে, এই ভ্রম জন্মিতেছে। বর্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ মদান্ধ পণ্ডিত বলিতেছেন, "The Heavens declare the glory of Newton, and not of God." প্রার্থনার বিরুদ্ধে তাঁহারা বলিতেছেন যে, প্রার্থনায় যদি মানুষ ভাল হয়,

তবে তাহা ত ঈশ্বরের দ্বারা নহে, কিন্তু সে নিজে ভাল হইতে চেষ্টা করে বলিয়া। যাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্মকে মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা বলেন, মানুষ আপনি আপনার উন্নতি করিতেছে। মানুষ আকাশের সৌদামিনীকে ধরিয়া তাহার দ্বারা নানাপ্রকার কার্য করাইয়া লইতেছে; জল ও আগুনকে ধরিয়া সহস্র যোজন পথ যান বহন করাইতেছে। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, মানুষের শক্তি অপরিসীম। কিন্তু প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতির শক্তিকে সম্যক্ অনুভব করিতে পারে নাই। তাই তাহারা নবোদিত মেঘের ঘর্ঘরধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহাকে ইন্দ্র ভাবিয়া পূজা করিয়াছে; পূর্বদিক্ রঞ্জিত করিয়া প্রাতঃসূর্যকে উদিত হইতে দেখিয়া তাহাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিয়াছে। তখন মানব-মন বিনয়ী ছিল; সুতরাং ধর্মপ্রচারের সুবিধা ছিল। এখন অহমিকার উষ্মা মানব-মনে ধর্মভাবকে জমিতে দেয় না। শিশির তখনই জমে, যখন সেই পদার্থের উষ্ণতা চলিয়া যায়। সেইরূপ মানব-মনের অহমিকা যখন চলিয়া যায়, তখনই তাহাতে বিনয়ের বায়ু লাগিয়া ভক্তি-শিশির জন্মে। প্রকৃত জ্ঞানে গভীরতা বিনয়ই আনয়ন করে; অতএব এই অহমিকা যে জ্ঞানাভিমানের ফল মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদ্যাবধি যে-সকল মহাত্মা ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি বিষয় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপনার নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই। বুদ্ধ, যীশু, সক্রেটিস, মহম্মদ, ইঁহারা কেহ কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহারা পথে ঘাটে যাহা বলিয়াছিলেন, লোকে তাহাই যত্ন-পূর্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। আর আমরা বিজ্ঞাপনের উপর বিজ্ঞাপন দিই, তাহাতেও যদি না হয়, তবে দামামা তূরী ভেরী নিনাদ করিয়া লোক ডাকিয়া কত লক্ষ কথা বলি। কিন্তু কেহ তাহা মনে রাখে

না। আমরা যাহা বলি, মনে করি মুক্তা, কিন্তু সব যেন খই হইয়া উড়িয়া যায়। আর তাঁহাদের মুখ দিয়া যে থুথু পড়িয়াছিল, তাহাই ভূমিতে পড়িয়া যেন মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, "চুরি করিও না", আমরা কি বলি, "চুরি কর" ? তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "পরনিন্দা করিও না", আমরা কি বলি, "প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন পরনিন্দা কর" ? তাঁহারা বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকে ভালবাস", আমরা কি বলি, "শয়তানকে ভালবাস" ? বরং এ কথাই সত্য যে আমরা মুখে তাঁহাদের অপেক্ষাও বড় কথা বলিয়া থাকি। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "তুমি আপনার প্রতিবাসীকে আপনার সমান ভালবাস"। আমরা বলি, "আপনার অপেক্ষা অধিক ভালবাস"। মুখে বলিলে কি হইবে ? সেই সামান্য সূত্রধরের পুত্র, যিনি গাধায় চড়িয়া বেড়াইতেন, লোকে তাঁহার কথা মুক্তাফলের ন্যায় যত্ন করিয়া রাখিয়াছে। সিদ্ধার্থ রাজার পুত্র ছিলেন, কিন্তু শুদ্ধোদনের পুত্র বলিয়া তাঁহার সম্মান নয়, কিন্তু সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলিয়া তিনি জগতের লোকের ভক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যে এমন এক রক্ত প্রবাহিত যে, সকল মহাজনকেই যেন এক পরিবার বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়।

ইঁহারা যে এত বড় হইয়াছেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের প্রাণে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। দুর্বল-প্রকৃতি ও ভীরুর স্বভাব এই, সবলের আশ্রয় গ্রহণ কর। দুর্বল যদি সবলকে দেখে, তাহা হইলে তাহার প্রাণে সাহস ও আশা বাড়িয়া যায়, বিশ্বাসীকে দেখিলে অবিশ্বাসীর আশা হয়, বিশ্বাস হয়, ভরসা হয়। তাই এই সকল মহাজনের প্রাণের জ্বলন্ত বিশ্বাস দেখিয়া অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাসের উদয় হইয়াছে। তাঁহারা যে-সকল সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, জীবনকে সেই সকল সত্য

একেবারে অধিকার করিয়াছিল, সেই সত্যের জন্য সাংসারিক সুখ ও জীবনের আর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি লন। যে-সকল লোক সমাজে থাকিলে, সংসারের কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে কত বড়লোক হইতে পারিতেন, এমন কত লোক সকল সুখে বিসর্জন দিয়া সত্য প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সেণ্ট পল ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত না হইলে কত বড় লোক হইতে পারিতেন। তিনি যৌবনকালে সকল সুখসৌভাগ্যের আশা ত্যাগ করিয়া স্বহস্তে তাঁবু সেলাই করিয়া তিনবার সমুদ্রে ডুবিয়া একমাত্র সত্য প্রচারের জন্য সমুদয় সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানকীর ন্যায় বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষা দিয়া ছিলেন, তাঁহারা মানব-হৃদয়ে দেবভাবের সাক্ষী দিয়াছিলেন। যেমন প্রাতঃকালের সূর্যকিরণে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ইঁহাদের ধর্মভাবের কিরণে মানব-হৃদয়ের সাধুভাবসকল বিকশিত হয়। ইঁহাদের প্রেমে লোক আগে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার পর তাঁহাদের কথার দাস হইয়াছে। যাহাকে ঘৃণা করি, সে যদি চিৎকার করিয়া গলা ভাঙে আর সপ্তম স্বর্গের কথা বলে, তথাপি তাহার কথা মানব-মনে কোনও শক্তি উৎপন্ন করে না। আর যিনি প্রেমে আমার কঠিন গ্রীবাকে নত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য দেখাইয়া আমার নীচ প্রকৃতিকে লজ্জা দিয়াছেন, তাঁহার ভগ্ন কণ্ঠের দুইটি কথা আমার প্রাণ হরণ করে।

তৎপরে জীবে দয়া। জগতে যত সাধু মহাজন ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, সকলেই জীবের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। মানুষকে ভালবাসিলে, তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে যেমন মন কাড়িয়া লওয়া যায়, তাহাদিগকে যেরূপ বশীভূত ও অনুগত করা যায়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। মহম্মদ যখন পৃথিবীর বড় বড় রাজাদের

নিকটে এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন যে, “তোমরা সকলে শ্রবণ কর, এই সত্যধর্ম জগতে প্রচার হইয়াছে, এক বই আর উপাস্য নাই। যদি মুক্তি চাও, তবে এই ধর্মের শরণাগত হও।” মিশর দেশের রাজা ইহা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন, এ কি ব্যাপার, এ ত বড় সহজ লোক নহে। এই ভাবিয়া উপঢৌকন দিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “মহারাজ! যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা আর কখনও দেখি নাই। হাজারটি মাথা না কটিলে তরবারি কখনও মহম্মদের মাথায় পৌছিবে না।” তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এত অনুগত হইয়াছিল যে, যদি মহম্মদকে কেহ কাটিতে চাহিত, সহস্র লোক তাঁহাকে বাঁচাইতে স্বীয় প্রাণ দিতে অগ্রসর হইত। কি প্রকারে মহম্মদ এরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন? ইহার কারণ এই, তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। একবার একজন পুত্র-শোকে অধীরা হইয়া কাঁদিতেছিল, মহম্মদ দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিলেন, “মা, আজ হইতে তুমি আমার মা হইলে।”

ছোট হরিদাস নামে চৈতন্যের একজন শিষ্য ছিলেন। একবার কোনও অপরাধের জন্য চৈতন্য তাঁহাকে “মুখ দেখিব না” বলিয়া তিরস্কার করিলেন। এই দুঃখে ছোট হরিদাস প্রাণত্যাগ করিলেন। কি আশ্চর্য! তিনি মুখ দেখিবেন না বলাতে প্রাণধারণ করিতে ইচ্ছা হইল না!

এত ভালবাসা এই সকল লোক কেন পাইয়াছেন? কেবল ভালবাসা দিয়াছেন বলিয়া। বুদ্ধদেব সাধনের সময়ে যখন নির্জনে গেলেন, বনে বনে কঠোর তপস্যা দ্বারা যখন সিদ্ধ হইলেন, তখন অনায়াসেই সেই নির্জন বনে থাকিয়া সাধনার ফল উপভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা পারিলেন না, সজনে আসিলেন। সত্যরত্ন উদ্ধারের জন্য নির্জনে গেলেন, আবার তাহা বিতরণের জন্য সজনে

আসিলেন। তাঁহার ধর্ম জীবের প্রতি দয়া, দীনজনে ভালবাসা প্রভৃতি আকার ধারণ করিল।

এইরূপে যত মহাজন ধর্মপ্রচার করিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের ধর্ম দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইজন্যই তাঁহারা জগতের দুঃখীদের প্রাণ হরণ করিতে পারিয়াছেন। যে ধর্ম কেবল সংসার ছাড়িতে বলে, যে ধর্ম জগতের দুঃখে উদাসীন হইতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম কখনও বহুল প্রচার হইতে পারে না। এইজন্য যত ধর্ম প্রচার হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই দুঃখীর দুঃখ দূর কবিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাড্‌লার নাস্তিকতা শ্রমজীবীদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে এইজন্য যে, তাঁহারা ধনীর অত্যাচার হইতে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। দরিদ্রেরা দেখিতেছে, ইঁহারা তাহাদের যথার্থ বন্ধু। আয়র্লণ্ডে কত লোক অনাহারে মরিতেছে, ধর্মাচার্যেরা তাহার প্রতি উদাসীন, তাহাদের জন্য কোনও দিন প্রার্থনা হয় না, অথচ নিয়মিত রূপে মহারানী ও তাঁহার পরিবারের জন্য প্রার্থনা হইতেছে। এইজন্য তাহাদের যাজকদের কথা আর কেহ শুনিতে চায় না। জীবে দয়া চাই। যদি জীবে দয়া না থাকে, জগতের কোটি কোটি দুঃখীকে যদি ঘৃণা কর, তবে ধর্মপ্রচার করিবে কাহার কাছে ?

জগতের ধর্মপ্রচারক মহাজনদিগের মধ্যে আর একটি ভাব দেখিতে পাই, তাহা উদারতা। তাঁহারা সকল ধর্মের মধ্যে সার যাহা আছে, তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। একজন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন, "মহাজনগণের উদর বড়" অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা খুব প্রবল ছিল। ইঁহারা যখন জনসমাজে বিচরণ করিয়াছেন, তখন লোকের মধ্যে যাহা কিছু ভাল পাইয়াছেন, তাহাই শোষক কাগজের ন্যায়

শুষিয়া লইয়াছেন। মৃত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় বাইবেলের অতি নিগূঢ় কথা-সকল বলিতেন, অথচ তিনি কখনও বাইবেল পাঠ করেন নাই। পৃথিবীর মহাজনদিগকে এমার্সন মানবের প্রতিনিধি বলিয়াছেন; এইজন্য যে, তাঁহারা চারিদিকের জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। সেই ধর্মই প্রবল হয়, যাহার উদার ভাবে সত্য গ্রহণের শক্তি আছে। যে ধর্ম গণ্ডী দিয়া থাকে, তাহা দাঁড়াইবে না। কিন্তু অনেক সময়ে এইরূপ শুষিয়া লইতে গিয়া অনেক ধর্মের মৃত্যু হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল ধর্মের বিশেষভাব ঘুচিয়া গিয়া, তাহাতে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের দেশে নানক প্রভৃতি অনেকেই একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কুসংস্কারের সহিত আলিঙ্গন করিতে গিয়া, তাহার মধ্যে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছেন।

এই ব্রাহ্মসমাজ বর্তমান সময়ে অনেক মহা সত্য জগতে প্রচার করিতেছেন; কিন্তু যেদিন এই সমাজ চতুর্দিকের কুসংস্কারের সহিত মিত্রতা করিতে গিয়া আপন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে, সেই দিন এই সমাজের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে, বিশ্বাস, সত্যের সাক্ষ্য, জীবে দয়া ও উদারতা এই চারিটি ছিল বলিয়াই ধর্মপ্রচার হইতে পারিয়াছে।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের পথে বড় বিঘ্ন। চিরাগত প্রথার সহিত সংগ্রাম করিয়া, নব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে নাস্তিকতা আসিতেছে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, চারিদিকে যে-সকল নূতন সমাজ ধর্মের নাম দিয়া অধর্ম ও পাপকে প্রশ্রয় দিতেছে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, সত্য ধর্ম প্রচার করিতে হইবে— এ বড় গুরুতর ভার। ব্রাহ্ম-সমাজ, আজ একবার বিশ্বাস-নয়নে দেখ, কি আশ্চর্য, কি মহৎ, কি উচ্চ কার্যের ভার তোমার উপর অর্পিত হইয়াছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র লোক নূতন শিক্ষার প্রভাবে বিকৃত হইয়া দেশকে কলঙ্কিত করিতেছে।

ইহার মধ্যে দুর্বল সমাজ তুমি, শিশুর ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই, ঈশ্বরকে ছাড়িও না, পাপতাপ পরিহার কর।" যাহারা মৃত ধর্মের শব বহিতেছে, তাহাদিগকে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করিতে তুমি দায়ী। সংসারে থাকিলে যে ধর্ম হয়, তাহা শিক্ষা দিতে হইবে। সংসারে থাকিলে যে রিপু দমন হয় না, পাপ প্রলোভনের উপরে যে জয়লাভ করা যায় না, তাহা নহে, বরং এ কথাই সত্য যে, সংসারই ধর্মসাধনের স্থান। যদি পরমসুন্দর পরমেশ্বরের আভাস পাইতে চাও, তবে হে মানব! যেখানে জননী পুত্রের মুখে আহার তুলিয়া দিতেছেন, যেখানে পত্নী পতির সেবা করিতেছেন, যেখানে নরনারী একে অন্যের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন, তোমার চক্ষু কি এমন জড়ভাবাপন্ন যে, তথায় ঈশ্বরের রাজত্ব দেখিতে পায় না?

যদি এ কথা সত্য হয় যে, ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করেন, অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে, এ দেশের উদ্ধার ব্রাহ্মসমাজ দ্বারাই হইবে। আমি বিশ্বাসচক্ষে দেখিতেছি, যাহাতে দেশের সর্বপ্রকার উন্নতি হয় তাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজ যত্নবান্ হইতেছেন। যেখানে বিধবা অকালবৈধব্য ভোগ করিতেছে, সেইখানে ব্রাহ্মসমাজ তাহার উদ্ধারে নিযুক্ত; যেখানে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অজ্ঞান-অন্ধকার বিরাজ করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ সেইখানে জ্ঞানালোক প্রকাশ করিতেছেন; যেখানে স্ত্রীলোকগণ অন্তঃপুরে আবদ্ধ সেইখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিতেছেন যে, ঈশ্বরের পুত্রকন্যার সমান অধিকার। ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রকার পাপের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুদ্র হইলেও দেশের নীতিকে পবিত্র করিবার জন্য ও দেশের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আরও সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে দেখা যায়, যে অগ্নি জ্বলিলে দেশের উদ্ধার, তাহা এই ব্রাহ্মসমাজে নিহিত রহিয়াছে। এ কথা পাষাণে লিখিয়া রাখ যে,

ধর্মপ্রচারের নিগূঢ় কথা

ভারতের ভাবী রাজনৈতিক স্বাধীনতা এই সমাজের উপর নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে বিশ্বাসী হইতে হইবে, সত্যে অনুরাগে ও বিশ্বাসে প্রত্যেককে জলন্ত থাকিতে হইবে, স্বার্থপরতাকে তাঁহার চরণে বলি দিতে হইবে। ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে ইহাই বুঝিয়াছি, সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থ বিসর্জন করিয়া, আত্মত্যাগ করিয়া, নরনারীকে নিয়ত তাঁহার কার্য করিতে হইবে। এই মহৎ কার্যের পুরস্কার কি? আমরা আর কি পুরস্কার চাহিব? তাঁহার রাজ্য বিস্তার হইবে, ইহা অপেক্ষা অপর পুরস্কার আর কি আছে? তবে বিশ্বাসের অগ্নি প্রজ্বলিত হউক, তাহা হইলে তাঁহার কৃপার বায়ু এ অগ্নিকে শতগুণে বর্ধিত করিয়া দিবে।

১২ মাঘ ১৮০৬ শক। ১৮৮৫ খ্রী

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্মভাব

বর্তমান সময়ে দুই প্রকার স্রোত এ দেশে সম্মিলিত হইতেছে, একটি পূর্বদেশীয়, অপরটি পাশ্চাত্য। আমরা ইচ্ছা না করিলেও আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক প্রভৃতি সকল সম্বন্ধ ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন-স্রোতের দ্বারা বিপর্যস্ত হইতেছে। একান্নবর্তিতা ও পূর্বতন পারিবারিক গঠন প্রভৃতি সকলই চলিয়া যাইতেছে। পিতা ও পুত্র, ধনী ও দরিদ্র, বর্ষীয়ান্ ও যুবক, পুরুষ ও নারী, রাজা ও প্রজা, জমিদার ও স্বায়ত প্রভৃতি সকলেরই সম্বন্ধ এই উভয় চিন্তাস্রোতের সম্মিলনে পরিবর্তিত হইতেছে এবং সর্বশেষে এই স্রোত ধর্মরাজ্যেও যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বর্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় ধর্মভাবের সম্মিলন সংঘটিত হইতেছে।

এক্ষণে আলোচ্য, প্রাচ্য ধর্মভাব কি? প্রাচ্য ধর্মভাব বলিলে আমরা হিন্দুধর্ম বুঝিব। কারণ পূর্বদেশীয় অপর দুইটি ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে প্রসূত এবং ইসলাম ধর্মের মূল ভাব য়িহুদীধর্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইহাদের মধ্যেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব বিদ্যমান। এই প্রাচ্য ভাবের ভিত্তি ও প্রকৃতি কি তাহা নির্দেশ করিবার পূর্বে কিরূপে উহা উৎপন্ন হইল, তাহা দেখা আবশ্যক।

সাধারণত যদি ধর্মভাবের মূল ভিত্তি বিচার করি তাহা হইলে এই প্রশ্নে উপনীত হই— ঈশ্বর, মানবাত্মা ও জগৎ এই সকলের স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিষয়ে সেই সেই ধর্ম-সংস্থাপকগণ কি কি মত প্রকাশ করেন? সেই সেই মতের উপর স্থাপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এ পর্যন্ত জগতে তিন প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম জগতে, দ্বিতীয় মানবাত্মায় এবং তৃতীয় ইতিহাসে তাঁহাকে

দর্শন করা। জড়জগৎ, চেতন-রাজ্য এবং মানব-সমাজ সর্বদা সকলের চক্ষুর সমক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও কোনও জাতি জড়ে, কোনও কোনও জাতি চেতনে এবং অপরেরা ইতিহাসে ঈশ্বরের সত্তা সন্দর্শন করিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রীকগণ জড়জগতের শোভায় তাঁহাকে 'সুন্দরং' রূপে দর্শন করিয়াছেন। জড়জগতে ঈশ্বর-দর্শন অভ্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা মানবপ্রাণকে আকর্ষণ করিবেই করিবে। সামান্য বালুকাকণা হইতে সুবিশাল হিমালয় পর্যন্ত যেখানে দেখি, সর্বত্রই সৌন্দর্য, চারি দিকেই শৃঙ্খলা। অণুবীক্ষণ-যোগে কীটাণুর দেহ পর্যবেক্ষণ করিলে শোভার পরে শোভা পরিলক্ষিত হয়। জড়ে দেখিলে 'সুন্দরং' ভাব জাগিবেই জাগিবে। এই কারণে গ্রীস দেশে স্থপতি-বিদ্যা, শিল্প ও কাব্য প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যাহা কিছু হইয়াছে, সমস্তই সুন্দর। চিত্র, পথ, গৃহ প্রভৃতি সমুদয়ই সুন্দর। আধুনিক ফরাসী জাতি যেরূপ সৌন্দর্যপ্রিয়, প্রাচীন গ্রীকগণও সেইরূপ সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা জড়ের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া ঈশ্বরকে সুন্দর দেখিতেন। এই সৌন্দর্য-জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যে এতদূর বিকশিত হইয়াছিল যে, আচরণের সৌন্দর্যই তাঁহাদের মধ্যে পুণ্য ও আচরণের কদর্যতা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কোনও কোনও জাতি চেতনে বা আত্মাতে ঈশ্বর-দর্শন অভ্যাস করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে নিত্য রূপে দেখিয়াছেন। হিন্দুগণ নিত্য রূপে, 'ধ্রুবমধ্রুবেষু', সমুদয় অধ্রুব পদার্থের মধ্যে তাঁহাকে ধ্রুব রূপে সন্দর্শন করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আত্মাতে দেখিলে নিত্যজ্ঞান হয় কেন? জড়জগতে

তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করা যায় ইহার যুক্তি আছে, কিন্তু আত্মাতে দেখিলে তিনি কিরূপে নিত্য বলিয়া প্রতিভাত হন? ইহার কারণ, আত্মপরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইলেই পরিবর্তনশীল নানারূপ অবস্থা প্রথমেই অনুভূত হয়। মানস-সাগরে হর্ষ, দুঃখ, শোক, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি নিয়ত কত তরঙ্গই উঠিতেছে, ইহার সমুদয়ই অস্থায়ী ও ক্ষণিক। এখনই এই বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন হও, দেখিবে তথায় কত তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে, পরস্পরে তুমুল আঘাত করিতেছে, আবার কোথায় বিলীন হইতেছে। এক্ষণকার যে চিন্তা, হর্ষ, শোক, তাহা পরক্ষণেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এ সকলের মধ্যে কি স্থায়ী পদার্থ কিছুই নাই? এ সকল কি সূত্রবিহীন মুক্তার ন্যায়? চিন্তার মুক্তাগুলি কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে? অথবা এ সকলের মূলে অন্তর্নিহিত এমন কোনও সূত্র আছে, যাহা এই সকলের একত্র সন্নিবেশ দ্বারা অপূর্ব সুচিক্কণ হার রচনা করিয়াছে? অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, এ সকলের মূলে আত্মবস্তুর অভিন্নত্ব বা নিজের ব্যক্তিত্ব-বোধ আছে কি না। এই ব্যক্তিত্ব জ্ঞান এই সমুদয় চিন্তাকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছে। এই আত্মচিন্তাতেই "সূত্রে মণিগণা ইব" সমুদয় সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আত্মা সকলের মূলে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আত্মাতে নিমগ্ন হইলে যখন সমুদয় অস্থায়ী ভাবের মধ্যে একটি স্থায়ী বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তখন স্বভাবত এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমার মধ্যে যেমন এক স্থায়ী সূত্র রহিয়াছে, তেমনি এই বাহ্যজগতের সমুদয় পরিবর্তনশীল ঘটনার মধ্যে এমন কোনও সূত্র রহিয়াছে কি না যাহা এই সকলকে একত্র রাখিয়াছে? এই প্রশ্ন মানবকে সমুদয় অনিত্য বস্তুর মধ্যে সেই নিত্য পদার্থকে দেখাইয়া দেয়। এইরূপেই হিন্দুগণ ঈশ্বরকে নিত্য বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত কোনও কোনও জাতি মানব-ইতিবৃত্তে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। য়িহুদীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহারা মানব-ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা সন্দর্শন করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবের কার্যের সাক্ষী ও বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন। এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে সেইরূপ ভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেন নাই তাহা নয়। মনুসংহিতাতে আছে—

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

হে ভদ্র, আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এরূপ করিবে না। পুণ্যপাপদর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ শুদ্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

এই বচন হইতে দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুগণও ঈশ্বরকে তাঁহাদের সাক্ষী বিধাতা ও বিচারক বলিয়া অনুভব করিতেন।

কিন্তু এটি এ দেশের মুখ্যভাব নয়। এই ভাবটি য়িহুদীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আত্মার মধ্যে যাঁহারা পরমাত্মাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, পরমাত্মা ওতপ্রোত ভাবে সমুদায় বস্তুতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন এই নিত্যপুরুষ আত্মার পরমাত্মা হইয়া জীবনের আধার রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং আত্মা হইতে তাঁহার আকাশেরও ব্যবধান নাই, সেইরূপ তিনি সকল বস্তুতে গূঢ় রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যাঁহারা ইতিবৃত্তে তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিধাতা রূপে বাহিরেই দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁদের ঈশ্বর কোনও এক সপ্তম স্বর্গে বাস করিতেছেন এবং মানবের কার্য-সমুদয় পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিজ গৃহে সিংহাসনে বসিয়া রাজদণ্ড হস্তে সমুদয় শাসন করিতেছেন।

হিন্দুগণ আত্মমধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া অনিত্যের মধ্যে নিত্য এই ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং
শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

তাহারা দেখিয়াছেন, জড়ের মধ্যে যে শক্তি নিত্য রূপে বাস করিতেছে, সেই শক্তিই মানবাত্মাতে চৈতন্য রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer এক স্থানে বলিয়াছেন, "There is an infinite and eternal energy, from which everything proceeds" তিনি যে কেবল চৈতন্য তাহা নহে, কিন্তু তিনি বিধাতা। তাহাকে আত্মস্থ বলিয়া জানিতে হয়।

এই আত্মনিষ্ঠতা হিন্দুধর্মের বিশেষ ভাব, আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করাই মুখ্য লক্ষ্য। ইহা হইতে আরও দুইটি ভাব সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, নিত্যানিত্য-বিবেক ; দ্বিতীয়, মানবাত্মার অধীনতা। আত্মাতে দেখিলেই পরমাত্মা নিত্য ও অন্য সকল বস্তুই অনিত্য দেখা যায়, এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই মানবাত্মার পরাধীনতা আসিল কিসে ?

ভারতের চিন্তাশীল সাধকগণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, আত্মার এই তিনটি অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাতে তাহারা দেখিতে পাইলেন

যে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি স্বাধীন অবস্থা নয়। স্বপ্নে যে-সকল বিষয় দেখিতেছি, তাহার কোনটির উপরেই আমার হাত নাই। যে-সকল বিষয় আমি কখনও ভাবি নাই, হয়ত এমন কত বিষয় আমার কল্পনা-নেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ইহার কোনটিও আমার ইচ্ছামত ঘটে নাই; সকলই আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। সুষুপ্তি অবস্থার ত কথাই নাই, তখন আমার আমিত্ব-জ্ঞান পর্যন্ত ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। এইরূপে তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, এই দুই অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে অন্য এক শক্তির অধীন।

তাঁহারা আরও দেখিয়াছেন যে, এই যে জাগ্রতাবস্থা যাহাতে আমি যাইতেছি, খাইতেছি, বসিতেছি, উঠিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান থাকে, যে অবস্থায় আমার কর্তৃত্বজ্ঞান সর্বদা আমার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহাও সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা নয়। কারণ, প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের যে জ্ঞান-ক্রিয়া হইতেছে, এবং পরে মন যে উপাদানে চিন্তার প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছে, সেই জ্ঞান-ক্রিয়ার উপর আমাদের কোন হাত নাই। চক্ষু খুলিবামাত্র সূর্যালোক আমাদের গোচরে আসিতেছে, তাহার উপর আমাদের কি হাত আছে? ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া জড়জগৎ আমাদের অন্তরে যে-সকল ভাব প্রেরণ করিতেছে, তাহার উপর আমাদের কি কোনও কর্তৃত্ব আছে? এইরূপে দেখিতে পাই যে, কোনও জ্ঞান-ক্রিয়াই আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।

তৎপরে দেখিতে পাই যে, আমাদের এই যে জীবন, ইহার আদি অন্ত কিছুরই উপরে আমাদের কর্তৃত্ব নাই। আমাদের ইচ্ছাতে এ জীবনের আরম্ভ হয় নাই; আবার যখন শেষ হইবে, তখন ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবেই হইবে। জীবন যে এখন আছে তাহার উপরেও সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই। প্রতিনিয়ত যে-সকল ক্রিয়ার উপর আমাদের জীবন

নির্ভর করিতেছে, তাহার উপর কি আমাদের কোনও কর্তৃত্ব আছে? শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন, পাকস্থলীর ক্রিয়া ইহার কোন্‌টি আমাদের ইচ্ছাধীন? কি আশ্চর্য! যে-সকল ভার আমরা স্বহস্তে লইলে কোনও রূপ বিপদের সম্ভাবনা নাই, সেইগুলিই কেবল আমাদের হাতে, আর যেখানে পদে পদে বিপদ, তাহার কোনটিই আমাদের হাতে অর্পিত হয় নাই, তাহার সকলগুলিরই পরিচালনের ভার অন্য এক শক্তির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি শ্বাস-যন্ত্র পাকস্থলী প্রভৃতির কার্য আমাদের হস্তে থাকিত, তাহা হইলে কি মুহূর্তকালের জন্যও আমাদের জীবনের আশা ছিল? তবে আর স্বাধীনতা কোথায়? পশ্চিমদেশীয় ঋষি এমার্‌সন বলিয়াছেন, "Life is a stream; it is descending into us from where we know not. আমাদের এই জীবন-সরিৎ নিয়ত আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু কোথা হইতে প্রবাহিত, তাহা আমরা অবগত নহি।" আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের রশ্মি অন্য স্থান হইতে আসিতেছে। ইহার একটিও আমার নয়। তবে এ সকলের কর্তা কোন্ স্থানে?

বর্তমান সময়ে Utilitarian হিতবাদিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া Necessitarian হইয়াছেন। প্রাচীন কালে ভারতের ঋষিগণ ইহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া আত্মার স্বাধীনতা দেখিতে পান নাই। যদি কর্তৃত্বই নাই তবে আত্মা কিরূপে এই অনিত্য জগতে আসিল? তাঁহারা এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কর্মনিয়ম অনুভব করিলেন। আত্মা কর্মনিয়মের অধীন হইয়া জগতে আসিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন জড়রাজ্যের সর্বত্রই নিয়ম; কোথাও কাহারও স্বাধীনতা নাই। বিশাল সূর্য নভোমণ্ডলে নিয়মাধীন হইয়াই ভ্রমণ করিতেছে; সুশোভন চন্দ্রমা নিয়মের বাধ্য হইয়াই পূর্ণিমা-রজনীতে

নয়নানন্দ দান করিতেছে ; নিয়মাধীন থাকাতেই নক্ষত্রমণ্ডল অমানিশার আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিতেছে ; মেঘ-সকল বাধ্য হইয়াই জলধারা বর্ষণ করিতেছে ; প্রকৃতি বসন্তকালে অপরিহার্য নিয়মেই নব শোভায় শোভিত হইয়া জগজ্জনের মনোহরণ করিতেছে। এইরূপ জগতের সর্বত্রই নিয়ম-বাধ্যতা। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মানবের কার্য-সমুদয়ও দুর্ভেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে। কর্মের নিয়ম মানিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা রক্ষা করিলেন। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার স্বীকার করিলেন। জীবাত্মার সংসারে জন্ম কর্মফল ভোগের জন্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা আত্মা, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঈশ্বর নিত্য, আত্মা কর্তৃত্ববিহীন নিয়মাবদ্ধ এবং জগৎ অনিত্য, মানবাত্মার কর্মভোগের স্থান। প্রাচ্য ধর্মভাবের মধ্যে এই তিনটি ভাব প্রস্ফুটিত দেখা যায়।

এ সকল ভিন্ন ইহার আরও একটি প্রধান ভাব আছে। সেটি এই—অনিত্য জগতে নিত্য আত্মার বাস প্রার্থনীয় কি না ? ইহার উত্তর, প্রার্থনীয় নয়। যেহেতু জগৎ দুঃখময়, দুঃখময় জগতে আত্মার বাস কিরূপে প্রার্থনীয় হইতে পারে ? জন্মগ্রহণ দুঃখেরই কারণ। জন্ম হইতে নিষ্কৃতিই মুক্তি। 'সংসার' শব্দ সংস্কৃত 'সৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ যাতায়াত ; 'ভব' শব্দের অর্থ জন্ম। তাঁহারা এই জগতে আগমন, এখানে জন্মকেই অত্যন্ত দুঃখময় মনে করিতেন। এইজন্যই সংসার ও ভব শব্দ জন্মার্থক হইলেও দুঃখবাচক হইয়াছে। সংসারকে তাঁহারা এত দুঃখময় বিবেচনা করিলেন কেন ? দেখি, সমুদয় প্রাণী জগৎকে মিষ্ট মনে করে। শিশুগণ মনে করে, জগৎ মিষ্ট। তাহাদের নবীন চক্ষে সকলই নবীন, সকলই আনন্দদায়ক, তাহারা যাহা দেখে তাহাতেই আনন্দ, যাহা শোনে তাহাতেই তৃপ্তি। যত দেখে, যত শুনে, ততই

কৌতূহল। সকল প্রাণীর পক্ষেই জগৎ মিষ্ট, তবে দুঃখ কোথা হইতে আসিল? কেন প্রাচীন পণ্ডিতগণ জগৎকে দুঃখময় বলিয়া অনুভব করিলেন?

বেদে কোথাও ত জগতকে দুঃখময় বলিয়া উল্লেখ দেখি না। বেদে জগৎকে উপভোগ করিবার ভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাই। বৈদিক ঋষিগণের ধর্মভাব নূতন, তাঁহাদের দৃষ্টি নূতন, সকলই নূতন। তাঁহাদের নূতন চক্ষুতে তাঁহারা জগৎকে সৌন্দর্যের আকর ও সুখের উৎস বলিয়া দেখিয়াছেন। বেদে কোনও কপটতা নাই। বৈষয়িক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে না সে ভাব তখন ছিল না। তাঁহারা সর্বদা ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখের জন্যই ব্যস্ত। সেই সুখকেই ধর্মের পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন এবং ধর্মপথে থাকিয়া তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেন। বেদে সর্বদাই এরূপ প্রার্থনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, "হে ইন্দ্র, আমাদিগকে ধন দাও যাহা দিন দিন বর্ধিত হয়; আমাদিগকে দুগ্ধবতী ধেনু দাও, আমরা দুধ খাই।" এমন কি ভেকের যে কুৎসিত শব্দ, তাহারও মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ এক প্রকার স্বরমাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন। বেদে বর্ষাকালে ভেকদিগের মকমকা ধ্বনির প্রশংসা আছে। কিরূপ সরল মন থাকিলে জীবনের সুখ এত অধিক অনুভব করা যায় যে, ভেকের শব্দেও মন মুগ্ধ হইতে পারে! এই শৈশবসুলভ সরলতা, এই জীবনের সুখ ভোগের শক্তি, এই ইন্দ্রিয়জনিত সুখের আস্বাদনের ক্ষমতা অতীব মধুর। হায়! এ ভাব ভারত হইতে কেন গেল? কিজন্য জগৎ দুঃখময় মনে হইল?

এক্ষণে দেখা যাউক, জগৎ যে দুঃখময় এ কথা সত্য কি না? জগৎ যদি দুঃখময় হয়, তবে কি ঈশ্বর করুণাময় নহেন, অথবা পরমেশ্বর কি জগৎপিতা নহেন? জগৎ যে দুঃখময় দেখি, তাহার কারণ দুঃখের

কথাটা আমাদের মনে থাকে, সুখের কথা ভুলিয়া যাই, তাহার জন্য ঈশ্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিই না। তুমি বৎসরের মধ্যে এক দিন কি দুই দিন ভয়ানক রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, সেই কথাটি হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়াছ; কিন্তু এতদিন যে সুখ ভোগ করিলে, এতদিন যে সুস্থ দেহে প্রফুল্ল মনে কালহরণ করিলে, তাহা মনে থাকে না। পরমেশ্বর আমাদের ধন্যবাদ চান না, এইজন্যই সুখের কথা মনে থাকে না; আর আমাদিগকে দুঃখ পরিহার করিতে হইবে, এজন্য তার ছাপ মনে বিশেষ রূপে অঙ্কিত থাকে। জীবনের মিষ্টতা হৃদয়ে না জাগিয়া দুঃখের কথাগুলিই স্মৃতিতে জাগে।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন কালের সহিত তুলনা করিয়া বর্তমান কাল দুঃখময় মনে হয়। শাস্ত্রে ভাল কথাই লিখিত থাকে, মন্দ কথা কেহ লিখিয়া রাখে না; ব্যাস, বাল্মীকি ইঁহাদেরই কথা লেখা আছে, আর যে কত "হরে, নরে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা যে দুরাচার করিয়াছিল, তাহার কেহ সন্ধান রাখে না। কাজেই পুরাণ পাঠে প্রাচীনের তত্ত্ব অবগত হইতে গিয়া আমরা ভাল দিক্‌টাই দেখিতে পাই, মন্দ ভাগ ততটা আমাদের নয়নপথে পতিত হয় না। কিন্তু বর্তমান দেখিতে গেলেই ভাল মন্দ দুই চক্ষে পড়ে। ভালটা স্মৃতিতে তত জাগে না যত মন্দটা জাগে, সুতরাং অতীতের সহিত তুলনায় বর্তমানকে সর্বদাই মলিন মনে হয়। এইজন্যই অনেকে 'প্রাচীন' 'প্রাচীন' করিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন।

এ ভাব হিন্দুদের ন্যায় য়িহুদীদের মধ্যেও ছিল। এই দুই জাতি জগৎকে মলিন চক্ষে দেখিল কেন? এমন কোনও কারণ ছিল যাহা দুই জাতিতেই বিদ্যমান ছিল। চিন্তা করিলে মনে হয়, রাজনৈতিক পরাধীনতা, উৎপীড়ন, সামাজিক দারিদ্র্য প্রভৃতি জগৎকে দুঃখময়

দেখিবার কারণ। য়িহুদীদের মধ্যে বন্দী-দশা ও দুর্ভিক্ষাদি এই ভাব আনয়ন করিয়াছে। এ দেশেও রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার প্রবল হইয়াছিল; অন্যান্য জাতি সর্বদা প্রপীড়িত হইত, তাহাদের মন নিয়ত ম্রিয়মাণ থাকিত। সেই কারণে জীবন দুঃখময় বোধ হইত। তৎপরে জাতিভেদপ্রথা-নিবন্ধন ব্যক্তিগত শক্তি একেবারেই পরাভূত হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি অনুভব করিত, রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার নিবারণ পক্ষে তাহার শক্তি কিছুই নহে। এই নিরাশা জীবনের তিক্ততাকে ঘনীভূত করিয়াছিল।

ঐ সকল কারণের সমাবেশে প্রথম আত্মনিষ্ঠতা, দ্বিতীয় বিষয়-বিরাগ ও তৃতীয় অদৃষ্টবাদের বিকাশ হইয়াছে। এই তিনটি ভাব প্রাচ্য ধর্মে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং তিনটিতেই আতিশয্য দেখা গিয়াছে। প্রথম, আত্মনিষ্ঠতা আত্মতৃপ্তিকে প্রসব করিয়াছে। প্রাচ্য ঋষিগণ সর্বদা আপনার ধ্যান, চিন্তা ও সাধনেই তৃপ্ত থাকিতেন। ইহার দৃষ্টান্ত অধিক দিতে হইবে না। হাজার হাজার সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়, বিষয়-বিরাগ। ইহার মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসকে উৎপন্ন করিয়াছে। ইহা হইতে এই ভাব জন্মিয়াছে যে, মনুষ্যসমাজ ঘৃণার বস্তু, দুঃখময়, উহা পরিত্যাগ কর। তৃতীয়ত, অদৃষ্টবাদ। ইহাতেও সত্য আছে; মানুষের কর্মেরও একটা নিয়ম আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আতিশয্যবশতঃ নীতি বিষয়ে ঔদাসীন্য (stagnation) উৎপন্ন করিয়াছে। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যে তিনটি মূল ভাব বলিয়াছি তাহার আতিশয্য হইতে ঐ তিনটি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ফল ধর্ম ও নীতির মধ্যে বিচ্ছেদ। এ দেশে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে প্রধানত ধর্মসাধন হইয়াছে। পরমহংস প্রভৃতি জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও

বৈষ্ণবগণ ভক্তিপথাবলম্বী ; উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নীতি ও ধর্মের যোগ অপ্রস্ফুটিত রহিয়াছে।

প্রাচ্য ধর্মভাব এই। এক্ষণে আলোচ্য, প্রতীচ্য ভাব কি ?

প্রতীচ্য ধর্ম য়িহুদী ধর্ম হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের মুখ্যভাব, ঈশ্বর মানব-কার্যের বিচারক ও মানব-ইতিবৃত্তের নিয়ামক। সেমেটিক ও হিন্দু জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ আত্মজগতে অধিক বাস করাতে ভাব-প্রবণ হইয়াছেন ; য়িহুদীগণ মানব ইতিবৃত্তের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বহির্মুখীন ও পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন (exact) হইয়াছেন। হিন্দুদিগের ঈশ্বরের ভাব অব্যক্ত, অনধিগম্য ; তাঁহারা ঈশ্বরকে অচিন্ত্য মহান্ ইত্যাদি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "তিনি অকায়, তিনি অব্রণ, তিনি স্থূল নহেন ; তিনি চলেন, তিনি চলেন না" এইরূপ অস্পষ্টভাবে তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। য়িহুদীগণ ইতিবৃত্তে দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞান পরিচ্ছিন্নভাবাপন্ন। ভারতের ঈশ্বর immanent in nature, প্রকৃতিতে, জড়ে, চৈতন্যে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। য়িহুদীদের ঈশ্বর সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, Extra-Cosmic Being, প্রকৃতির বহিঃস্থ। তাঁহাদের ঈশ্বরের স্বর্গ নামক স্থানে বাস। তিনি তথা হইতে জগৎ দেখিতেছেন। Old Testament-এর ঈশ্বর বৃক্ষতলে পদচারণা করিতেছেন, কাহারও বাটীতে এক রাত্রি থাকিতেছেন, একজনের পরামর্শে অন্যের সর্বনাশ করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। য়িহুদীদিগের ধর্ম বিষয়ে সকল ভাবই পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ। আর এ দেশে দেখুন, এ সকল বিষয়ে কেমন উদারতা। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ভগবদ্গীতায় দেখুন চিন্তার কেমন আশ্চর্য উদারতা। য়িহুদীদের মধ্যে এই উদারতার অভাব। সেইজন্যই মত লইয়া কাটাকাটি। ঈশ্বর

জগতের বাহিরে, বাহির হইলে সকল ঘটনা নিয়মিত করিতেছেন, মানবের কাজ দেখিতেছেন— তাঁহাদের মূল ভাব এই প্রকার।

প্রাচ্য ধর্মে পাপ কাহাকে বলে? না, মোহ; অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা। য়িহুদীদিগের পাপ বিদ্রোহ, ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধ কাজ। আমাদের মুক্তি জ্ঞানে, তাহাদের মুক্তি ঈশ্বরেচ্ছার অধীনতাতে। এই বিদ্রোহ নিবারণ করিয়া মানবকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করাই য়িহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উদ্দেশ্য। এ দেশের ঋষি বলেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে পুরুষের আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; এবং কামনার পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়; ক্রোধ হইলে মানুষের হিতাহিত বুদ্ধি লোপ পায়; হিতাহিত বুদ্ধির বিনাশবশতঃ আত্ম-বিস্মৃতি হয়, আত্মবিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ; বুদ্ধিনাশ হইলে সর্বনাশ ঘটে।

ঋষিগণ বলেন, অজ্ঞানতাবশতঃ সকল অনর্থের উৎপত্তি। অতএব সর্বপ্রযত্নে অনিত্য বিষয়কে বিনাশের কারণ জানিয়া সেই সকল হইতে চিত্তের প্রত্যাহার কর এবং নিত্য বস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন হও। তাহা হইলেই নিত্য বস্তু জানিবে এবং মুক্তিলাভ করিবে। য়িহুদীগণ বলেন, মুষা দ্বারা যে আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে তাহা পালন করিলেই মুক্তি। খ্রীষ্টান বলেন, যীশুর দ্বারা যে আদেশ প্রচারিত হইয়াছে তাহা পালন কর; তুমি তাহা পালন কর কি না ঈশ্বর দেখিতেছেন। তবেই দেখ, মানবের ব্যক্তিত্বজ্ঞান ও দায়িত্বজ্ঞান য়িহুদী ধর্মের মূলে নিহিত রহিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম য়িহুদীধর্ম-প্রসূত। ইহা ব্যক্তিত্বভাব আরও প্রস্ফুটিত করিয়াছে। মুষার ধর্মনিয়মে বরং স্বাধীনতা কিছু খর্ব হইয়াছে; খ্রীষ্টীয় ধর্মে উহা সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

দুই মহাপুরুষের দ্বারা খ্রীষ্টীয় জগতে এই ব্যক্তিত্বজ্ঞানের বহুল প্রচার হইয়াছে— প্রথম সেণ্ট পল, দ্বিতীয় মার্টিন লুথার। মানবাত্মার যে মূল্য আছে, মহত্ত্ব আছে, যীশুর উক্তিতে এ ভাব থাকিলেও সেণ্ট পল এবং লুথার ইহা বিশেষ রূপে ব্যক্ত করেন।

যীশু নিজে মানবাত্মার মহত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ কোনও এক বিশ্রামদিনে শস্যের শীষ ভক্ষণ করিয়াছিল। য়িহুদীগণ ইহা দেখিয়া মুষার নিয়মের ব্যতিক্রম হইল বলিয়া যীশুর শিষ্যগণের প্রতি বিষম আক্রোশ করিতেছিলেন। তখন যীশু বলিলেন "Sabbath is made for man and not man for the Sabbath, মানবের জন্যই বিশ্রামদিন, কিন্তু বিশ্রামদিনের জন্য মানব সৃষ্ট নহে।" তাঁহার এই উক্তিতে মানবাত্মার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইতেছে।

তার পর যীশুর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স্ খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীভুক্ত হইলেন। সেখানে তাঁহার প্রবল প্রভাব হইয়া উঠিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ য়িহুদী ছিলেন। য়িহুদী ধর্মের যাবতীয় নিয়ম পালনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয়মণ্ডলী-মধ্যে গিয়াও য়িহুদীর ভাব পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মণ্ডলী-মধ্যে অনেকের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিলেন— যাঁহারা য়িহুদীর অনুষ্ঠান সমুদয় সম্পাদন করেন নাই, তাঁহারা খ্রীষ্টান হইতে পারিবেন না, তাঁহাদের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। অনেকে তাঁহার এই মতের সমর্থন করিলেন। তাঁহার একটি গণ্ডী গঠিত হইল।

তখন ধর্মবীর বিশ্বাসী সেণ্ট পল তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি এই অসত্যের সমর্থন করিলেন না। বিশ্বাসে ও ভক্তিতে মানুষ তরিয়া যায়, নিয়মপালন কিছুই নয়, পল ভীমনাদে এই মহাসত্য ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, য়িহুদী হও আর জেণ্টাইল হও, তাহাতে কিছুই যায় আসে না ; তুমি য়িহুদী অনুষ্ঠান প্রতিপালন কর আর না কর, তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই— যদি তুমি বিশ্বাসী হও, যদি যীশুর প্রতি প্রীতি থাকে, যদি সন্দেহের ঝড়ে আন্দোলিত সংসারসমুদ্র-মধ্যে বিশ্বাসের নিরাপদ বন্দর পাইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্তি তোমার করতলে। এই মত প্রচার করিয়া তিনি সকল খ্রীষ্টীয় ও য়িহুদীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নিজ জীবনের ব্যক্তিত্বের পরাক্রম দেখাইলেন।

ইহার কয়েক শত বৎসর পরে লুথার আবার দুদান্ত পোপের পরাধীনতা-রূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন।

তার পর ক্রমাগত এই ব্যক্তিত্বের আগুন জলিতে লাগিল। সমস্ত ইউরোপ বিপ্লবময় হইয়া উঠিল। বর্তমান সময়ে এই ব্যক্তিত্বভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশিত হইয়াছে। "যে যার আপনার" এই ভাব ইউরোপে অত্যন্ত প্রবল। আমাদের দেশে জাতিভেদের প্রবল প্রতাপে ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিতান্ত হীন। আমি কি খাইব, কিরূপ কাপড় পরিব, এমন কি আমি শ্মশ্রু রাখিব কি না, সমস্তই সমাজ নির্ণয় করিয়া দিবে। কিন্তু সে দেশে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিবেশী কি করে, কি খায়, কেহ তাহার কোনও সন্ধান রাখে না। তাহাদের প্রত্যেকের সুখদুঃখের সহিত অপরের কোনও সম্বন্ধ নাই। তুমি নিজ গৃহে যথা রুটি খাও বা অনাহারে থাক, তুমি যথেষ্ট পরিমেয় ব্যবহার কর অথবা

নগ্ন গাত্রে দিন যাপন কর— কেহ সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না। এই স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকে ইচ্ছানুরূপ আপনাকে গঠন করিতে পারে। এই ব্যক্তিত্বের মাত্রা ইউরোপে অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সেজন্য সেখানকার অনেক লোক অন্য দিকে এতই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা ব্যক্তিত্ব সমূলে বিনাশ করিয়া সামাজিকতা (socialism) প্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং রাজশক্তিকে সমুদয় ক্ষমতা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

এই ব্যক্তিত্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধের প্রাবল্যবশত খ্রীষ্টীয় ধর্ম নীতিপ্রধান হইয়াছে। এইজন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মের ইতিহাসে এক মহাভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম জন্মগ্রহণ করিয়াই সমাজের পাপ ও দুর্নীতি -সকল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিশুহত্যার (infanticide) নিবারণ, নরপশু-ক্রীড়ার (gladiator shows) দমন ও দাম্পত্য নীতির উন্নতি, এই সকল বিষয়ে সেই মুষ্টিমেয় খ্রীষ্টানগণ আশ্চর্য প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎকালে এতদ্দেশীয় রাজপুতগণের ন্যায় রোমীয়গণ শিশুদিগকে হত্যা করিত। বর্তমান কালে ইংলণ্ডীয় রমণীগণ গৃহে গৃহে উষ্ণ জল নিক্ষেপ করিয়া বিড়ালশিশুদিগকে হত্যা করেন। তাঁহাদিগকে এই অন্যায় কার্যের বিষয় বলিলে তাঁহারা তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হন না; প্রত্যুত হাসিতে হাসিতে বলেন, "সকলেই এইরূপ করে।" সকলেই, এমন কি পৃথিবীর সমস্ত লোকে অনুষ্ঠান করিলেও যে অন্যায় কখনও ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না। রোমবাসিগণ বিড়ালশিশু বধের ন্যায় বিকলাঙ্গ মানব-শিশুকে বধ করিতেন। কেহ প্রতিকারের কথা বলিলে হয়ত ঐরূপই উত্তর দিতেন। প্রাচীন খ্রীষ্টীয়গণ এই কুপ্রথা রহিত করেন।

রোম দেশে আর-একটি বীভৎস প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তথাকার ধনিগণ স্ব স্ব দাসবর্গকে হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবর্তিত করিতেন। কখনও তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদত্ত হইত, কখনও হতভাগ্যগণ নিরস্ত্রই এই সিংহ-ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইত। এই ব্যাপার দেখিবার জন্য ভদ্রবংশীয় সহস্র সহস্র পুরুষ ও রমণী একত্র হইতেন, এবং যখন হিংস্র শ্বাপদকুল হতভাগ্য দাসদিগের দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিত তখন তাঁহারা করতালি-ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

যথাকালে রোম দেশে এই ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান ও সেই সময়ের অপরাপর পাপ ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের বিধানে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় হইল। এক দিন রঙ্গস্থলে ঐরূপ ক্রীড়া হইতেছে, সহস্র সহস্র নরনারী একত্রিত হইয়াছেন, হতভাগ্য দাসগণ সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই, এমন সময়ে একজন সাধুপুরুষ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, কর কি! কর কি! এরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর কার্যে প্রবৃত্ত হইও না।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি তাহাদের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দর্শক পুরুষ ও মহিলাগণ বিরক্ত হইয়া চতুর্দিকে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি! একটা সন্ন্যাসীর এত সাধ্য যে সে আমাদের ক্রীড়া-কৌতুক বন্ধ করে! এখনি উহার প্রাণ নাশ কর।" তাহাদের এই আদেশ চতুর্দিকে ধ্বনিত হইবামাত্র একজন সেই সাধুপুরুষের বক্ষে ছুরিকা-আঘাত করিল। যখন সাধুপুরুষ ধুলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন, যখন তাঁহার বক্ষ হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইয়া রঙ্গভূমির অঙ্গন রক্তাক্ত করিতে লাগিল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল, তাহারা বলিল, "দেখ দেখি, এই সাধুপুরুষ কে?" অনুসন্ধান করিয়া তাহারা জানিতে পারিল, তিনি একজন ধার্মিক মহাপুরুষ। যখন সকলে এই কথা জানিতে পারিল, তখন

লজ্জা ও অনুতাপ সকলের অন্তরকে অভিভূত করিল। সেই দিন হইতে সেই ভীষণ ক্রীড়ার কথা আর কেহ মুখেও আনিত না। এইরূপে একজন খ্রীষ্টীয় সাধুপুরুষের রক্তে এই বিষম দুর্নীতি রোম নগর হইতে বিধৌত হইয়া গেল।

তৎকালের দাম্পত্য-নীতিও অত্যন্ত শিথিল ছিল। প্রাচীন গ্রীসে হেটিরি নামে এক শ্রেণীর কুলটা স্ত্রীলোক ছিল; তাহারা সমাজে সম্মান পাইত। এমন কি সক্রেটিসের ন্যায় মহাজ্ঞানীও এই শ্রেণীর নারীগণের গৃহে গমন করিয়া নানাবিধ প্রসঙ্গ করিতেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম এই কুপ্রথার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়াছে।

নীতির প্রাধান্য ও দায়িত্বজ্ঞানের প্রবলতা থাকাতে, ঈশ্বর মানবের বিবেকে প্রতিষ্ঠিত এবং চরিত্র দ্বারা ধর্মসাধন করিতে হইবে, এই ভাব খ্রীষ্টধর্মে উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাব প্রবল থাকাতেই খ্রীষ্টীয় জগতে মানবের অকস্মাৎ জীবন-পরিবর্তন (sudden conversion) এবং মৃত্যুশয্যায় পাপ-স্বীকার (deathbed confession) যত দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র তত দেখা যায় না। এ দেশেও লালাবাবু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জগতেই এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক।

প্রাচ্য ভাবের অতিরিক্ততা -জন্য যেমন তিনটি দোষের উৎপত্তি, সেইরূপ প্রতীচ্য ভাবের আতিশয্য হইতেও তিনটি দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম, ঈশ্বর কার্যের বিচারক, এই ভাব হইতে অতিরিক্ত কার্যতৎপরতা। দ্বিতীয়, বিষয় ঈশ্বর-সেবার ক্ষেত্র, ইহা হইতে বিষয়তৎপরতা। তৃতীয়, অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব হইতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ভাবদ্বয় মিলিত হয়— আত্মনিষ্ঠার সহিত কার্যতৎপরতা, বিষয়-বিরাগের সহিত নরসেবা, এবং ব্যক্তিত্বের

সহিত একতার সম্মিলন হয়, তাহা হইলেই পূর্ণধর্ম সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ এইজন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যকে একত্র করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বেদান্তের এক নূতন ভাষ্য করিলেন। তাহাতে এদেশীয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যে পাশ্চাত্য ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে প্রবেশিত করিলেন। এ দেশের যে 'ব্রহ্ম' শব্দ, তাহার অর্থ অব্যক্ত চৈতন্য, যাহা জগতের অতীত। এইজন্য 'ব্রহ্ম' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। ব্রহ্মের যে প্রকাশ, ইহাকে এদেশীয়গণ 'ঈশ্বর' বলেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নহেন। আর কিছুদিন পরে সমগ্র ভারতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর একার্থ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ কেবল আত্মতৃপ্তি উৎপন্ন করিবে না, এখানে সমস্ত সম্মিলিত হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা কি সম্ভব? পশ্চিমের ভাব কি এ দেশে আনা যায়? আমি বলি, বসরাই গোলাপ ও কপি, এই সকল ভারতে কিরূপে আসিয়াছে? আধ্যাত্মিক জগতেও naturalisation আছে। বর্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, কর্মপ্রধান ইংলণ্ড দেশেও জর্মনির চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং ইংলণ্ডের কর্মতৎপরতা জর্মন দেশে ক্রমশই পরিব্যাপ্ত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাব এ দেশে আসিবে। যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে এই উভয় ভাবকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মধর্মের সাধন করিতেছেন। ভগবান্ করুন, আমরা সকলে স্ব স্ব জীবনে এই সম্মিলিত ধর্মভাব সাধন করিতে পারি।

১৮১৫ শক। ১৮৯৪ খ্রী

সার্বভৌমিক ধর্মভাব ও ধর্মসমাজ গঠন

অদ্য সার্বভৌমিক ধর্মভাব ও ধর্মসমাজ সংগঠনের বিষয়ে কিছু বলিব। এই সম্বন্ধে প্রথমে সর্বসাধারণের সুবিদিত স্থূল স্থূল কতকগুলি কথা বলিব। অনেকেই অবগত আছেন যে, প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই পৃথিবীকে গ্রহগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনা করিতেন এবং মনে করিতেন যে ইহা সৌরজগতে মহারানীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত; সূর্য ও অপর গ্রহগণ ইহাকে আবেষ্টন করিয়া নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইহা জানিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র, সৌরজগতের অধীশ্বরী নহে; ইহা অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। আপাতত এইরূপ মতের পরিবর্তন সামান্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু এই দুইটি কথায় জগতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা কি সুমহৎ ও কত শতাব্দী হইতে সংগঠিত!

আধুনিক এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালীর চারিটি ক্রম আছে। প্রথম, বস্তু-পরীক্ষা; দ্বিতীয়, তুলনায় বিচার বা সম্বন্ধ-বিনির্ণয়; তৃতীয়, সাধর্ম্য-নিরূপণ এবং চতুর্থ, জাতি-বিভাগ। প্রথমত কোনও নূতন বস্তু দেখিলেই তাহা পরীক্ষা করা, তাহার স্বভাব গুণ ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিচার করা। যখন তাহার স্বরূপ এবং গুণ জানা হইল, তখন তুলনায় বিচার আরম্ভ হইল। তৎপর অন্য বস্তুর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিনির্ণয় করা। এইরূপ অন্য পদার্থের সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিতে করিতে মানুষ দেখিতে পায় যে, তাহার সহিত অন্য বস্তুর সাদৃশ্য রহিয়াছে, ইহারই নাম সাধর্ম্য-নিরূপণ। এই সাধর্ম্য-নিরূপণের পরে একভাবাপন্ন বস্তুদিগকে একটি শ্রেণীতে আবদ্ধ করা হয়। ইহাই

বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতি। এই রীতি সর্বত্রই ব্যাপ্ত, ইহার কাজ আমরা সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সর্বত্রই এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার রীতি দেখিতে পাই।

একজন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ নির্জনে হঠাৎ কোনও নূতন গুল্ম পাইলে প্রথমেই তাহার স্বরূপ,প্রকৃতি এবং গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করেন; যে যে বস্তুর বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে সেই সেই বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করেন; যখন অপর কোনও বস্তুর সহিত তাহাকে সমগুণ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন সেই শ্রেণীতে তাহাকে সন্নিবিষ্ট করেন। এইরূপ প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কোনও নূতন প্রাণী দেখিতে পাইলে তাহার স্বভাব, গঠনপ্রণালী প্রভৃতি পরীক্ষা তুলনা দ্বারা তাহাকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। ইহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালী। এই প্রণালী দ্বারা মানব-সমাজকেও শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। মানুষের আকৃতিগত পার্থক্য দ্বারা আর্য অনার্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে মাবন-জাতিকে বিভক্ত করা হইয়াছে।

এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালী এক্ষণে ধর্মের বিচারেও প্রযুক্ত হইতেছে। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দিগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মা-বলম্বিগণও নিজ নিজ ধর্ম ও দলকে প্রধান এবং অপরকে নিকৃষ্ট স্থান দিতেন। বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক রীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ ধর্মকে তুলনা দ্বারা বিচার করা হইতেছে। এখন কোনও ধর্ম-সমাজের চিন্তাশীল লোক নিজ ধর্মকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবিতে পারেন না, তাহাকে জগতের অপরাপর ধর্মের সহিত সম্বদ্ধ দেখিতে পান। এইরূপ বিচার করিতে গিয়া আমরা এক মহা সত্যে উপনীত হই। তাহা এই—

প্রথমত, এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি মানব-সাধারণে দেখা যায়। যে দৃষ্টি দ্বারা মানব পরমসত্তাকে প্রতীতি করে, তাহাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি।

কোনও সময়ে চিন্তাশীল লোক মাত্রেই বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীতে এরূপ অনেক লোক রহিয়াছে, যাহাদিগের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয় নাই। আদিম কালে খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রীগণ বর্বর-জাতীয়দিগের ভাষা বুঝিতে না পারিয়া জগতের সম্মুখে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতেই লোকের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, জগতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি -বিহীন লোকও রহিয়াছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের গবেষণায় যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন কোনও বর্বর জাতি নাই যাহাদিগের ভাষায় এক অনন্ত পরমসত্তার প্রতীতির প্রমাণ পাওয়া যায় না; এমন কোনও জাতি নাই, যাহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণেও প্রস্ফুটিত হয় নাই।

দ্বিতীয়, তুলনায় বিচার। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মানব আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে এক মহা সত্তার জ্ঞানে উপস্থিত হয়। সেই সত্তা দ্বারাই মানবের জীবন নিয়মিত। এ স্থলে অনেকেই বলিতে পারেন যে, বহু-দেব-বিশ্বাসী ত অনেকে আছেন। এখানে আমাদিগকে একটি কথা স্মরণ করিতে হইবে। মোক্ষমূলার তাঁহার একখানি গ্রন্থে একটি নূতন কথা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা Henotheism, অর্থাৎ বহু দেবে একই ভাবের আরোপ। বেদে ঊষা, বরুণ প্রভৃতি যে-সকল দেবতার নাম আছে, অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের সকলের মূলে একই ভাব রহিয়াছে, ভিন্ন প্রয়োগ মাত্র। সর্বজ্ঞ, দয়াময় প্রভৃতি যে সকল স্বরূপ স্বভাবত পরমেশ্বরে অর্পণ করা হয়, সে সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। "হে বরুণ, তোমার স্তবকারী বন্ধুদিগকে রক্ষা কর, তুমি সকলই করিতে পার, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই।" এই স্থানে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্

প্রভৃতি কথা বরুণের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইন্দ্রের স্তব-কালেও এই এক ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলতঃ, সর্বত্রই এই একই ছবি দেখিতে পাওয়া যায়; নাম ভিন্ন, ছবি একই। আমাদের দেশে নানা দেবতা লইয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণকে, কালীভক্তেরা কালীকে, বিষ্ণুভক্তেরা বিষ্ণুকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়াছেন; কিন্তু দেখিতে পাই যে, এক অনাদি অনন্ত পরমপুরুষের ভাবই ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় দেবতাকে আরোপ করিয়াছেন। আস্তিক হিন্দুর নিকট যদি বল "কালী ত ইহা করিতে পারে না", তবে তিনি তোমার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইবেন। এক দিন আমার মাতাঠাকুরানী আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা তারকনাথ তোমাকে সুখে রাখুন।" আমি বলিলাম, "তোমার তারকনাথ ত তারকেশ্বরে, সেখান হইতে আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বাছা, তারকেশ্বর কি শুধু ঐ মন্দিরেই বসিয়া আছেন? তিনি সর্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলই দেখিতেছেন।" এইরূপ দেখিতে পাই, মানবের ভাব সর্বত্রই এক।

প্রাচীন কালে লোকেরা আপনার মধ্যে কোনও এক শক্তির প্রমাণ পাইয়া বহির্জগতে তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। অগ্নির প্রবল শক্তি দেখিয়া, বায়ুতরঙ্গের পরাক্রম অনুভব করিয়া তাঁহারা মনে করিতেন, এই বুঝি আমাদের সেই উপাস্য দেবতা। হৃদয়ের ভাব বাহিরে নানা বস্তুতে আরোপ করিয়া তাহাকেই উপাস্য জ্ঞান করিতেন। এইখানে এক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তাহা এই যে, মানবাত্মার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মার জ্ঞান জড়িত। যদি বলা যায় যে, "এই টেবিলের উপরিস্থিত শেজটিকে ভাব," তাহা হইলে যেমন চতুর্দিকের আকাশের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শেজটির ধারণা করা সম্ভব নয়,

সেইরূপ মানব যখন নিজ জীবনের বিষয় চিন্তা করে, তখন জীবনের ভিত্তিস্বরূপ সেই মহা সত্তাকে ছাড়িয়া চিন্তা করিতে পারে না। এ জীবনের উপরে আমাদের কর্তৃত্ব নাই। যখন জীবন সঞ্চারিত হইয়া এই দেহরূপ মাংসপিণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখন কি আমার ইচ্ছায় হইয়াছিল? জীবনের উপর আমার কোনও হাত নাই। এই জীবন-স্রোত, শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুই আমার হুকুম মানিয়া চলে না। যে জীবনের উপর আমার হাত নাই, প্রভুত্ব নাই, তাহার কর্তা কি আমি? তবে এই জীবনের উৎস কোথা হইতে উৎসারিত হইতেছে? ইহার মূল কোথায়? ইহার আদি কোথায়? এইরূপ চিন্তা স্বভাবতই মানব-মনে উদিত হয়। জড়ের জ্ঞানের সঙ্গে আকাশের জ্ঞান যেরূপ, আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার জ্ঞানও সেইরূপ। এই মহা সত্তা দেখিয়াই অসভ্য বর্বর জাতিসকল চমকিত হইয়াছে এবং ইহার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়াই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে এই সত্তাকে আরোপ করিয়াছে।

সকল ধর্মাবলম্বিগণই বিশ্বাস করেন যে, এক ইন্দ্রিয়াতীত মহা সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছেন, যদ্দ্বারা মানব-জীবন নিয়মিত। এ স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বৌদ্ধরা ত ঈশ্বর মানে না। তাহার উত্তর এই, তাঁহারা এরূপ ঈশ্বর মানেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের জীবন কর্মের অধীন বলিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন। ইহার অর্থ এই যে, জীবন ভৌতিক নিয়মের অধীন নহে, ইহা এক ইন্দ্রিয়াতীত নিয়মের দ্বারা শাসিত। জীবনের এক অনন্তপ্রসারিত ক্ষেত্র আছে, তাহা হইতে জীবন আইসে। ইহাও এক অনন্ত সত্তা ও শাসন-শক্তিতে বিশ্বাসের ফল।

তৃতীয়ত, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম তুলনা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সত্তা বা শক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জীবনকে

ইহার অধীন করাই ধর্ম; জগতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরই এই বাসনা যে, জীবনকে কি উপায়ে এই শক্তির অধীন করা যায়। বৌদ্ধদিগের উদ্দেশ্য তাহাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, হৃদয়ের সমগ্র বাসনাকে বিনাশ করিয়া জীবনকে এই নিয়মের অধীন করিতে চান। হিন্দুর মনে এই বাসনা যে, জীবনের অধিপতি যিনি, জীবন তাঁহার অধীন করিতে হইবে। খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মাবলম্বি-দিগেরও এই বিশ্বাস যে, এই ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি দ্বারা জীবনকে নিয়মিত করাই ধর্ম। এইরূপ বিশ্বাস সকল জাতিতেই প্রস্ফুটিত।

অসভ্য বর্বরদিগের মধ্যে ইহার ভাব কিঞ্চিৎ স্থূল। খাসিয়া-জাতীয় লোকেরা মনে করে যে, মুরগীর ডিম ভাঙিলেই ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইবেন। কেহ কেহ মনে করে, কঠোর তপস্যা দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হইবেন। সকলের এই একই উদ্দেশ্য যে, সেই পুরুষ যাহা চাহেন, তাঁহাকে তাহা দিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে হইবে, ইহাই ধর্ম।

চতুর্থত, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যুগে যুগে সকল জাতিতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং নানা গ্রন্থেও সেই অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও জাতিতে কোনও সত্য অধিক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং কোন জাতিতে বা অল্প ফুটিয়াছে। যেমন মানব-চরিত্রের গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্ফুটিত, সেইরূপ ধর্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম, ধর্মের এই তিনটি অঙ্গ। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল জাতিতেই অল্পাধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতবর্ষ নামক স্থানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কেবল যে তাঁহাদের মধ্যেই ঈশ্বর সত্য ঢালিয়া দিয়াছেন,

তাহা নহে। বাহিরের বাণিজ্য যখন ছিল না, লোকে যখন ভিন্ন দেশে যায় নাই, তখন তাহারা ভাবিত, আমাদের দেশে যেমন পাট হয় এমন আর কোথাও নাই ; কিন্তু এখন লোকে বলে, ভাল পাট ত আমাদের দেশ ছাড়া অন্য দেশেও আছে। পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেন যে, আমাদের ধর্মের মত ধর্ম আর জগতে নাই। কিন্তু এখন চিন্তাশীল লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত ; সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরম সত্য হইতেই সকল প্রকাশিত। এই আধ্যাত্মিক সত্যের অভিব্যক্তি সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফুটিয়াছে। কোনও সত্য অভিব্যক্ত হয় নাই এমন দেশ কোথায় আছে? আবার ইহাও সত্য যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ অপূর্ণ মানব-ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদও বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল ধর্মগ্রন্থেই যেমন ঈশ্বর-প্রকাশিত সত্য রহিয়াছে, তেমন তাহার সঙ্গে জাতিগত ভ্রমও মিলিত আছে।

ইহা হইতে আমরা এক মূল সত্যে উপনীত হই। প্রথম, ধর্মের ভিত্তি মানব-সাধারণের প্রকৃতিতে ; অতএব ধর্মের ভিত্তি সার্বভৌমিক। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের মুল সত্য সার্বভৌমিক। প্রথম অস্থিসংস্থান, তৎপর রক্তমাংস গঠন হইয়াছে। তৃতীয়ত, ধর্মের আকাঙ্ক্ষা ও অভিব্যক্তি সার্বভৌমিক। এই সার্বভৌমিক অস্থিসংস্থানের উপর বিশেষ বিশেষ জাতি এবং ধর্ম বিশেষ বিশেষ অঙ্গ গঠন করিয়াছেন।

অনুধাবন করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, মানব-জাতি একটি বৃহৎ পরিবার ; ঈশ্বর পিতা, পৃথিবী বাসস্থান এবং সকলে ভাই-ভগিনী। মানব-সমাজ ধর্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র। যখন দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর সকলের পিতা, পৃথিবী বাসস্থান এবং জগতের সাধু-ব্যক্তিগণ

জ্যেষ্ঠ সহোদর, তখন মনে কি মহৎ উদার বিশ্বজনীন ভাবের উদয় হয়! সংসাররূপ রঙ্গভূমিতে আমরা এক-একজন নট, অধিকারী পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাঁহার বীণার সহিত সুর মিলাইয়া জগতের সাধুরা গান করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি মানবের ধর্মভাবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই সকল ভাব কি আশ্চর্য-রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মহাত্মা বুদ্ধের শান্ত-ভাব, মহম্মদের দাস্যভাব, যীশুর বাৎসল্যভাব, হাফেজের সখ্যভাব এবং চৈতন্যের মধুরভাব। এক এক সাধু এক এক ভাবের অবতার ছিলেন। এই সকল চরিত্র আলোচনা করিয়া আমাদের মনে কি মহৎ ভাবের উদয় হইতেছে!

সৌভাগ্যবশত বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণে যে মহৎ ভাব আমাদিগের অন্তরে আসিতেছে, তাহা যদি কেবলমাত্র ভাষাতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে মানবের হৃদয় পরিবর্তিত হইবে না। যে চিন্তা কেবল মানব-মনেই রহিয়াছে, সে চিন্তা জনসমাজের পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না। কোনও নূতন ভাব আসিলে তাহার মূর্তি গ্রহণ করা চাই অর্থাৎ কতকগুলি জীবন্ত লোকের মধ্যে সে ভাব বদ্ধমূল হওয়া চাই এবং সেই ভাবের সাধন হওয়া আবশ্যক। এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আমাদের দেশে দুইটি সত্য আবির্ভূত হইয়াছে। প্রথম বৌদ্ধধর্মের বাসনা-বিনাশ, দ্বিতীয় অদ্বৈতবাদ। বাসনা-বিনাশের ভাব এই যে, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদের মর্ম এই, "কে বা কার কে তোমার, কারে বল রে আপন।" বুদ্ধের বাসনা সম্বন্ধে যে উপদেশ, তাহা কেবল তাঁহার চিন্তার ভিতরেই ছিল না, কিন্তু

সকল শিষ্যকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে ইহার শক্তি বাড়িল, মানবের চিন্তাকে ফিরাইল। এইরূপে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধেও দেখা যায় যে, শঙ্করের পরে পরমহংস -দল এই মত প্রচার করিতেছেন। এইরূপ সার্বভৌমিক ধর্মভাব যদি কেবল কল্পনাতেই থাকে, তবে মানব-সমাজের চিন্তাকে পরিবর্তিত করিতে পারিবে না। অতএব ইহা সাধন করিবার জন্য সাধকদল চাই, গুরুপরম্পরা চাই ; অন্যথা ইহার শক্তি বিকাশ হইবে না।

বর্তমান সময়ে এই সার্বভৌমিক ধর্মভাব সাধনের ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ। একবার মান্দ্রাজে একটি কৃষি-কলেজ দেখিয়াছিলাম। তাহাতে ছাত্র-দিগকে বিদেশীয় কৃষি-প্রণালী হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, কেবলমাত্র উপদেশে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ হয় না। সার্বভৌমিক ধর্মভাব যে জগতে প্রকাশ হইতেছে, তাহা কাজে সাধন করিবার যদি ক্ষেত্র না থাকে, তাহা হইলে তাহা মানব-চিত্তকে অধিকার করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজই সেই ক্ষেত্র।

খ্রীষ্টধর্ম জগতে জয়ী হইবার কারণ কি? যীশু নিজের জীবনে নিজের উপদেশের জ্বলন্ত ছবি দেখাইয়াছিলেন। সত্যকে প্রাণ দিয়া না ধরিলে তাহার শক্তি হয় না। প্রেমের বলে সত্যের বল, অতএব ইহা সাধনের জন্য ক্ষেত্র চাই। ব্রাহ্মসমাজ সেই ক্ষেত্র। তাই বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী সকল সমাজই আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় হইবে। ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম আসিয়াছে, অতএব হিন্দুর রক্ত ইহার দেহে না লাগিয়া থাকিতে পারে না। ইউরোপ বা আরব দেশে যদি ব্রাহ্মধর্ম যায়, সেখানকার রক্ত গায়ে লাগিবে। ইংলণ্ডে ভয়সী সাহেবের সম্প্রদায় কি ব্রাহ্ম নন?

তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় সার্বভৌমিক ধর্মের উপাসক। তাঁহাদিগের ভাবের অঙ্গ খ্রীষ্টীয়ানের রক্ত দিয়া গঠিত, কাজে আমাদিগের সহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ব্যক্তিগত বিভিন্নতা থাকিলেও জগতে এই শক্তি অভ্যুদিত হইবে, জগতে উহা ব্যক্ত হইবে।

বর্তমান সময়ে কোন কোনও বিজ্ঞ লোক মনে করেন যে, অভ্রান্ত গুরু না হইলে ধর্মসমাজ স্থাপিত হইতে পারে না। আবার কোন কোনও বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল লোকের মুখে ইহা শুনিয়াছি যে, সার্বভৌমিক ভাব গ্রহণ করিয়া ধর্মসমাজ গঠন করিতে পারা যায় না। ইংলণ্ডে একজন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী প্রচারক প্রতি রবিবারে যীশুর নাম ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপি ভিন্ন ধর্মসমাজ গঠন করেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন যে, "আমার বিশ্বাস এই সার্বভৌমিক ভাব লইয়া ধর্মসমাজ গঠন হইবে না।" এইরূপ এক সময়ে জগতের লোক ইহা বলিত যে, রাজার শক্তি ছাড়িয়া রাজতন্ত্র ছাড়িয়া রাজ্য থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিলে জনসমাজ থাকিতে পারে না। এখন দেখি, প্রজাতন্ত্র প্রবল হইয়াও রাজ্য চলিতেছে, জাতিভেদ ভাঙিয়া দিয়াও সমাজ চলিতেছে, বরং পূর্বাপেক্ষা অতি সুন্দর রূপেই চলিতেছে।

যাঁহারা রাজতন্ত্রে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বলা স্বাভাবিক যে, রাজাকে ছাড়িয়া দিলে রাজ্য থাকিবে না। অভ্রান্ত শাস্ত্র -বিশ্বাসকারীরা ও গুরুবাদিগণেরও এই বিশ্বাস স্বাভাবিক যে, গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র ভিন্ন কি করিয়া ধর্ম থাকিবে? মানবের প্রকৃতির উপরেই ধর্মের ভিত্তি। অদ্য যাহা লোক বিশ্বাস করে, কল্য তাহার পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া মানবের ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতা হইবে না।

সার্বভৌমিক ধর্মভাব ও ধর্মসমাজ গঠন

লক্ষ্যের স্থিরতা, উদ্দেশ্যের একতা এবং সাধনের দৃঢ়তা এই তিনটি গুণ ছাড়া ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার কিংবা রাজনৈতিক সংস্কার হইতে পারে না। ব্রাহ্ম মাত্রকেই এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যদি এই উদার ধর্মকে রক্ষা করিতে চাও, দশজনে মিলিয়া ঠিক কর, কি করিতে হইবে। চিত্তকে চঞ্চল হইতে দিও না, লক্ষ্য দৃঢ় রাখ। ঈশ্বরের মহিমা অপেক্ষা আপনার মহিমা যদি অন্বেষণ করিয়া বেড়াও, আপনাকে যদি বড় করিতে চাও, তবে কিছুই হইবে না। বিমল হৃদয়ে সত্যকে চাহ, তদ্‌ভিন্ন উদ্দেশ্যের একতা হইবে না। মহৎ উদার সার্বভৌমিক ধর্ম আমরা পাইয়াছি, আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হই।

৮ মাঘ ১৮১৬ শক। ১৮৯৫ খ্রী

ধর্মবিধানে দেব ও মানব

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়— "ধর্ম-বিধানে দেব ও মানব"। বিষয়টি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে ভয় হয় যে, একটি বক্তৃতায় ও অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সমুচিত রূপে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। তথাপি যদি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় কিছু সময় ব্যয় করিয়া আমাদিগের আত্মা ও হৃদয় ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করে, যদি তাঁহার মঙ্গলবিধান অন্তরে প্রতীতি করিতে ও তাঁহার করুণা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলেও যথেষ্ট।

জগতের জাতি-সকলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত যদি আমরা চিন্তা-সহকারে আলোচনা করি, বিশেষত বিশেষ বিশেষ জাতির ধর্ম-চিন্তা ও ধর্মভাব -সকলকে পরীক্ষা করি, কোন্ কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ সত্য, কোন্ কোন্ ভাব, কোন্ কোন্ ধর্ম-চিন্তার প্রণালী কার্য করিয়াছে, কোন্ কোন্ পরমার্থতত্ত্ব কি প্রকারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাই, জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে।

সচরাচর জগতের লোক চারি প্রকারে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছে। ইহা অতি পুরাতন কথা, আপনারা অনেকে অনেকবার এই কথা শ্রবণ করিয়াছেন; তথাপি অনেক পুরাতন কথারও বার বার আলোচনা দ্বারা আমরা উপকার পাইয়া থাকি। ঈশ্বরকে আমরা চারি ভাবে দর্শন করিতে পারি ও চারি ভাবে ধ্যান করিতে পারি। এই চারি প্রকারের ঈশ্বর-দর্শনই আমাদিগের আত্মার উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই চারি প্রকারের ঈশ্বর-ধ্যানই আমাদিগের সাধনের সাহায্য করে। প্রথমত, ঈশ্বরকে জড়জগতের মধ্যে দর্শন করা; জড়জগতের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের

মধ্যে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পারি। দ্বিতীয়ত, প্রাণী-জগতে মনুষ্যেতর প্রাণি-সকলের গতি ও ক্রিয়ার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। তৃতীয়ত, মানব-সমাজের গতিবিধি, আচার-ব্যবহার, উত্থান ও পতন, হর্ষ ও বিষাদের মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পারি। চতুর্থত, আত্ম-মন্দিরে আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে তাঁহাকে দেখিতে পারি।

জড়জগতে সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের মধ্যে যখন তাঁহাকে দেখি, তখন দেখি, অনিত্য অস্থায়ী যাহা কিছু তাহার মধ্যে তিনি নিত্য। তাবৎ পদার্থের উপরেই মৃত্যুর অধিকার। বিজ্ঞান বলিয়া দিতেছে, এমন এক সময় ছিল, যখন আকাশে সূর্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এই মেদিনী ছিল না। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড তরল বাষ্পাকারে ঘূর্ণিত হইতেছিল। কত লক্ষ লক্ষ বৎসরের পর এই যে তরল বাষ্প তাহা ঘনীভূত হইল। এই সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মেদিনী সকলই প্রকাশিত হইল। আবার এমন সময় আসিতে পারে, যখন এই সূর্য নিভিয়া যাইবে, চন্দ্র থাকিবে না, পৃথিবী চূর্ণ হইবে, সমুদয় বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সকলই পরিবর্তনশীল, সকলই অস্থায়ী ; ইহার মধ্যে তিনি অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ বৎসর অনন্ত কাল-সাগরের তুলনায় অতি সামান্য। সকলই পরিবর্তনশীল ; ইহার মধ্যে তিনি নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সৃষ্টির এই সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি নিত্য রূপে সুন্দর রূপে বর্তমান রহিয়াছেন।

তাহার পর জড়জগৎকে অতিক্রম করিয়া প্রাণিজগতে উপস্থিত হইলে আমরা তাঁহাকে চৈতন্য রূপে দেখিতে পাই। সকল চেতনের মধ্যে তিনি চৈতন্য রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জড়জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল অন্ধশক্তি-সকলের ক্রীড়া দেখিতে পাইতে-ছিলাম। এখন চেতন-জগতে প্রবেশ করিয়া জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

হইল। এই জগতে জীবনের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে? কি প্রকারে জড়জগতে অন্ধশক্তি-সকলের ক্রীড়ার মধ্য হইতে চৈতন্য জন্ম-লাভ করিয়াছে? এই মহা সমস্যার আলোচনায় জগতের পণ্ডিতগণ আজও নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিচারের সম্বন্ধে আমি বেশি বলিব না। পণ্ডিতেরা এইমাত্র বলিয়াছেন, "আমাদিগের বর্তমান জ্ঞান যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে জীবনের উৎপত্তির বিষয়ে এখনও কোনও আলোকই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।" সে যাহা হউক, আমরা চেতন-জগতের মধ্যে পরমচৈতন্য রূপে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। যে সত্তা বা শক্তি জড়ের বিভিন্ন রূপ ও ভাবের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই শক্তিই চেতনের মধ্যে চৈতন্যের আকারে উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

তৎপরে জড়- ও প্রাণি-রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্য-রাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখি যে, মানব-ইতিবৃত্তে বিধাতা রূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনিই মানবকে রক্ষা ও পালন করিতেছেন; মানব-সমাজের গতিবিধিতে, উন্নতি ও বিকাশের মধ্যে তিনি লীলা করিতেছেন।

তৎপরে আমাদিগের আত্ম-মন্দিরের নিভৃত কন্দরে তাঁহার দর্শন পাই। তখন আমাদিগের আত্মার পরমাত্মা রূপে, আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি রূপে, আত্মার অন্তরালস্থিত নিত্য সত্তা রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই।

এই চারি প্রকার ঈশ্বর-দর্শনের কথা উপনিষদের একটি শ্লোকে নিবদ্ধ রহিয়াছে—

> নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
> একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
> তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
> স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য রূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, যিনি বিধাতা হইয়া একাকী বহু প্রাণীর কামনা-সকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যাঁহারা আত্মস্থ বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহারাই পরম শান্তি প্রাপ্ত হন— অপর কেহ তাহা প্রাপ্ত হন না।

তাঁহাকে এই চারি প্রকারেই ধ্যান করা যাইতে পারে। তাঁহার এই চারিটি ভাবই সাধনের বিষয়ীভূত হইতে পারে এবং সাধিত হইলে ধর্মজীবনের সহায়তা করে।

জগতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন জাতি এই চারি প্রকারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক জাতির ধর্মভাব ও ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, জড়রাজ্যের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরকে সাধন করিয়াছিলেন। সাধনের প্রণালী নাকি সাধকের জীবনকে অধিকার করে, সাধকের চরিত্রকে অনেক পরিমাণে গঠিত করে; এইজন্য গ্রীকদিগের জাতীয় চরিত্রে সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বর-দর্শনের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের শিল্প, প্রাচীন গ্রীকদিগের সাহিত্য, প্রাচীন গ্রীকদিগের যাহা কিছু, সকলই সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। সৌন্দর্যের সাধন গ্রীস দেশের সকল বিষয়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের ধর্মতত্ত্বও তাহাদিগের সাধনপ্রণালীর দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। গ্রীকদিগের মধ্যে কার্যে কদর্যতা ও পাপ একই বস্তু। চক্ষে যাহা কদর্য, তাহা যেমন শিল্পে ও বাহ্যজগতে বর্জনীয়, তেমনি চিন্তায় যাহা অসুন্দর, তাহা জ্ঞানের পক্ষে পাপ, জ্ঞানের পক্ষে বর্জনীয়; ভাবেতে যাহা অসুন্দর হৃদয়ের পক্ষে তাহা পাপ; নীতিতে যাহা কুৎসিত, তাহাই নীতি সম্বন্ধে পাপ ও মানবের পক্ষে বর্জনীয়। মুক্তি তাঁহাদিগের মতে সৌন্দর্য। সৎনীতির অর্থ আচরণের সৌন্দর্য। এই

সৌন্দর্যের ভাব তাঁহাদিগের চিন্তায়, তাঁহাদিগের সাহিত্যে, তাঁহাদিগের জাতীয় চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, একেবারে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

অপর দিকে প্রাচীন য়িহুদী জাতি ঈশ্বরকে বিধাতা রূপে মানব-ইতিবৃত্তে ও জনসমাজে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের জাতীয় চরিত্রে, কার্যে, চিন্তায়, প্রার্থনায়, আকাঙ্ক্ষায়, শিল্পে, সাহিত্যে সর্বত্র ঐ সাধনের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের পাপের অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ঈশ্বর ন্যায়কারী, ঈশ্বর মানব-চরিত্রের প্রভু, ঈশ্বর মানব-সমাজের বিধাতা। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা, তাঁহার হুকুম অগ্রাহ্য করাই পাপ ; মুক্তির অর্থ বিধাতার ইচ্ছা-পালন। এইজন্য ইঁহাদিগের ধর্ম বাধ্যতার ধর্ম। ঈশ্বরের বাধ্য, অনুগত হওয়া, তাঁহার নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে জীবন যাপন করা, তাঁহার শাসনের অনুগত হওয়াই ধর্ম। এই য়িহুদী ধর্মের দুইটি শাখা আছে—সে দুটি, খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম। হয়ত ইসলাম ধর্ম -বিশ্বাসীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিবেন না যে, ইসলাম ও য়িহুদী ধর্মের মধ্যে মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অনেক ভাব য়িহুদী ধর্ম হইতে খ্রীষ্টীয় ও ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। ঈশ্বর মানব-সমাজের প্রভু, মানব-সমাজের ঘটনা-সকলের মধ্যে বিধাতা ; ঈশ্বর মানব-জীবনে, মানবের চরিত্রে শাসনকর্তা ; তাঁহার আদেশের, তাঁহার শাসনপ্রণালীর বিরোধী হওয়াই পাপ— এই সকল ভাব প্রাচীন য়িহুদী ধর্মের মধ্যে অনেক পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং য়িহুদী ধর্ম হইতেই উক্ত উভয় ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

আমাদিগের দেশের প্রাচীন সাধকগণ ঈশ্বরকে আত্মাতে পরমাত্মা রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগের দেশের চিন্তায়, সাহিত্যে, কার্যে ও আকাঙ্ক্ষায় সকল বিষয়েই এই সাধনের ভাব

প্রবেশ করিয়াছে। এই ভাবে ঈশ্বর-দর্শনের ফলে হিন্দুরা ধ্যানপরায়ণ, এবং তাঁহাদের ধর্ম সমাজবিরোধী ধর্ম। এইজন্যই তাঁহারা মোহকে পাপ বলিয়াছেন। পাপ আর কিছুই নয়, অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করা, অসারকে সার জ্ঞান করা, এই প্রকারের অজ্ঞতা বা মোহই পাপ। মুক্তির অর্থ প্রকৃত জ্ঞান, দিব্যজ্ঞান লাভ করা, নিত্যকে নিত্য-রূপে দেখা, ও অনিত্যকে অনিত্য জানিয়া পরিত্যাগ করা। সকলে সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন যে, এই যে জগৎকে ও জনসমাজকে ভুলিয়া গিয়া আত্মায় পরমাত্মাকে দর্শন করা, এই ভাবের ধর্ম সমাজ-বিরোধী ধর্ম হইবে। এই ধর্মের সাধনপ্রণালী মানুষকে সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। এজন্য এ দেশে ধর্মচিন্তার গতিই এই যে, মানব-সমাজকে ত্যাগ কর, মানব-সমাজ হইতে দূরে গিয়া নির্জন গিরিকন্দরে বসিয়া সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা কর, অনিত্যকে ত্যাগ করিয়া নিত্যকে দর্শন কর।

এই চতুর্বিধ ঈশ্বর-দর্শনের মধ্যে জড়ে, চেতনে, আত্মাতে যে তাঁহার দর্শন, এই ত্রিবিধ দর্শনে কোনও বিঘ্ন ও বিরোধ উপস্থিত হয় না। যতক্ষণ কেবল জড়জগতে শক্তি রূপে অথবা চেতনের মধ্যে পরম-চৈতন্য রূপে অথবা আত্মমন্দিরে পরমাত্মা রূপে তাঁহাকে দেখি, ততক্ষণ কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু যখন মানব-সমাজে অধিপতি রূপে তাঁহাকে দেখিতে যাই, যখন দেখি যে, মানব-ইতিবৃত্তে তিনি লীলা করিতেছেন, মানব-চরিত্রের প্রভু রূপে তিনি লীলা করিতেছেন, তখন মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা লইয়া এক মহা বিরোধ উপস্থিত হয়। মানুষ যদি স্বাধীন হয় এবং তিনি মানব-ইতিবৃত্তে লীলা করিতেছেন, যদি এরূপ বলিতে হয়, তবে সে ইতিবৃত্তের কতটা তিনি করিতেছেন ও কতটা মানুষ করিতেছে, তাহা কিরূপে স্থির করিব? জগৎ মানবের

রঙ্গভূমি, এবং তাহার শরীর মনে যে-সকল শক্তি রহিয়াছে তাহারই ব্যবহার করিয়া মানব রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছে। এই জগৎ-রঙ্গভূমিতে অন্তর ও বাহিরের শক্তিসকল, পদার্থসকল ও অবস্থা-সকলের মধ্য হইতে মানব-সমাজে আচারব্যবহার-সকল প্রস্ফুটিত হইতেছে এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি এবং শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ হইতেছে। সেই সকল সামগ্রীর সাহায্যেই সর্ব বিষয়ে মানব-সমাজ উন্নতি লাভ করিতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই উন্নতির মধ্যে কতটা ঈশ্বরের ও কতটা মানবের কার্য ?

এই প্রশ্ন অতি কঠিন, অতি গুরুতর। হয় বল যে, মানব এই জগৎ-রঙ্গভূমিতে যাহা কিছু লীলা করিতেছে, নটের ন্যায় যাহা অভিনয় করিতেছে, সমুদয়ই ঈশ্বরের ; তিনিই কাজ করিতেছেন, পুতুলের মত মানুষের মাথায় তার দিয়া স্বয়ং সেই তার হাতে রাখিয়া মানবকে ক্রীড়া করাইতেছেন ; মানুষ পুতুলের মত হাত পা নাড়িতেছে, কিন্তু তাহা তাহার নিজের কাজ নয়, সকলই ঈশ্বরের কাজ ;— না হয় বল, ঈশ্বর কোথাও নাই, এই জগৎ-রঙ্গভূমিতে কেবল মানুষই ক্রীড়া করিতেছে, মানবেরই সুখস্বার্থের লীলা হইতেছে, ঈশ্বর এখানে কোথাও নাই। যদি বল, দেব ও মানব দুইই আছে, তবেই এ প্রশ্ন বড় কঠিন হয়। কারণ, মানুষ স্বাধীন ; মানব কেমন করিয়া আপনার ইচ্ছার ও ক্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাঁহার অধীন হয়, তাঁহার ইচ্ছাকে পূর্ণ করে ? ইহা অতি কঠিন সমস্যা। অথচ ইহা নিশ্চয় যে, জগৎ-রঙ্গভূমিতে, মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে, তিনিও আছেন, মানবও আছে ; উভয়ের মিলিত শক্তিতেই এই মানব-ইতিহাস ফুটিয়া উঠিতেছে।

পূর্বে মানবের ধারণা ছিল যে, জগতে স্বাভাবিক নিয়মে যে কিছু কার্য হইতেছে তাহার মধ্যে তিনি নাই ; তাহা তাঁহার কাজ নয়, তাহা

নিয়মেরই কাজ। অপর দিকে মানুষে প্রতিদিন লৌকিক রীতিতে যে কিছু কাজ করে, মানুষের আহার, নিদ্রা, ধনোপার্জন, পরিবার প্রতি-পালন প্রভৃতি কার্যের মধ্যে ঈশ্বর নাই। এক স্থানে প্রাকৃতিক নিয়মেই কার্য হইতেছে, অপর স্থানে মানব-ইচ্ছাতেই সকল কার্য সম্পন্ন হইতেছে। তবে যদি প্রাকৃতিক কোনও নিয়মকে রহিত করিয়া, স্থগিত করিয়া কোনও কার্য সাধিত হয়, তাহা ঈশ্বরের কার্য। যাহা কিছু স্বাভাবিক ও নিয়মের অধীন, তাহা ঈশ্বরের ক্রিয়া নয়; যাহা কিছু আকস্মিক, অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য ও নূতন তাহাই ঈশ্বরের কার্য। সেইরূপ মানবের দ্বারা যে কোনও অলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই ঈশ্বরাধীন ক্রিয়া।

এইরূপ চিন্তা-প্রণালী হইতেই অলৌকিক ক্রিয়ার মত প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রতিদিনই ত পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হইতেছে, এ আর ঈশ্বরের কাজ কি? এ ত নিয়মেরই কাজ। ইহাতে তিনি না আসিলেও চলে। মানুষ দৈনিক জীবনে যাহা কিছু করে, যাহা মানুষ প্রতিদিনই করিতেছে এবং স্বভাবত করিবে, তাহার মধ্যে আর ঈশ্বরের ক্রিয়া কোথায়? সে সকল ত কেবল মানুষেরই কাজ। এই ভাব হইতেই পূর্বকালের লোকেরা প্রচার করিয়াছেন যে, ঈশ্বর সময়ে সময়ে আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন। প্রকাশ করেন কিরূপে? না, অলৌকিক ক্রিয়াসকলের মধ্য দিয়া। সূর্য প্রতিদিনই উদয় হইতেছে, একদিন তিনি নিবাইয়া দিলেন; জল তরল বস্তু, সেই জলের উপর দিয়া তাঁহার শক্তি-প্রভাবে একজন হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন, অথবা তাঁহার শক্তির সাহায্যে কেহ একজন মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিলেন। এই প্রকারে প্রকৃতিতে অথবা মানবের ক্রিয়াসকলের মধ্যে অলৌকিক ঘটনাসকল ঘটাইয়া ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন।

এইজন্য অতীত কালে লোকে যাঁহাকে ভক্তি করিয়াছে, তাঁহার

সম্বন্ধে অলৌকিক ক্রিয়াসকল আরোপ করিয়াছে। ধর্মপ্রবর্তক মহাত্মা-গণকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক ক্রিয়া আরোপ করা হইয়াছে। কেহ যে লোক-প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে কোনও অলৌকিক ক্রিয়ার বিষয় সৃষ্টি করিয়া বা কল্পনা করিয়া আরোপ করিয়াছেন, এ অর্থে আরোপ বলিতেছি না; যাহা সত্য ঘটনা নয়, কেহ তাহা রচনা করিয়া উঁহাদিগকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজেরাই ভ্রান্ত হইয়া এরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন ও অপরের নিকট ঐ প্রকার কথা প্রচার করিয়াছেন।

মানুষ যখনই কাহাকেও ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে, তখনই তাহার সম্বন্ধে অলৌকিক কিছু আরোপ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। যাহা সকলেই করে তাহাই যদি তুমি কর, তবে আর তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত কিসের? আমিও খাই, ঘুমাই, তুমিও খাও, ঘুমাও— তুমি আর বেশি কি করিলে যে, তোমাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিব?

কথিত আছে, এরূপ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে বলিলে মহম্মদ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। বুদ্ধ কখনও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের প্রয়াস পাইতেন না। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে পাইয়া তিনি নিয়ম করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ ইহা প্রচার করিবে, সে তাঁহার শিষ্যদলের মধ্যে থাকিতে পারিবে না। অথচ তাঁহারই শিষ্যগণ পরবর্তী সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে কত অলৌকিক ক্রিয়া আরোপ করিয়াছেন! বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ-সকল পাঠ করিলে সে-সকল জানিতে পারা যায়। এইরূপ সর্বত্রই লোকের এই ভাব দেখি যে, কিছু অলৌকিক না হইলে যেন তাহা দৈব নহে।

কিন্তু ইহা ভ্রান্তি। স্বাভাবিক ঘটনাসকলের মধ্যে, প্রকৃতির নিয়ম ও বিকাশের মধ্যে নিরন্তর, দিবানিশি, প্রতি মুহূর্তে তিনি লীলা করিতেছেন। বিশ্বাসচক্ষে ইহা দেখা আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতেছেন। সূর্যকে দাঁড় করাইয়া না রাখিলেই যে তাঁহার লীলা হইল না, তাহা নহে। জগতে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু ঘটিতেছে, আমাদিগের চারিদিকে, জড়ে ও চেতনে যাহা কিছু হইতেছে, সকলে তাঁহারই ক্রিয়া, সকলে তাঁহারই লীলা। বিশ্বাসের ও প্রেমের চক্ষে দেখিলেই হইল। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীতে এই প্রভেদ— দেখা, আর না দেখা। এ কথা তবে সত্য যে, জগৎ-রঙ্গভূমিতে ও মানব-ইতিবৃত্তে দেব ও মানব উভয়েই লীলা করিতেছেন। কিন্তু কতটুকু কাহার কাজ তাহা বাহির করি কি করিয়া?

জড়জগতের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যে ও স্বাভাবিক নিয়মে যেমন তাঁহারই ইচ্ছার প্রকাশ, মনুষ্যেতর প্রাণী-রাজ্যে যেমন তাঁহারই জ্ঞান ও প্রেমের প্রকাশ, মানবের দৈনিক জীবনের মধ্যে এবং মানব-সমাজের গতিবিধির মধ্যেও তেমনি তাঁহারই লীলা। মনুষ্য-সমাজকে সমগ্র ভাবে দেখিলে আমরা অনুভব করি যে, মনুষ্যের অনেক কার্য ইতর প্রাণীদিগের কার্যের ন্যায়। আমরা সকলে ইহা জানি যে, সমুদ্র-মধ্যে যে-সকল প্রবাল-দ্বীপ আছে, তাহা বহু লক্ষ প্রবাল-কীটের বহু বৎসরের শ্রমের ফলস্বরূপ। কালে ঐ সকল দ্বীপ জীবের আবাস-স্থান হইয়া ফলশস্যে পূর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল প্রবাল-কীট যখন দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিয়াছে, তখন কি তাহারা জানিত যে, তাহাদের শ্রমের ফলস্বরূপ সাগর-বক্ষে দ্বীপ প্রকাশ পাইবে, তাহা আবার জীবের বাসোপযোগী ও ধনধান্যে পূর্ণ হইবে এবং তাহাদিগের শ্রমের ফলের দ্বারা জগতের উন্নতির সাহায্য হইবে? তাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসকলের বশবর্তী হইয়া কার্য করিয়াছে, কিন্তু

তাহাদের কার্যের ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাহাদের মনে ছিল না, ঈশ্বরের মনে ছিল। তিনি অদ্ভুত প্রণালীতে তাহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত ও লক্ষ্যান্তর সাধনে নিযুক্ত কার্যকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখিয়া আর-এক প্রকার মহৎ ফল উৎপন্ন করিয়াছেন, নিতান্ত ক্ষুদ্র ও হীন-অবস্থাপন্ন কীটের শ্রমের দ্বারা জগতের উন্নতি সাধনের উপায় করিয়াছেন।

মনুষ্য-সমাজের কার্যও কি কতকটা এইরূপই নহে? এই যে জগতে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার, মানবের স্বার্থপ্রণোদিত সহস্র প্রকার কার্য, এ সকলের ভিতরে তাঁহারই ইচ্ছা মানব-ইচ্ছাকে আশ্চর্য ভাবে লইয়া যাইতেছে। জগতের প্রাচীন ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, এক-একটি মহানদীর কূলেই প্রবল সাম্রাজ্যসকলের সূত্রপাত হইয়াছিল ও এক এক প্রকার জাতীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই-রূপে ভারতের সিন্ধু নদের উপকূলে প্রাচীন আর্য সভ্যতা ও মিশর দেশে নীল নদের উপকূলে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, যাহারা ঐ সকল নদীর কূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া-ছিল, ভবিষ্যৎ উন্নত ও সভ্য সমাজের নীতি, সভ্যতা, সমাজবন্ধন, এ সকল কি তাহাদের মনে ছিল? যে আদিম বর্বর মনুষ্যগণ সুমিষ্ট জল পাইবার আশায় ঐ সকল নদের তীরে গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা কি জানিত যে, কালে তাহাদেরই কার্যপরম্পরা হইতে বাণিজ্য, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি কত বিষয়ের উন্নতি হইয়া এক এক অভিনব সভ্যতার অভ্যুদয় হইবে? সে ছবি তাহাদের মনে ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের মনে ছিল। তিনি ঐ সকল প্রজাপুঞ্জের স্বাধীন ক্রিয়াসকলকে নিজ ইচ্ছাধীন রাখিয়া সেই অদ্ভুত সভ্যতাকে বিস্তার করিয়াছিলেন।

অতএব দেখিতেছি, মানবের স্বাধীনতা বিচিত্র কৌশলে এক স্থানে

তাঁহার অধীনতাতে পরিণত হইতেছে। তবে আর প্রবাল-কীটের সহিত আমাদের কি প্রভেদ থাকিল? প্রবাল-কীট যেমন না জানিয়া, না বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে, তেমনি কি মানবও অনেক সময় না জানিয়া তাঁহারই ইচ্ছাকে সম্পাদন করিতেছে না? এখানে কি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না যে, দুইজন রহিয়াছে? একজন নাচে, খেলে, কথা কয়; আর-একজন তাহা দিয়া কাজ আদায় করিয়া লন? যেমন কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিশুদিগকে খেলা দিয়া পড়া শিখান হয়। কতকগুলি তাস ছড়াইয়া দিয়া একটি শিশুকে বলা গেল, "ক'এর তাসখানি খুঁজিয়া লইয়া এস।" শিশু মহা আনন্দে লম্ফ দিয়া তাস খুঁজিয়া আনিতে গেল; বুঝিতে পারিল না যে, তাহাকে ফাঁকি দিয়া পড়া শিখান হইতেছে। তার মনে এক উদ্দেশ্য রহিয়াছে, আমার মনে অন্য ভাব। সে ভাবিতেছে খেলা, আর আমি ভাবিতেছি পড়া শিখান। তেমনি কি আমরা দেখিতে পাইতেছি না যে, সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনের কার্যসকলের মধ্যে দুইজনের কার্য থাকে? ক্ষুধার তাড়নায়, ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া নদীর উপকূলে যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দ্বারা কি আশ্চর্য উপায়ে বিধাতা জগতের উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছেন!

একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্তুর স্বাভাবিক অঙ্গ-কৌশল হইতে ঈশ্বরের সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তাহাদিগের মধ্যে কি অদ্ভুত বুদ্ধির কার্যসকল দেখা যায়, অথচ তাহাদিগের বুদ্ধি নাই। বুদ্ধি যে নাই তাহার প্রমাণ এই যে, তাহাদের কার্যে বৈচিত্র্য নাই ও উন্নতি নাই। চারি সহস্র বৎসর পূর্বে বাবুই যে-প্রকার বাসা বাঁধিত, আজ পর্যন্ত তাহা অপেক্ষা কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই। বুদ্ধি নাই অথচ বুদ্ধির কার্য করিতেছে। তবে সে বুদ্ধি

কোথায় রহিয়াছে? সে বুদ্ধির পশ্চাতে ঈশ্বরের হস্ত রহিয়াছে।

সেইরূপ মনুষ্যের কার্যকে সমগ্র ভাবে দেখিলে বোধ হয় যেন সে এক ভাবে কার্য করিতেছে, কিন্তু আর-একজন সেই কার্যকে অন্য ভাবে ব্যবহার করিতেছে। ইংরেজেরা যখন আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা আমাদিগের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি ও বিকাশের কথা মনে করিয়া ভারতের ভূমিতে পা দিয়াছিলেন? তাহা নহে। বাণিজ্য, ব্যবসায়, আপনাদিগের স্বার্থের উন্নতিই কেবল তাঁহাদের কল্পনাতে ছিল। কিন্তু বিধাতা কানে পাক দিয়া তাঁহাদের স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের মধ্য দিয়াই ভারতের উন্নতি সাধন করিয়া লইতেছেন। একজনের স্বার্থ হইতে তিনি আর-একটা কিছু করিয়া তুলিয়াছেন, আমাদের উঠিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

মানব-ইতিবৃত্তে কেবল মানুষেই কাজ করিতেছে, যিনি এই প্রকার দেখেন, তিনি এখনও ইতিহাস পড়িতে শিখেন নাই, ইতিহাস পড়িবার চক্ষু তিনি এখনও পান নাই। মানব-ইতিবৃত্তে দেব ও মানব দুই-ই রহিয়াছে। ইহা ভাবিলে এক এক সময়ে বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় যে, আমরা 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' 'স্বাধীনতা' বলি, কিন্তু কোথায় স্বাধীনতা? আমি নড়ি, চড়ি, বলি; কিন্তু চরমে দেখি, আমার কাজ ভাঙিয়া, চুরিয়া, গড়িয়া আর-একজন আর-একটা কিছু করিয়া তুলিতেছেন। আমি এক রকম ভাবি, কিন্তু আর-এক রকম করিয়া বসি। আমি যাহা চাহি নাই, যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই হইয়া উঠে। যেমন ধানুকীর ধনু হইতে যে শর নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যত দ্রুত বেগে ও যে দিকে নিক্ষিপ্ত হউক না কেন, তাহাকে বক্রাকার গতিতে যাইতেই হইবে এবং অবশেষে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতেই হইবে, তেমনি হে মানব! তুমি যতই বাঁকিয়া যাও না কেন, যতই পাপ সঞ্চয় কর না

কেন, তোমার স্বাধীন চিন্তা ও কার্য যত দিকেই প্রসারিত হউক না কেন, চরমে তাঁহার ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। কুমারী কব্ এক স্থানে বলিয়াছেন, আমাদিগকে মুক্তি পাইতেই হইবে। মুক্তি পাওয়া ছাড়া অব্যাহতি নাই। ঠিক কথা! এ কি রকম স্বাধীনতা? আমার মনে হয়, এ যেন আমাদের খোকার স্বাধীনতা। খোকা ঘরের ভিতর বেড়ায়, স্বাধীন ভাবে দৌড়াদৌড়ি করে, কিন্তু সে যাহা কিছু করে— খেলে, ছোটে, উঠে, পড়ে— সকলই মায়ের ঐ দশ হাত ঘরের ভিতর। অবশেষে যেমন তাহাকে মায়ের কোলেই পড়িতে হয়, আমাদিগের স্বাধীনতাও যেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করি, এ কি রকম স্বাধীনতা? হে বিধাতা, হে প্রভু! এ কি রকম স্বাধীনতা!

কেবল যে বাণিজ্য, রাজনীতি প্রভৃতিতে তাঁহার বিধাতৃত্ব দেখিতে হইবে তাহা নহে; জনসমাজের গঠনের মধ্যেও তাঁহার হস্ত দেখিতে হইবে। এই যে প্রণয়, পরিণয়, গৃহধর্ম, সামাজিক শাসন প্রভৃতি, ইহার মধ্যেও তিনি বিধাতা রূপে বিদ্যমান। বহুসংখ্যক ব্যক্তির সমষ্টির দ্বারা এক এক ব্যক্তির রক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতি প্রভৃতির সহায়তা হইতেছে। জনসমাজের দ্বারা ঈশ্বরের সে অভিপ্রায় কেমন সুসিদ্ধ হইতেছে! প্রত্যেক গৃহে শিশুগণ লালিত ও শিক্ষিত হইতেছে। রাজনীতি ও সমাজনীতি দ্বারা প্রজাকুলের ধন মান প্রাণ রক্ষা হইতেছে। বিধাতা কেমন আমাদিগের দ্বারাই তাঁহার কার্য করিয়া লইতেছেন! কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত! তিনি যে মূর্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া আসিয়া আমাদিগকে পালন করিতেছেন, তাহা নয়। আমাদের পালনের জন্য পিতাকে দিয়াছেন, মাতাকে দিয়াছেন। মা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারই কার্য করিয়া যাইতেছেন। শিশুকালে যখন মা আমাকে বুকে করিয়া পালন করিয়াছেন, যখন আমাকে কোলে

লইয়া আমার মুখ চুম্বন করিয়াছেন, তখন আমার অবোধ জননী জানিতে পারেন নাই যে, কিণ্ডারগার্টেনের শিশুর মত তাঁহাকে দিয়া বিধাতা আপনার কাজ করাইয়া লইতেছেন। এই যে প্রণয়, পরিণয়, গৃহস্থের ধর্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, সকলেরই মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা নিহিত। মানবত্বকে তিনিই চালাইয়া লইতেছেন। এ সকলকে বিধাতার বিধান বলিয়া দেখা উচিত। ইতিবৃত্তকে তাঁহার বিধান জানিয়া অধ্যয়ন করা উচিত।

ইতর প্রাণীদিগের ও মানব সমাজের কার্যে এই প্রভেদ দেখিতে পাইতেছি যে, ইতর প্রাণিগণ না জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করে, মানব জানিয়া তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদনে সহায় হইতে পারে। মানবেরই এই উচ্চ অধিকার। আমরা ইচ্ছা করিলে জনসমাজকে প্রত্যেক আত্মার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির অনুকূল করিয়া রাখিতে পারি, অথবা প্রতিকূল করিতে পারি।

বিভিন্ন জাতিসকলের ইতিহাস সমগ্র ভাবে অধ্যয়ন করিলে যেমন সাধারণ ভাবে তাঁহার বিধাতৃত্ব দেখিতে পাই, তেমনি আবার এক-একটি বিশেষ বিশেষ জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি বিশেষ ভাবে এক-একটি জাতিকে সাহায্য করিতেছেন, এক-একটি জাতির মধ্যে এক-একটি ভাব প্রস্ফুটিত করিতেছেন। যেমন চিত্রকর নানা পাত্রে নানা রং প্রস্তুত করিয়া রাখে, তেমনি জগতের বিধাতা নানা জাতির মধ্যে নানা ভাব প্রস্ফুটিত রাখিয়াছেন। সমগ্র জগৎকে পরিবেশন করিবেন বলিয়া নানা জাতির মধ্যে নানা ভাবের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রীকদিগের মধ্যে সৌন্দর্যানুরাগ, হিন্দুদিগের মধ্যে চিন্তাপরায়ণতা, য়িহুদীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ পালনে দৃঢ়তা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।

ইহাতে তাঁহার পক্ষপাত নাই। কারণ সমগ্র ভাবে জগতের ইতিহাসের

প্রতি দৃষ্টি করিলে ও বিভিন্ন জাতিসকলকে এক চক্ষে দেখিলে দেখা যায় যে, তিনি সমগ্র মানব-জাতিরই উন্নতির জন্য যে জাতি মধ্যে যাহা প্রয়োজন, সেখানে সেই ভাবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমার যদি পাঁচটি ছেলে থাকে, আর আমি যদি তাহাদের একজনকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা দিই, আর-একজনকে ডাক্তারি পড়িতে পাঠাই, আর-একজনকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিই, তবে কি তাহাতে আমার পক্ষপাত হয়? আমার পরিবারে যত কিছুর প্রয়োজন আছে, সে-সকল আমি এক-একটি ছেলেকে দিয়া করাইয়া লইতেছি। ইহাতে কি আমি পক্ষপাতী? এইরূপে বিধাতা সকল জাতির দ্বারা এক পরিবার গঠন করিতেছেন। সকল মানব-জাতিকে এক চক্ষে দেখিলে আর পক্ষপাত বলিয়া বোধ হইবে না। তিনি এক এক জাতিকে এক এক পাত্র স্বরূপ করিয়াছেন ও তাহাদিগের দ্বারা সকল মানব-জাতিকে পরিবেশন করিতেছেন।

হিন্দুগণ যে ধ্যানপরায়ণ, তাহার অর্থ এই নয় যে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে দক্ষিণ-সাগর, পশ্চিমে সিন্ধু নদ ও পূর্বে মণিপুরের পাহাড়, এই স্থানটুকুর মধ্যেই ধ্যানপরায়ণতা আবদ্ধ রহিয়াছে। সমুদয় জগতের জন্যই তিনি এক এক জাতির মধ্যে এক এক ভাবকে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির মুখপাত্রস্বরূপ এক-একজন মহাত্মা সেই সেই জাতির বিশেষ ভাবকে ঘনীভূত আকারে নিজ নিজ চরিত্রে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জাতিসকলের প্রতিনিধিস্বরূপ।

আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ ধর্মভাবকে পাঁচটি বিশেষ ভাবে বিভাগ করিয়াছেন— শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জগতের মহাত্মাগণের মধ্যে এই সকল ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বুদ্ধ শান্তভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন; মহম্মদ

দাস্যভাবে ঈশ্বর-সাধন করিয়াছেন; যীশু বাৎসল্যভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভাবিয়াছেন; কেহ কেহ ঈশ্বরকে ছোট শিশুর মত দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে গোপাল রূপে সাধন করিয়াছেন; হাফেজ সখ্যভাবে ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহাকে বলিতেন, 'আমার দোস্ত'; চৈতন্য মধুরভাবে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'আমার পতি'। যেমন ছোট ছোট কাঠ জুড়িয়া একখানি বড় চাকা প্রস্তুত হয়, তেমনি বুদ্ধ ও মহম্মদ, যীশু ও চৈতন্য, জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাত্মাদিগকে একত্র করিয়া দেখ, এক মহা সাধনচক্র প্রস্তুত হয়। জগতের হিন্দু ও মুসলমান, খ্রীষ্টীয় ও বৌদ্ধ, সকল সম্প্রদায়কে সমগ্র ভাবে ও একই চক্ষে দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, সকলের মধ্যে বিধাতা তাঁহার সত্যান্ন, ধর্মান্ন রন্ধন করিতেছেন, সমুদয় জগৎকে পরিবেশন করিবেন বলিয়া।

এই মহাভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেই দেখা যায় যে, তিনি যেমন দৈহিক অভাবসকল পূর্ণ করিবার জন্য বাণিজ্য, শিল্প, সভ্যতা প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন, তেমনি ধর্মজীবনের অভাবসকল ধর্মবিধানের দ্বারা পূর্ণ করিতেছেন। যেমন সমাজের হাত দিয়া দেহকে প্রতিপালিত করিতেছেন, তেমনি ধর্মসমাজের মধ্যে রাখিয়া আত্মাকে রক্ষা করিতেছেন।

এই যে আমার গায়ে কাপড়খানি রহিয়াছে, ইহার জন্য কত লোক খাটিয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখ। কত লোক বীজ বপন করিয়াছে, কত লোক সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে, কত লোক সেই সূত্র কলে লইয়া গিয়াছে, কত লোক কাপড় বুনিয়াছে, কত লোক বাজারে বহিয়া লইয়া গিয়াছে, তবে এই কাপড়খানি আমার গায়ে আসিয়াছে। যে অন্নের গ্রাস সকলে আজ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে কত হাত, কত মানুষের শ্রম, কত বড় জনসমাজ রহিয়াছে। তিনি

জনসমাজের ভিতরে আসিয়া জনসমাজের হস্ত দ্বারা প্রত্যেকের দেহকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই দেহ, যাহা ষাট কি সত্তর বৎসরের বেশি দিন থাকিবে না, কিছুকাল পরে যাহার ধ্বংস নিশ্চিত, ইহারই জন্য তিনি জননীর হৃদয়ে স্নেহ, পাড়া-প্রতিবাসীর হৃদয়ে প্রেম, বন্ধুগণের হৃদয়ে এত অনুরাগ দিয়াছেন!

ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর যে, আমার এই ক্ষুদ্র দেহের জন্য যিনি এত বিধি করিয়াছেন, তিনি আমার অমর আত্মার জন্য কোনও বিধান করেন নাই? আমার মাতাকে যেমন দিয়াছেন আমার দেহের জন্য, আমার গৃহপরিবার, আমার স্বদেশবাসীকে যেমন রাখিয়াছেন আমার দেহের জন্য, তেমনি ধর্মসমাজকে রাখিয়াছেন আমার আত্মার জন্য। তিনি এই ধর্মসমাজের ক্রোড়ে রাখিয়া, ধর্মসমাজের হস্তে রাখিয়া আমার আত্মাকে প্রতিপালন করিতেছেন। আমি জ্ঞান পাইব বলিয়া শঙ্কর ও সক্রেটিস হইয়াছিলেন। ইঁহারা আমারই জন্য হইয়াছিলেন ইহা কি অসম্ভব মনে হয়? আমি এখান হইতে ওখানে যাইব, এজন্য ওআট্‌স্ জন্মিয়াছিলেন, ইহা যদি বলিতে পার, তবে আমি জ্ঞান লাভ করিব এজন্য সক্রেটিস জন্মিয়াছিলেন, ইহা কি বলিতে পার না? সুদীর্ঘ জ্ঞানিপরম্পরা আমাদিগের পশ্চাতে রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলে আমারই জন্য জন্মিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের সকলের উত্তরাধিকারী।

পাঁচ বৎসরের বালক আজকাল পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। সে রেলওয়ের অধিকারী, টেলিগ্রাফের অধিকারী, সভ্যতার ফল যত কিছু সকলেরই অধিকারী। সে ঘরে বসিয়াই ইংলণ্ডের ও আমেরিকার কত ভাল ভাল বস্তু ব্যবহার করিতে পাইতেছে। যতই জগতে সময় চলিয়া যাইতেছে, ততই শিশু যাহারা আসিতেছে, তাহারা বহু বহু বৎসরের সঞ্চিত সভ্যতার অধিকারী হইয়া জন্মিতেছে। একটি পাঁচ

বৎসরের শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, পৃথিবীর আকার কি রকম। সে অমনি বলিয়া উঠিবে, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সর্বতোভাবে গোল নহে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা। কিন্তু এই কথাটি প্রমাণ করিবার জন্য কত জ্ঞানীকে কত বৎসর শ্রম করিতে হইয়াছিল! ইহা কি ধর্মের চক্ষে দেখা হইবে না? ইহা কি বিশ্বাসের চক্ষে দেখা হইবে না?

আমরা জগতের সকল ধর্মের অধিকারী, সকল জ্ঞানের অধিকারী, সকল সভ্যতার অধিকারী— যদি কাহারও এ কথা বলিবার অধিকার থাকিয়া থাকে, ব্রাহ্মসমাজেরই সে অধিকার আছে। ব্রাহ্মরাই সেই উদার, মহৎ, বিশ্বজনীন ধর্ম পাইয়াছেন, যাহাতে সকল জাতির, সকল কালের, সকল দেশের সাধু-মহাত্মাদিগকে আপনার লোক বলিয়া পাওয়া যায়। এই যে সকল বন্ধুরা আমার চারিদিকে বসিয়াছেন, ইঁহারা আমার আধ্যাত্মিক পরিবার। যীশু একবার আপনার শিষ্যগণের সঙ্গে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে একজন আসিয়া বলিল, "আপনার মা ও ভাই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" যীশু বলিলেন, "কে আমার মা ভাই? যে আমার প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, সেই আমার মা, সেই আমার ভাই।" আমাদিগকে যুক্তি আঁটিয়া মনের উপর বল করিয়া বলিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজের সকলে আমার ভাইবোন। এখনও 'যেহেতু' 'অতএব' দিয়া মনকে বুঝাইয়া বলিতে হয় যে, আমরা ভাইবোন। যেহেতু সকলে এক মণ্ডলী, যেহেতু সকলে সমবিশ্বাসী, অতএব সব ভাইবোন। আমরা বিশ্বাসী নই। তাঁহার বিধান, তাঁহার হাত, তাঁহার লীলা এই ব্রাহ্মসমাজে দেখিতে শিখি নাই, দেখিলেই এই ব্রাহ্মসমাজ প্রিয় হয়।

এই ধর্মবিধানে দেব ও মানব উভয়েরই কার্য রহিয়াছে। মানবের প্রতিদিনের দৈহিক অভাব পরিপূরণের জন্য যেমন তিনি মানবের

স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, অথচ সেই সকল স্বাধীন মানবের কার্য দ্বারাই নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন, তেমনি ধর্মবিধানেও তিনি আমাদিগের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং আমাদিগকে তাঁহার সহায় করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। মানবকেও কিছু করিতে হইবে, দেবতা ত করিবেনই। যেমন ক্ষেত্রের শস্য কৃষকের শ্রম ও বর্ষার বারি উভয়েরই ফল, তেমনি ধর্মবিধান-মধ্যে শক্তির সঞ্চার মানবের ঐকান্তিক প্রার্থনা ও সাধন এবং ব্রহ্মকৃপার আবির্ভাব উভয়ের ফল। মানবের প্রার্থনা ও ঐকান্তিক চেষ্টা যেখানে আছে, সেখানেই তাঁহার করুণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আছে।

জগতের ধর্মপ্রবর্তক মহাজনগণের জীবনেও ঐ উভয়ের সমাবেশ দেখিতে পাই। যীশুকে কখনও কখনও একাধারে ঈশ্বরের ও মানবের সন্তান বলা হইয়াছে। এক দিক দিয়া দেখিলে জগতের মহাজনগণ মানবের প্রতিনিধি ও অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মানব সমাজের প্রার্থনা, মানবের আকাঙ্ক্ষা এক দিকে তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের দিকে উঠিয়াছে; অপর দিকে ঈশ্বরের করুণা ইঁহাদিগের মধ্য দিয়া অবতীর্ণ হইয়া মানব-সমাজে বিস্তৃত হইয়াছে। মানবের প্রার্থনা ঘনীভূত হইয়া ইঁহাদিগের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। তোমার, আমার, ইঁহার, উঁহার, শত শত হৃদয়ে যে অগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল, তাহাই দপ্ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। চৈতন্যের জন্মের অনেক দিন পূর্ব হইতেই অদ্বৈত প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ প্রার্থনা করিতে-ছিলেন, ভক্তি অবতীর্ণ হউক, নাস্তিকতায় দেশ ছারখার হইল, শীঘ্র ভক্তি অবতীর্ণ হউক। তাঁহাদেরই প্রার্থনায় চৈতন্যদেব নামিয়া আসিলেন, চৈতন্যভাগবতে এইরূপ উক্ত আছে। এই সকল মহাজন

এক দিকে মানবের প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন, মানব-হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা, ব্যাকুলতা ঘনীভূত হইয়া ইঁহাদিগের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের দিকে উৎসারিত হইয়াছিল ; আর-এক দিকে ইঁহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের শক্তি ঘনীভূত আকারে ইঁহাদিগের মধ্য দিয়া জনসমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন পর্বত উচ্চ হইয়া উঠে পৃথিবীর অন্তরস্থিত উত্তাপের বলে, আর আকাশের মেঘ গিয়া ঠেকে বলিয়া আকাশের বারি তাহাতে বর্ষিত হয়, তেমনি মানব-সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার উত্তাপ ইঁহাদিগকে স্বর্গপানে তুলিয়া ধরে, আর ঈশ্বরের করুণাবারি ইঁহাদের উপর দিয়া মানব সমাজের দিকে প্রবাহিত হয়। ইঁহাদিগের জীবনে যেমন দেবত্ব আছে, তেমনি মানবত্ব আছে। যদি কেহ বলেন যে, ইঁহারা যাহা কিছু বলেন সকলই অভ্রান্ত, তবে আমি বলি, তিনি ঘোর ভ্রান্ত। আবার যদি কেহ বলেন, ইঁহাদের জীবনে বিশেষত্ব কিছু নাই, তবে তিনিও ভ্রান্ত।

এই সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাজনগণ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা করিয়াছেন, আমাদিগকে সম্মিলিত ভাবেও তাহাই করিতে হইবে। একনিষ্ঠ প্রার্থনা ও একনিষ্ঠ কার্য উভয়ের দ্বারা তাঁহার কৃপাকে উপার্জন করিতে হইবে। আমাদিগের শত হৃদয় যদি অন্তরস্থিত মহৎ আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে ঐ পাহাড়ের মত উচ্চ হইয়া উঠে, তবেই তদুপরি তাঁহার কৃপাবারি বর্ষিত হইতে পারে। আমাদের সকলেরই কিছু করিবার আছে। আমাদের মধ্যে এমন ক্ষুদ্র, এমন তুচ্ছ কেহই নয়, যাহার কিছু করিবার নাই। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-কীটের দ্বারা বিধাতা তাঁহার কাজ করাইয়া লন, তেমনি ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানবের দ্বারাই তিনি মানব-সমাজের উন্নতি ও বিকাশের কার্য সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহার ধর্মসমাজ-গঠন সম্বন্ধে, তাঁহার ধর্মবিধান-বিস্তার

সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেরই প্রয়োজন আছে। তাঁহার এই সুমহৎ ধর্ম-বিধানকে পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সকলকেই চাহেন। সকলেই আপনার যতটুকু করিবার তাহা করি, তবেই এ সুমহৎ কার্য সম্পন্ন হইবে।

এই ধর্মবিধানে দেব ও মানব উভয়েই লীলা করিতেছেন। যখন আমাদের নিঃস্বার্থ চেষ্টা ও উদ্যম, আমাদিগের প্রার্থনা ও ব্যাকুলতা, আমাদিগের পবিত্র ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার দিকে ধাবিত হইবে, তখনই তাঁহার করুণাবারি এ সমাজের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে, তখনই তিনি শক্তি রূপে এ সমাজের প্রতি অঙ্গে ক্রীড়া করিবেন, তখনই আমাদের উদ্ধার হইবে। বিধাতা করুন, তাঁহার বিধান মানব-সমাজের ইতিবৃত্তে, ধর্মবিধানের বিকাশের মধ্যে আমরা দর্শন করিতে সমর্থ হই।

হে করুণাময় বিধাতা, কবে আমরা বিশ্বাসের চক্ষু পাইব! জগৎ-রঙ্গভূমিতে তোমাকে অধিকারী রূপে জানিয়া আমাদিগকে তাহার নটস্বরূপ দেখিব। কবে সে বিশ্বাসের চক্ষু পাইব! জড়ে, চেতনে, জনসমাজে, ধর্মবিধানে, আত্মমন্দিরে প্রাণ রূপে তোমায় দেখিয়া কৃতার্থ হইব। দেখিব যে, তুমি আমাদিগের ভিতরে থাকিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া প্রতিপালন করিতেছ, বর্ধন করিতেছ। সেই চক্ষু দাও। প্রেমসাগরের তীরে বসিয়া পিপাসায় কেন শুষ্ক হইতেছি? তোমার চরণ-ছায়া ছাড়িয়া উত্তাপে কেন গিয়া পড়িতেছি? প্রাণ-স্বরূপ, তুমি চারিদিকে ব্যাপৃত রহিয়াছ, কেন তবে জগৎকে শূন্য ঘরের মত দেখিতেছি? আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

৮ মাঘ ১৮১৭ শক। ১৮৯৬ খ্রী

ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও কার্য

ধর্ম শব্দে আমরা সচরাচর হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, মুসলমানধর্ম প্রভৃতি জগতের প্রচলিত কয়েকটি ধর্মকে বুঝিয়া থাকি। এই এক-একটি ধর্মসম্প্রদায় এক-একটি বহুশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের ন্যায়। ইহাদের প্রত্যেকের শাস্ত্রগ্রন্থ, সাধনপ্রণালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এখন প্রশ্ন এই, ইহাদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কি না যাহা অবলম্বন করিয়া সকল দেশের ও সকল সম্প্রদায়ের মানুষ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে? এই সকল ধর্ম বিভিন্ন রুচি ও বিভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলেও যে সকল বিচিত্রতার মধ্যে সকলের অবলম্বনীয় একটা মিলনের স্থান পাওয়া যায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক মহাজনের আধ্যাত্মিক জীবন যত্ন সহকারে আলোচনা করিলে এমন কতকগুলি ভাব বা সদ্‌গুণের নিদর্শন পাওয়া যায়, যাহা তাঁহাদের প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্যকে আশ্রয় করিয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম, জগতের পাপতাপ দর্শনে গভীর মনস্তাপ। প্রচলিত কুসংস্কার ও ধর্মহীনতা দেখিয়া ইঁহাদের মনে কি এক গভীর শোক, কি এক দারুণ যাতনার উদয় হইয়াছিল, যাহা তাঁহারা কিছুতেই অন্তর হইতে দূর করিতে পারেন নাই। যতই তাঁহারা মানবের দুঃখ, দুর্গতি পাপ ও তাপের কথা চিন্তা করিয়াছেন, ততই শোকভরে তাঁহাদের প্রাণমন অভিভূত হইয়াছে। কি যীশু, কি বুদ্ধ, কি মহম্মদ, কি চৈতন্য, কি নানক, সকলের জীবনেই দেখা যায়, জগতের পাপতাপ দেখিয়া কি এক গভীর ক্ষোভ তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা দাবানলের মত প্রজ্বলিত ছিল।

মহাত্মা যীশুর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি সর্বদা বিষণ্ণ চিত্তে থাকিতেন। তাঁহাকে কেহ কোনও দিন হাস্য করিতে দেখে নাই।

বাইবেলের চারি সুসমাচারের মধ্যে কোথাও এমন একটি স্থান নাই, যেখানে এরূপ কোনও উল্লেখ আছে যে, কোনও দিন তিনি হাস্য করিয়াছিলেন। বরং এরূপ লিখিত আছে যে, মনের আবেগে, হৃদয়ের দারুণ যাতনায় তাঁহার শরীরের রক্ত ঘর্মে পরিণত হইত। তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন এরূপ বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু হাস্য করিতেছেন এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এইজন্য লোকে তাঁহাকে চিরবিষণ্ণ মানুষ বলিত। মহাত্মা বুদ্ধ এত বিষণ্ণ থাকিতেন যে, তিনি সজনতা ত্যাগ করিয়া নির্জনে অধিকাংশ কাল যাপন করিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সুখৈশ্বর্যের সহিত বাঁধিয়া রাখিবার জন্য সাধ্যমত উপায় অবলম্বন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিষয়-বিভবের মধ্যে তাঁহার মনকে নিমগ্ন রাখিতে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদের আয়োজন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সকল আয়োজন বৃথা হইয়াছিল। কিছুতেই তাঁহার গভীর মনোবেদনা যায় নাই। মহাত্মা মহম্মদের মনোবেদনা এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় হরা পর্বতের নির্জন কন্দরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেন। অবশেষে একদিন সে পর্বতের উপর হইতে লম্ফ দিয়া জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এতই গভীর মনোবেদনা, এমনই দারুণ মনস্তাপ! এইরূপ আমরা সকল মহাজনের জীবনেই দেখিতে পাই যে, কি এক দারুণ ক্লেশ তাঁহাদের মন-প্রাণকে অভিভূত করিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন, এই গভীর মানসিক ক্লেশ কি তাঁহাদের স্বকৃত অপরাধের জন্য? তাহা ত বোধ হয় না ; কারণ তাঁহাদের সকলেরই চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ছিল। তবে কি কারণে জগতের সাধুগণ সকল প্রকার স্বার্থ ও সুখের বাসনাকে পরিত্যাগ করিয়া গভীর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন? ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়।

ইঁহাদের জীবনচরিত-সকল যত্নপূর্বক পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাপন দুষ্কৃতির জন্য নয়, জগতের সমুদয় মানব-মণ্ডলীর পাপ তাপ ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা এরূপ বিষণ্ণ হইতেন। মহাত্মা যীশু জেরুসেলামবাসী লোকসকলের আধ্যাত্মিক অবনতি, তাহাদের দুর্বলতা, কপটতা, ধর্মহীনতা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। তুমি আমি এরূপ কত ঘটনা দিবানিশি চক্ষে দর্শন করিতেছি! কত লোক নানাপ্রকার দুষ্কৃতির মধ্যে পড়িয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতেছে, এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও আপনাপন স্বার্থ ও সুখাসক্তির মধ্যে বেশ বাস করিতেছি। আমরা কি জগতের দুর্গতি, জগতের ধর্মহীনতা দিবানিশি দেখিতেছি না? চারিদিকের লোকের এই সকল অধোগতি দর্শন করিয়া আমাদের মনে বিশেষ কোনওপ্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। তোমার আমার মন নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তার উপরে উঠিয়া জগৎকে প্রীতি করিতে পারে না। কিন্তু জগতের সাধুমহাজনগণ তদুপরি উঠিয়া মহৎ বিষয় ভাবিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রেম আপনাপন হৃদয়পাত্রকে ছাপাইয়া মানব-মণ্ডলীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই স্থানেই তাঁহাদের মহত্ত্ব। এই স্থানেই আমাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য। তুমি আমি যদি জগতের উপর এতটা প্রেম স্থাপন করিতে পারিতাম, যদি মানব-মণ্ডলীর দুঃখ দুর্দশাতে ইঁহাদের ন্যায় অকপটে ক্রন্দন করিতে পারিতাম, তবে আমরা প্রত্যেকে এক-এক-জন যীশু অথবা বুদ্ধ হইতাম।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে দেখিতে পাই যে, ইটালি দেশ হইতে দুঃসংবাদ আসিল বলিয়া তিনি বকিংহাম সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কোথায় সুদূর ইউরোপে ইটালি

দেশের লোকে স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে, সেই সংবাদে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা সহরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন; তিনি একজন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না। কি উদার প্রেম! ইহা পাঠ করিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, এতটা নরপ্রেম কিরূপে সম্ভব হইল? আমার মনের শক্তি এত বিশাল নয় যে, এ প্রেমকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। স্পেনবাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করিল, সেজন্য রামমোহন রায় টাউন হলে এক ভোজ দিলেন। আমি কল্পনাতেও এ প্রেমকে ধারণা করিতে পারি না। ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তিনি বড় ও আমি ছোট।

এই জগতের দুঃখে দুঃখানুভব, মানবের পাপ দর্শনে হৃদয়ে বিষম যাতনানুভব, ইহা সকল সাধুতেই দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার পশ্চাতে কি দেখি? পশ্চাতে দেখি বিশাল প্রেম, ইহার অন্তরালে দেখি মৈত্রী বা মানব-প্রীতি। এই প্রীতির বিষয় অনুধ্যান করিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। অকপট প্রীতির এই এক আশ্চর্য গুণ যে, ইহা যে হৃদয়ে থাকে, সে হৃদয় যে কেবল প্রেমাস্পদের দুঃখে দুঃখিত হয়, তাহা নয়, প্রেমাস্পদ যাহাকে দুঃখ বা বিপদ বলিয়া মনে করিতেছে না অথচ যাহা তাহার বাস্তবিক বিপদ, তাহাতেও দুঃখিত হয়। তুমি তোমার বিপদকে সম্পদ মনে করিয়া আনন্দিত হইতেছ; কিন্তু তাহাতে হয়ত তোমাকে যিনি ভালবাসেন তাঁহার হৃদয় ভাঙিয়া চূর্ণ হইতেছে। তোমার বিপদ তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না; কিন্তু তাহা তীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্যের হৃদয়কে বিদ্ধ করিতেছে, অপরে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। সন্তান লাহোরে পাপে ডুবিতেছে, সে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া দেহমনের শক্তিকে ক্ষয় করিতেছে, এ দিকে কলিকাতায় তাহার জননী অশ্রুজলে মেদিনীকে

সিক্ত করিতেছেন। যে বাণ লাগা উচিত ছিল সন্তানের বুকে, সেই বাণ লাগিল জননীর বুকে। প্রেমের মহিমাই এই। তোমার বিপদ অন্যতে, তোমার দুঃখ অন্যতে, তোমার হৃদয়স্থিত বাণ অপর হৃদয়ে!

পৃথিবীতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পতির জন্য পত্নী, ভ্রাতার জন্য ভগিনী, সন্তানের জন্য জননী এ সংসারে নিয়তই ক্রন্দন, করিতেছে। যে দুঃখের বোঝা বহন করা উচিত ছিল একজনের, তাহা অন্যকে বহন করিতে হইতেছে। সেণ্ট অগস্টিনের জীবনচরিত -পাঠক মাত্রেই জানেন যে, যখন তিনি বিদ্যাশিক্ষার অভিপ্রায়ে কার্থেজ নগরে বাস করিতেছিলেন, তখন সেণ্ট অগস্টিন যৌবনমদে মত্ত হইয়া নানা-প্রকার পাপে লিপ্ত হইলেন। তাঁহার জননী মণিকা দেবী বিপথগামী পুত্রের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কত বুঝাইলেন, তিনি কি ভয়ংকর পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সকল প্রয়াস বিফল হইল। অবশেষে পরমেশ্বরের নিকট ক্রন্দন করাকে একমাত্র উপায় জানিয়া তাহাই অবলম্বন করিলেন। এই ছবি মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হয়। মণিকা প্রতি সপ্তাহে ভজনালয়ে গিয়া কিয়ৎকাল প্রার্থনাতে যাপন করিতেন; ভজনার দিনে সকল লোক ভজনালয় পরিত্যাগ করিলে তিনি ধর্মাচার্যের নিকট গমন করিয়া বলিতেন, "আমার প্রতি কৃপা করুন, আমার বিপথগামী পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" আচার্য একদিন দুইদিন দশদিন প্রার্থনা করিলেন; অবশেষে একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, যে সন্তানের জন্য এত অশ্রুজল পতিত হয়, সে কখনই বিনষ্ট হইবে না।" প্রেমের মহিমা দেখ, অগস্টিন কোথায় তাহার জননীকে ভুলিয়া পাপে নিমগ্ন আছেন,

আর তাঁহার মাতা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্তানের জন্য দিবানিশি ক্রন্দন করিতেছেন।

সাধুদের ভিতরেও এই মানব-প্রেম দেখিতে পাই, তাঁহাদিগকে জনসমাজের "মা" বলা যায়। তুমি আমি হাজার হাজার লোক পাপে ডুবিতেছে, সেজন্য আমরা চিন্তিত নই, তোমার আমার চিন্তার ভার, তোমার আমার ক্রন্দনের ভার সাধুরা আপনাদের স্কন্ধে বহন করিতেছেন। সেই গুরুভারে তাঁহাদের মন প্রাণ ভাঙিয়া যাইতেছে।

সাধুদের প্রেমের আর-এক লক্ষণ এই দেখি, যে ব্যক্তি বিরক্তির উৎপাদক. প্রেম তাহার উপরও ধাবিত হয়। আমরা সাধারণত প্রেমাস্পদকে ভালবাসি। যাহাকে অধিক গুণান্বিত দেখি, তাহাকে আমরা স্বভাবত ভালবাসিয়া থাকি। যাহার হৃদয়ে কোমল কমনীয় গুণাবলী দেখিতে পাই, বিনয়, মাধুর্য প্রভৃতি সুমধুর ভাবসকল দেখিতে পাই, তাহাকে প্রীতি করা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যাহাতে এ সকল গুণাবলী বিদ্যমান নাই, বরং যে বিপরীতগুণসম্পন্ন, তাহাকে প্রেম করা বড় কঠিন। অর্থাৎ যে প্রেম আকর্ষণ করে না, তাহাকে প্রীতি করা বড় কঠিন। একটি সুন্দর বালক বসিয়া আছে, তাহার মুখে সরলতা, কমনীয়তা শোভা পাইতেছে, তাহাকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করা তোমার পক্ষে সহজ ; কিন্তু যে প্রেমকে আকর্ষণ করে না, তাহাকে প্রেম করা তোমার পক্ষে সহজ নয়। ঈশ্বরই কেবল প্রেম-প্রতিরোধককে প্রেম করিতে পারেন, আর জগতের সাধুরা পারেন।

এই সকল সাধুমহাত্মাদের জীবনে দেখিতে পাই, তাঁহারা এমন সকল পাত্রে প্রেম স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে প্রেম করা তোমার

আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাঁহারা চরিত্রবান্‌, জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, পরহিতৈষী, তাঁহাদিগকেই প্রেম করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা পাপী, পানাসক্ত, প্রবঞ্চক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহাদিগকে প্রেম করা সাধুদের পক্ষে স্বাভাবিক; ইহা ঐশ্বরিক ভাব। আমরা যে সকলকে সমভাবে প্রেম করিতে পারি না, তাহার কারণ এই, আমাদের ঈশ্বর-প্রেমের অভাব আছে। যদি দেখ, এক ব্যক্তি জগতের পাপী, অপদার্থ, চরিত্রহীন লোকসকলকে প্রেম করিতেছে, জানিও তাহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে, জানিও তাহার হৃদয়ে ঐশ্বরিক ভাব ফুটিয়াছে।

শুধু তা নয়, যাহারা প্রেমকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে প্রেম করা ঐশ্বরিক প্রীতির দ্বিতীয় লক্ষণ। প্রেমকে বাধা দেয়, ইহার অর্থ কি? অর্থাৎ যাহাদিগকে প্রেম করিতেছ, যাহাদিগের উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছ, তাহারাই যদি তোমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেয়, এমন যে সকল লোক তাহাদিগকেও প্রেম করা ঐশ্বরিক ভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাত্মা যীশুর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যীশু যাহাদের পরিত্রাণের জন্য নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহারাই আবার তাঁহাকে ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিল। কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে তাহাদিগেরই কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! এই সকল লোককে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশবাসীদের উদ্ধারের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহারাই আবার তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে পীড়ন করিয়াছে; স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র লোকে তাঁহাকে নির্যাতন করিয়াছে। কিন্তু এই দেশের প্রতি প্রেমবশত ইহাদেরই কল্যাণের জন্য তিনি ইংলণ্ডে

গিয়া সেখানকার প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট ভারতের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সাধুদের প্রেম কেবল যে জগতের ধর্মাত্মাদিগের মধ্যে আবদ্ধ, তাহা নহে ; কিন্তু যাহারা প্রেমকে বাধা দেয়, প্রেমের বিরোধী কার্য করে, তাহাদের প্রতিও তাঁহাদের প্রেম ধাবিত হইয়াছিল। আবার এই যে জগতের প্রতি অপূর্ব প্রেম, ইহা হইতেই সাধুদের সকল মানসিক যাতনার উৎপত্তি। এই প্রেমই সর্ব-প্রথমে তাঁহাদের মনে এই গভীর মনস্তাপের উদয় করিয়াছে।

তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থা, প্রচলিত সাধনপ্রণালী-সকলের পরীক্ষা। অর্থাৎ যখন দেশ-প্রচলিত ভ্রম, কুসংস্কার এবং পাপের আধিক্য দেখিয়া প্রাণে দারুণ যন্ত্রণার উদয় হইল, তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, এই যে পাপ, তাপ, ব্যাধি এই সকলের ঔষধ কোথায়? ইহার প্রতিকারের জন্য কোনও দূর স্থান হইতে কি কোনও নূতন কিছু আনিতে হইবে, অথবা এই সকল প্রচলিত ভ্রম প্রমাদের মধ্যেই এমন কিছু পাওয়া যাইতে পারে, যদ্‌দ্বারা এই সকল পাপতাপ নির্বাপিত হইতে পারে? এই দ্বিতীয় অবস্থাতে তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, একবার উত্তম রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, দেশপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপাদির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কি না যদ্‌দ্বারা পাপের জ্বালা নিবারিত হয়, শাশ্বতী শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে এমন কোনও ঔষধ আছে কি না, যাহার প্রয়োগে এই পাপব্যাধির উপশম হয়।

এই পরীক্ষাতে নিযুক্ত হইবার জন্য তাঁহাদের মনে কঠোর সাধনার প্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। যেমন মহাত্মা বুদ্ধ, তিনি যখন লোকের পাপতাপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তিনি বৈশালী নগরে গিয়া গিরিগুহাবাসী একজন

ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অতি একাগ্রতার সহিত তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে উপদেশ করিলেন যে, বেদোক্ত নিয়মাবলীর অনুষ্ঠানই ধর্ম। তিনি তৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ছয় বৎসর কাল অতি কঠোর সাধনে নিযুক্ত রহিলেন। এইরূপ মহম্মদের বিষয়ও সকলেই অবগত আছেন যে, তিনি বাল্যকালে তাঁহার স্বদেশের প্রচলিত রীতিনীতি-সকলকে অতি মনোযোগপূর্বক এবং অতিশয় নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন। কথিত আছে, তিনি প্রতিদিন কাবা-মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন; ইহা তাঁহার নিত্য কর্তব্যের মধ্যে বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই প্রকার দেখা যায়, সকল মহাজনই সর্বপ্রথমে স্বীয় স্বীয় দেশপ্রচলিত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শান্তি পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপ কঠোর সাধনের পর তাঁহাদের মনে তৃতীয় অবস্থা আসিল; প্রচলিত ধর্মসাধনপ্রণালীর প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। কঠোর সাধনার পর যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানে হৃদয়ের দাবানল নির্বাপিত হয় না, আত্মা কিছুতেই শান্তিলাভ করিল না, তখন দেশপ্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির উপর তাঁহাদের এরূপ অশ্রদ্ধার উদ্রেক হইল, যাহাতে তাঁহারা দেশের অনেক ক্রিয়াকলাপকে বর্জন করিলেন। মহাত্মা যীশু প্রতি কথাতে ফ্যারিসিদিগকে তিরস্কার করিতেন। মহাত্মা বুদ্ধের উক্তিসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের প্রতি অতি তীব্র অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্য অসার শাক্ত উপাসনার প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার উক্তিসকলের মধ্যে শাক্ত উপাসকগণের প্রতি বিশেষ ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা যখন দেখিলেন দেশপ্রচলিত ভ্রম-কুসংস্কারাদির দ্বারা মানবের সঞ্চিত পাপরাশি

দূর হয় না, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রাণপণ করিয়া দেখিব, শান্তিপ্রদ মুক্তির বারি কোথায় আছে। ইহাই তাঁহাদের চতুর্থ অবস্থা। এমন কোনও স্থান আছে কি না, যেখানে গেলে এমন কিছু পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজের পরিত্রাণের একটা উপায় হয়।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বুদ্ধের উক্তি কি চমৎকার! ছয় বৎসরের কঠোর সাধনার পর যখন তিনি দেখিলেন, সমুদয় দেহমনের ক্লেশ বৃথা হইয়াছে, এতকালের সাধনা নিষ্ফল হইয়াছে, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই বোধিদ্রুমমূলে বসিলাম, আমার শরীরের রক্ত জল হইবে, দেহের শক্তি শিথিল হইবে, এ দেহ কীটে ক্ষতবিক্ষত করিবে, আমার যত শক্তি আছে সমুদয় যদি যায়, তথাপি যতক্ষণ সত্য না পাইব, ততক্ষণ উঠিব না। দুরন্ত পরিশ্রমের পর যখন দেখিলেন যে, কিছুতেই কিছু হইল না, তখন ভাবিলেন, যাহাতে আমার প্রাণের আবেগ গেল না, আত্মার ক্ষুধা মিটিল না, শাশ্বতী শান্তি পাইলাম না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? আমাকে দেখিতে হইবে, পরমতত্ত্ব কোথায় লুক্কায়িত আছে। হৃদয়ের এই অবস্থা কি যন্ত্রণাদায়ক!

তখন তিনি ঘোর আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। আত্ম-চিন্তা এবং গভীর ধ্যান এবং আত্মপরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতলস্পর্শ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া তিনি পরমতত্ত্ব কোথায় আছে তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর এমন কিছু পাইলেন, যাহা স্থিরতর, দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হইল। সে পদার্থ যে কি, তাহা কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। মহাজনদিগের উক্তিসকল তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলেও সে পদার্থকে ভাল করিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়া ডুবুরি যেমন মুক্তা

সংগ্রহ করে, সেইরূপ তাঁহারা সাধনের অতলস্পর্শ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া কি এক পদার্থ পাইলেন, যাহার পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। তাহা লাভ করিয়া নিরাশার স্থলে আশা, নিরুৎসাহের মধ্যে উৎসাহ, ঘোর বিষাদের মধ্যে আনন্দের উদয় হইল। তমসাচ্ছন্ন রজনীতে আলোকের কি এক শুভ্র রেখা দেখিলেন যাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণমনের সকল অন্ধকার দূর হইল।

ভিন্ন ভিন্ন সাধক ইহার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। বুদ্ধ ইহাকে 'ধর্ম' বলিয়াছেন, যীশু ইহাকে 'স্বর্গরাজ্য' বলিয়াছেন, মহম্মদ ইহাকে 'ইসলাম' নাম দিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে 'ধর্ম' বল, 'সত্য' বল, 'স্বর্গরাজ্য' বল, 'মহা-ইচ্ছা' বল, যাই কেন বল-না, পদার্থ একই। তাহা এই— এই মানব-জীবন এক ঘোর প্রহেলিকা, এখানে কোনও বস্তু স্থির রূপে দণ্ডায়মান নয়, ইহা এক মহা-ইচ্ছা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, এক মহা-ইচ্ছা-প্রসূত এবং তৎ কর্তৃক বিধৃত। তাঁহাকেই সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে, তাঁহাকেই পতি রূপে বরণ করিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ রূপে সেই ইচ্ছারই অধীন হইতে হইবে।

যেমন জড়ের প্রত্যেক পরমাণু মাধ্যাকর্ষণ-নামক এক মহা নিয়ম দ্বারা শাসিত, সেইরূপ মানব-জীবনও এক মহাশক্তি কর্তৃক বিধৃত, যাহা অন্তরালে থাকিয়া আমাদের সকল কার্যকে নিয়মিত করিতেছে, অনুপ্রাণিত করিতেছে। বরং জড়জগৎকে "নাই" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পার, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য এই যে এক মহাশক্তি, ইহাকে উড়াইয়া দিতে পার না। ইহা তোমার শক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি রূপে, প্রাণের প্রাণ রূপে নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছে। এই শক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত ধরিতে না পারিতেছ ততক্ষণ জীবনের স্থিরভূমি পাইলে না।

ইহা শোনা কথায় থাকিলে চলিবে না। সত্য যতক্ষণ শোনা কথায় থাকে, ততক্ষণ তাহা কোনও কাজে আসে না, শোনা কথাতে প্রাণে জোর আসিতে পারে না। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত 'শোনা সত্যের' উপর নির্ভর করিতেছ, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি জীবনের স্থিরভূমি পাইবে না, ততক্ষণ তোমার সকল কার্য চঞ্চল। কিন্তু যখন সেই সত্যকে প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবে, তখন তোমার প্রাণে এক নূতন বল, এক নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে। তখন সেই সত্যের শক্তি বুঝিতে পারিবে, সত্য তখন তোমার নিকট এক নূতন ভাব ধারণ করিবে।

যেরূপেই হউক, আপনাকে ঐ ইচ্ছার অধীন কর। আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে বিলোপ করিতে না পারিলে জীবনের পথ ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে না। মহাত্মা বুদ্ধ 'বাসনার বিলয়' বলিতে যাহা বুঝিতেন, যীশু 'ইচ্ছার যোগ' নামে যে আদর্শ প্রাণে ধরিয়াছিলেন, মহম্মদ 'বাধ্যতা' বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করিয়াছেন, সকলের একই অর্থ— ঐ এক আত্ম-বিলোপ। তাঁহাদিগের উক্তি এবং কার্য -সকলের মধ্যে ঐ এক ভাবেরই প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ইহার কমে তাঁহারা রাজি হন নাই।

মহাত্মা যীশুর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, যখন তাঁহার কাছে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য কেহ আসিত, তখন তিনি যে ব্যক্তির যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই পা দিয়া চাপিয়া ধরিতেন। তিনি বলিতেন, "যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া আমার নিকট আসিও।" শিষ্যেরা বলিত, "আপনি এমন ভয়ানক কথা বলেন?" তিনি বলিতেন, "ভয়ানক কি? এটা কি বড় ভয়ানক কথা? আজ যদি একজন বণিক্ শুনিতে পায় যে, তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিলে সে এমন এক পদার্থ কিনিতে পারিবে, যাহা লাভ করিয়া সে চিরদিনের মত

মহাধনী হইয়া যাইতে পারিবে, তাহা হইলে কি সে আপনার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া তাহা ক্রয় করে না? যদি তোমরা ধর্মকে যথার্থই মূল্যবান্ বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলে কি তাহার জন্য পার্থিব সুখ-সম্পত্তি উপেক্ষা করিতে পার না? এ কি বড় ভয়ানক কথা?"

তাঁহারা ধর্ম বলিতে বুঝিতেন, "পরমেশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ"—সম্পূর্ণ রূপে 'আত্মবিলোপ'। ইহাই সাধকের জীবনের পঞ্চম অবস্থা, অথবা সত্য আবিষ্কারের পরবর্তী ফল। ইহাকে 'বৈরাগ্য' বল, 'আত্মবিলোপ' বল, 'আত্মসমর্পণ' বল, বা 'বিষয়ে অনাসক্তি' বল—একই কথা।

বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নয়, প্রশংসা লাভের জন্য বৈরাগ্য নয়, অথবা বৈরাগ্য ধর্মসাধনের একটা অবশ্যপালনীয় নিয়ম বলিয়াও নয়। বরং দেখিতে পাই, সাধনাবস্থায় তাঁহারা যে-সকল পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সিদ্ধাবস্থায় আবার সেই সকলকে কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। যেমন মহাত্মা বুদ্ধ, তিনি যখন সাধনের অবস্থায় ছিলেন, তখন আহার নিদ্রা প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপার-সকলকে অত্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন; পরে যখন সিদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন পুনরায় অতি স্বাভাবিক রূপে সেই সকলকে গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা মহম্মদ সাধনের অবস্থায় হরা পর্বতের কন্দরে বসিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন; কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিক রূপে আহারাদি করিতেন। অথচ বিষয়সুখ তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করে নাই, তাঁহাদের বিষয়ে আসক্তি জন্মে নাই। বরং তাঁহাদের মন হইতে বিষয় দিন দিন খসিয়া পড়িয়াছে। মানব-সেবার জন্য, ঈশ্বরেচ্ছা-পালনের জন্য যে পরিমাণে বিষয়ের আবশ্যক, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈরাগ্য অতি স্বাভাবিক রূপে অনাহূত ভাবে তাঁহাদের চরিত্রে ফুটিয়াছে।

তৎপরে নবপ্রাপ্ত তত্ত্ব দ্বারা মানব-মণ্ডলীর উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। যখন তাঁহারা ধর্মলাভ করিয়াছেন, তাহা একাকী সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করেন নাই; বরং মানব-সমাজের শান্তিবিধানের জন্য, জনসমাজের কল্যাণের জন্য সে সমুদায় নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের জীবনের ষষ্ঠাবস্থা।

তবে প্রত্যেক সাধু-মহাজনের জীবনে বিশেষ ভাবে এই তিনটি গুণ দেখা যায়। প্রথম বিশ্বাস, দ্বিতীয় আত্মসমর্পণ ও তৃতীয় নর-প্রেম। এই ত্রিবিধ ভাব সকল ধর্মপ্রবর্তক-মহাজনের জীবনেই দেখিতে পাই। এই যে আদর্শ, ইহা সকল ধর্মের মধ্যেই দেখা যায়। এই জগতের অন্তরালে যে অব্যক্ত অনির্দেশ্য মহাশক্তি বাস করিতেছেন, সর্বাগ্রে জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, ইহা প্রথম ভাব। তৎপরে সম্পূর্ণ রূপে সেই শক্তির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, সম্পূর্ণ রূপে সেই ইচ্ছার অধীন হইতে হইবে, ইহা দ্বিতীয় ভাব। তৎপরে মানবের সেবাতে দেহ মন প্রাণকে নিয়োগ করিতে হইবে, ইহাই তৃতীয় ভাব। ইহাই ধর্মের প্রকৃষ্ট ভাব। যখন এই ত্রিবিধ ভাব মিলিবে, তখন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন সাধকের ভিতরে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে এই ত্রিবিধ ভাবের সমন্বয় সেখানেই ধর্মের পূর্ণ আদর্শ। সূক্ষ্ম রূপে এবং সতর্কতার সহিত এই ত্রিবিধ ভাবের সাধন করিতে হইবে। জ্ঞানকে বিকশিত ও উন্নত করিয়া সেই মহাশক্তিকে সত্য বলিয়া জানা, প্রেমকে বিকাশ করিয়া তাঁহাকে পতি রূপে বরণ করা, এবং ইচ্ছাকে সুসংযত করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হওয়া, অর্থাৎ তাহাকে মানব-সেবাতে, জনসমাজের হিতসাধনে নিয়োগ করা, ইহাই ধর্মের পূর্ণ ও

প্রকৃত আদর্শ। যিনি ধর্মের এই ত্রিবিধ আদর্শকে প্রাণে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ধর্মের প্রকৃত ভাব পাইয়াছেন।

এই ত গেল আদর্শ। ধর্মের প্রকৃত কার্য কি?

ধর্ম শব্দ ধৃ-ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধৃ শব্দের অর্থ ধারণ করা। কি ধারণ করা? যে চলিতেছে, তাহাকে ধারণ করা; যেমন এক ক্ষেত্রের জলরাশি অপর ক্ষেত্রে গিয়া পড়িতে না পায়, তজ্জন্য কৃষকেরা উভয়-ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটা আইল বাঁধিয়া দেয়। তবেই বুঝা যাইতেছে, ধর্মের কার্য সংরক্ষণ। যে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে, তাহাকে বিনাশের পথ হইতে ফিরাইয়া রক্ষা করা এবং উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই ধর্মের প্রকৃত কার্য। উপনিষদে আছে—

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।

মানব-সমাজ যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য তিনি সেতুস্বরূপ হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন।

এক সময় এই পৃথিবীর পরমাণুসকল তরল বাষ্পাকারে শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছিল। তিনি তাহা হইতে জীববাসের উপযোগী এই সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সেইরূপ এই মানব-সমাজ যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য তিনি প্রেমের দ্বারা সকলকে এক স্থানে রাখিতেছেন। তিনি বিধাতা হইয়া মানবের অন্তরস্থিত ন্যায়, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী দ্বারা জনসমাজকে রক্ষা করিতেছেন। তেমনি আবার আমাদের দেহ সম্বন্ধে কি আশ্চর্য নিয়ম দেখিতে পাই। সকলেই জানেন, প্রত্যেক মানুষের মস্তকের উপরে কত গুরুতর বায়ুর চাপ রহিয়াছে; তাহার চাপ এত অধিক, যদি আর কোনও সংরক্ষণী শক্তি না থাকিত তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকে সেই গুরুভারে পিষিয়া যাইতাম। কিন্তু আমরা যে পিষিয়া যাই না, তাহার কারণও এই

চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলই আবার সেই ভারকে লঘু করিতেছে। এই সত্য লক্ষ্য করিয়াই ভারতের প্রাচীন ঋষিরা ধর্মকে প্রাণ বা বায়ুর সঙ্গে তুলনা করিতেন। এই কারণেই তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়াছেন। ধর্ম সেই জিনিস, যাহা প্রাণে আসিলে সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হয়। ধর্ম সেই জিনিস, যাহাকে লাভ করিয়া মানুষ শক্তিশালী হয়; যাহা প্রাণে পাইলে মানুষ এই পাপ-প্রলোভন-সঙ্কুল সংসারে দাঁড়াইবার স্থিরভূমি পায়।

ইহার ইংরাজি প্রতিবাক্য Religion শব্দ লাটিন Religio হইতে উৎপন্ন। Religio অর্থ যাহা বন্ধন করে। অতএব ধর্মের আর-এক কার্য বন্ধন। অর্থাৎ যাহা দূরে ফেলে না, কিন্তু বন্ধন করে। ঈশ্বরের সহিত এই জগৎকে, জগতের সহিত মানবকে, মানব-মণ্ডলীর সহিত মানবকে বন্ধন করে। ধর্ম প্রকৃতি, জগৎ, মানবাত্মা ও ঈশ্বর এ সকলকে এক স্থানে মিলাইয়া দেয়। জনসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানকার বিক্ষিপ্ত ভাবসকলকে দূর করে; ইহা গার্হস্থ্যজীবনে প্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে প্রেমে বন্ধন করে; ইহা যে কিছুতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে সুন্দর আকার প্রদান করে।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। জ্ঞান এবং প্রেম, এ উভয়ই স্বতন্ত্র। জ্ঞানের কার্য বিশ্লেষণ করা, প্রেমের কার্য গঠন করা। রসায়নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পদার্থকে ভাগ করিয়া দেখিবার জন্য যেমন এক-একটা acid ব্যবহার করেন, তদ্ব্যতীত বস্তুকে বিশ্লেষণ করার সুবিধা হয় না, এবং পদার্থসকলকে ভাল করিয়া চিনিতে পারা যায় না, সেইরূপ বিচার ব্যতীত পদার্থের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। বিচার প্রত্যেক নিত্যানিত্যের স্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশ করে। জ্ঞান দূরে নিক্ষেপ করে, প্রেম কুড়াইয়া আনিয়া সেই সকলকে

বাঁধিবার চেষ্টা করে। প্রেম ধর্মের প্রাণ। ধর্ম প্রেমে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সংরক্ষণ ও বন্ধন উভয় কার্য করিয়া থাকে। আমরা অদ্যাবধি প্রাচীন কালের যে কিছু মহৎ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, ধর্মই সে-সকলকে রক্ষা করিয়াছেন। বিধাতা যুগে যুগে মানবের উন্নতির জন্য জগতে যে-সকল সত্য প্রেরণ করিয়াছেন, প্রেম সে-সকলকে প্রাণে পূরিয়া, সে-সকলকে বুকে ধরিয়া আমাদের উন্নতির জন্য রক্ষা করিয়াছেন। আমরা এখন সেই সকল সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

ধর্ম যখন আমাদের প্রাণে আসে, তখন আমরা ঈশ্বরেরই ধ্যানে, তাঁহারই চিন্তনে আনন্দ উপভোগ করি। ইহারই নাম যোগ। যথার্থ প্রেম প্রাণে উদিত হইলে জগতের প্রত্যেক পদার্থকে নূতন বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র প্রেমেই আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করি। যখন মানুষ প্রেমে আত্মবিসর্জন করে, তখন সে কাহাকেও দূরে রাখিতে চায় না। প্রেমাস্পদকে কাছে পাইলেই সুখী হয়। দাম্পত্য প্রেমই তাহার দৃষ্টান্ত। মানুষে মানুষে যখন প্রকৃত প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন তাহাদের মধ্যে একতার আবির্ভাব হয় এবং কার্যকারিণী শক্তি বর্ধিত হয়।

ধর্ম গঠন করে, ভঙ্গ করে না। ধর্ম যাহা কিছু ভঙ্গ করে, তাহা গঠনেরই জন্য। গঠনেই আমাদের স্বাধীনতা এবং আনন্দ। কিছু একটা গড়িয়া উঠিতেছে দেখিতে আমরা ভালবাসি। যেমন, যদি কেহ একটা বাড়ি ভঙ্গ করে, তাহা দেখিলে আমরা আনন্দিত হই না। কিন্তু যদি দেখি, একটা নূতন বাড়ি প্রস্তুত হইতেছে, লোকজন খাটিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা সুখী হই। পথে চলিতে চলিতে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। তেমনই যদি দেখি ছুতার মিস্ত্রীরা একটা কিছু করিতেছে, বাটালি হাতে লইয়া কাঠ কাটিতেছে, তন্মধ্য

হইতে একটা নূতন কিছু বাহির করিতেছে, তবে আমাদের মনে আনন্দের উদয় হয়। এমন কি পাড়ার ছেলেরা পর্যন্ত আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মনোযোগপূর্বক তাহা দেখে; ইহা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। শিশু স্বভাবত গঠন করিতে ভালবাসে, একতাল কাদা লইয়া সে একবার ভাঙে, একবার গড়ে। আবার ভাঙে, আবার গড়ে। দেখে, তদ্দ্বারা নূতন কিছু হয় কি না। মানব-প্রকৃতি স্বভাবত নূতনত্ব-প্রিয়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জগদীশ্বর এ জগতে কদর্যতা ও পাপ প্রেরণ করেন কেন? তদুত্তরে আমি বলি, মানব-প্রকৃতিকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিবার জন্য; পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে লইবার জন্য। বিধাতা যাহা কিছু ভঙ্গ করেন, তাহা গঠন করিবার উদ্দেশ্যে। এই ভাব সর্বত্র। তিনি যেমন কদর্যতা হইতে সৌন্দর্য গড়িয়া তুলেন, আমরাও তেমনি তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু বিনাশোন্মুখ, তাহার মধ্য হইতে নূতন কিছু বাহির করিবার চেষ্টা করি। অতএব গঠন করা ধর্মের কাজ, ভঙ্গ করা ইহার কাজ নয়; যে ভঙ্গ গঠনের পক্ষে আবশ্যক, তাহা অনিবার্য, তাহা অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাত্মা চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের উল্লেখ করা যায়। মুসলমান রাজাদের রাজত্বকালে দেশে নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া, নানা প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়াছিল, শাক্ত তান্ত্রিকাচারের প্রবলতা -নিবন্ধন দেশের ধর্মভাব একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এমন সময়ে মহাত্মা চৈতন্যের অভ্যুদয় হইল। তিনি সেই সকল তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকে ভঙ্গ করিয়া বঙ্গদেশে ভক্তির ধর্মকে স্থাপন করিলেন।

বর্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্মেরও এই কার্য। এই মহা লক্ষ্য প্রাণে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ বর্তমান সময়ে এ দেশে অভ্যুদিত হইয়াছেন। লোকে

বলে, ব্রাহ্মসমাজ দেশের সকল প্রকার অনুষ্ঠানকে বর্জন করিতে চায়, সর্বপ্রকার স্রোতকে বাধা দিয়া নূতন কিছু করিতে চায়। এ কথা সত্য নয়। ভগ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ কখনই ভগ্ন করেন না। গঠনের জন্যই ভগ্ন করেন। প্রকৃতিতে যেমন দেখি, সকল প্রকার পুরাতন জীর্ণ বস্তুর মধ্য হইতে নূতন কিছু গঠিত হয়, তেমনই বিধাতার নিয়মে এই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। এ দেশের প্রচলিত কুসংস্কারাদি বর্জন করিয়া লোকের মনে নূতন ধর্মভাব স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রাচীনের যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, তাহা অবশ্য রক্ষা করিবেন। বর্তমান সময়ে ধর্মবিহীন শিক্ষাতে মানব-হৃদয়ে যে ধর্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাকে ঘুচাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে নূতন ধর্মভাব, ইহা পরমেশ্বরের আশীর্বাদে শুষ্ক মানব-হৃদয়ে ধর্মবারি বর্ষণ করিবার জন্য আসিয়াছে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, সমুদয় জগতের পরিত্রাণের জন্য বিধাতার মঙ্গল বিধানে ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। অতি উন্নত, অতি মহৎ আদর্শ প্রাণে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ বর্তমান সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। জ্ঞানে গভীরতা লাভ করিয়া, প্রেমকে বিশাল করিয়া, কর্তব্যজ্ঞানকে দৃঢ় করিয়া, ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হইয়া, চরিত্রকে পবিত্র করিয়া, নরসেবাতে নিপুণতা লাভ করিয়া— সংক্ষেপতঃ মানবত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের দ্বারা— এ ধর্মের সেবা করিতে হয়। পূর্বকালের সাধুগণ এক এক দেশে আবির্ভূত হইয়া তৎ তৎ সময়ে তৎ তৎ দেশে যে-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ সে-সকলকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ, তাহা ব্রাহ্মসমাজের গ্রহণীয়। এক দিকে যেমন পুষ্পের ন্যায় কোমল হইতে হইবে, সেইরূপ আবার কর্তব্যপালনে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হইতে হইবে। বিশ্বাস, বৈরাগ্য,

সেবা, ভগবানে নির্ভর— ইহাই ব্রাহ্মধর্মের মহা আদর্শ। ভগবান্ করুন, তাঁহার শুভ ইচ্ছা প্রাণে ধরিয়া, দেহ মনের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়া আমরা যেন এ ধর্মের সেবা করিতে পারি।

৬ মাঘ ১৮১৮ শক। ১৮৯৭ খ্রী

ধর্মের সার ও অসার

জগতে যত প্রসিদ্ধ ধর্মসম্প্রদায় দেখা যায়, তৎসমুদায়ের ইতিবৃত্ত নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনটি ধারা আবহমান কাল হইতে নামিয়া আসিতেছে এবং সেই সকল সম্প্রদায় সেই ধারাত্রয়ের সমষ্টির ফলমাত্র। প্রথম সমাজধারা, দ্বিতীয় গুরুধারা, তৃতীয় শাস্ত্রধারা। কি আমাদের দেশে, কি অন্যান্য দেশে, যে কোনও দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর-না কেন, সর্বত্রই দেখিতে পাইবে যে, এই তিন ধারাকে অতিক্রম করিয়া কোনও কালে কোনও দেশে ধর্ম তিষ্ঠিতে পারে নাই।

ধর্মসমূহের উন্নতি ও বিকাশের প্রণালী বিষয়ে চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, প্রায়ই সকল ধর্মের আদিতে ঈশ্বর কোনও কোনও অসাধারণ-প্রতিভাশালী আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি-সম্পন্ন মহাপুরুষের অন্তরে কতকগুলি অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সকল দেশেই দেখিতে পাই, ইঁহারা সাধারণ ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত। এই সকল মহাজন আমাদের দেশে 'ঋষি' শব্দে অভিহিত। এই ঋষি শব্দের অর্থ অতি চমৎকার। "ঋষয়োর্মন্ত্রদ্রষ্টারঃ", যাঁহারা মন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট সত্য-সকলকে দর্শন করেন, তাঁহারাই ঋষি। কেবল যে ধর্মজগতেই ঋষি আছেন তাহা নহে। আমার বিবেচনায় ঋষি দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ঋষি আছেন, তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের গবেষণা অধ্যাত্ম-জগতেই আবদ্ধ। তাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার-সকলের আলোচনাতেই দেহ মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করেন। কিরূপে আত্মায় পরমাত্মায় যোগ সাধিত হয়, কিরূপে মানবের উচ্ছৃঙ্খল এবং স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতিকে ধর্মনিয়মের অধীন করা যায়, এই বিষয়েরই ধ্যানেতে ও

চিন্তাতে তাঁহারা আপনাদের মন প্রাণ অর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর ঋষি আছেন। তাঁহাদের চিন্তা, তাঁহাদের ধ্যান ঐ অতীন্দ্রিয় পদার্থে আবদ্ধ নহে; কিন্তু এই ভৌতিক রাজ্যের তত্ত্বসকলের আলোচনাতে, তৎসমুদয়ের প্রকৃতি নির্ধারণেই ইঁহারা নিমগ্ন। ইঁহারা পূর্বোক্ত সাধুদিগের ন্যায় পারলৌকিক বিষয়সমূহের চিন্তা করেন না, কিন্তু লৌকিক তত্ত্বসকলের আলোচনাতেই নিযুক্ত থাকেন। যদিও ইঁহারা ভারতীয় আর্য ঋষিগণের ন্যায় সেই সূক্ষ্ম, অনির্দেশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অনির্বচনীয় পরম সত্তার প্রকৃতি -নির্ণয়ে এবং মানবাত্মার সহিত সেই সত্তার সম্বন্ধ -নির্ধারণে নিযুক্ত থাকেন না, তথাপি ইঁহারা ঋষি। ভৌতিক রাজ্যে ইঁহারা ঋষি। এই সকল জ্ঞানী মহাজনগণ অপরের উপর নির্ভর না করিয়া, আপ্তবাক্যে সম্পূর্ণ প্রতীতি না রাখিয়া, স্বীয় স্বীয় শক্তিকে খাটাইয়া, আপনাদের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় প্রভৃতির দ্বারা সত্যরত্ন লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন এবং অবশেষে সফলমনোরথ হইয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই, এই সকল জ্ঞানিজনের এবং তোমার আমার মধ্যে প্রভেদ কি? প্রভেদ এই যে, এই সকল বিজ্ঞানবিদ্ মহাজনগণ যুগে যুগে জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, আর তুমি আমি অপরের নিকটে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভেদ এই যে, তাঁহারা সত্যকে পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন, আর তুমি আমি পরোক্ষ ভাবে জনশ্রুতিতে সেই সত্য লাভ করিয়াছি। সত্যের এই সাক্ষাৎকারই ঋষিত্ব। অধ্যাত্মজগতের ঋষিগণও পরমার্থ-চিন্তায় দিনযামিনী যাপন করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনিত্যের মধ্যে নিত্য যিনি, সকল প্রকার অসারের মধ্যে সার যিনি, এই স্থূল এবং দৃশ্য জগতে সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য যিনি, সেই চিন্ময় পরম পুরুষকে

তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করেন, এবং তাঁহারা সহিত প্রেমের বিনিময় দ্বারা যোগ স্থাপন করেন। কঠোর সাধনার দ্বারা, কঠোর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দ্বারা তাঁহারা এমন এক স্থানে অধিরোহণ করেন, যেখানে সেই পরম পুরুষের জ্যোতি সাক্ষাৎ দর্শন করেন। আমি বিশ্বাস করি, এই ধর্মাচার্যগণ ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য কবিয়াছেন। সেই পূর্ণশক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাবে তাঁহাদের অন্তর পূর্ণ থাকিত। ধন্য বিধাতা, যিনি যুগে যুগে জগতের সাধারণ লোকের পথপ্রদর্শক রূপে এই সকল নরসিংহকে প্রেরণ করেন। ধন্য সেই মহাপুরুষগণ, যাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজ জগতের সহস্র সহস্র নরনারী জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে। এই সকল অমানুষী শক্তি -সম্পন্ন পুরুষই ঋষি।

অধ্যাত্ম-জগতের এই সকল ঋষি চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কি যে তত্ত্ব পাইলেন, অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে কি এক তত্ত্ব দেখিলেন, ভাষায় আর তাহা ব্যক্ত হইল না। সে সত্যের নিকট ভাষা পরাস্ত হইল! কিন্তু সেই যে অব্যক্ত ভাষা, সেই যে অপরিস্ফুট ভাব, সেই যে অপ্রকাশ্য প্রকাশ, তাহারই পশ্চাতে জগতের লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া গেল। সেই যে ব্যক্ত না করার আকর্ষণ, তাহারই দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মানব-সমাজ তাঁহাদের পদপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইল। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, কোনও স্থানে মধু থাকিলে মক্ষিকা যেমন আপনা হইতেই সেই স্থানে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই সমুদয় জগৎ-গুরুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাদের পশ্চাতে ছুটিল। আগুন জ্বালিলে পতঙ্গ যেমন সেই অগ্নিতে আপনাকে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ এই সমুদয় জ্ঞানিজন সাধনের কি এক অগ্নি জ্বালিলেন, যাহাতে জগতের পাপী, তাপী, পথশ্রান্ত, ক্লান্ত নরনারী আসিয়া আপনাদিগকে আহুতি

প্রদান করিল। যেমন এক-একখানি ইঞ্জিনের পশ্চাতে এক দুই তিন চারি করিয়া অনেকগুলি গাড়ি জুড়িয়া এক-একখানি ট্রেন প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ইঁহাদের এক-একজনের পশ্চাতে এক দুই তিন চারি করিয়া বহু লোক জুড়িয়া এক-একটা সম্প্রদায় হইল। এই সমুদয় ঋষি অথবা সিদ্ধপুরুষ হইতে সম্প্রদায়সকলের উৎপত্তি হইল। ইহা হইল সমাজ-ধারা। এই যে সমাজ বা মণ্ডলী বা ধর্মসম্প্রদায়, ইহা হইতেই অপর দুইটি ধারা বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় গুরুধারা। দেখা গেল, এই সম্প্রদায়সকলের মধ্যেই অনেক গুরু বা ধর্মোপদেষ্টা অভ্যুদিত হইলেন। এই গুরু বা উপদেষ্টাগণ সাধনার দ্বারা মহাজনলব্ধ সত্য বস্তুকে আপনারা আয়ত্ত করিলেন। কাষ্ঠ জোগাইয়া অগ্নিকে রক্ষা করার মত এই সমুদয় আচার্য বা উপদেষ্টা সত্যাগ্নি রক্ষা করিলেন। এই সকল সমাজের যে বিশেষ ভাব বা আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ, তাহাই ইঁহাদের দ্বারা উত্তম রূপে সাধিত হইয়া অপর দশ হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের অবলম্বিত তত্ত্বসকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া ও তাঁহাদের অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ সাধন-প্রণালী সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করিয়া ইঁহারা উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগকে গুরু বল, আচার্য বল, ধর্মোপদেষ্টা বল, শাস্ত্রকার বল, একই কথা। ইঁহাদেরও একটি ধারা বা শিষ্যপরম্পরা আছে। অর্থাৎ এক যুগের গুরুগণ স্বীয় শিষ্যবর্গকে যে জ্ঞানসম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহা আবার তাঁহারা পরিবর্তিত ও হয়ত বর্ধিত করিয়া স্বীয় শিষ্যবর্গকে দিয়াছেন। এইরূপে গুরুপরম্পরা-ক্রমে ঐ জ্ঞানসম্পত্তি নামিয়া আসিতেছে।

তৎপরে শাস্ত্রধারা। এই ঈশ্বরদত্ত সত্যের সাধকগণ যখন সত্যকে সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করিলেন, তখন ইঁহাদের মধ্যে কোন কোনও

ব্যক্তি স্বীয় শিষ্যবর্গের উন্নতির জন্য, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের আচার-ব্যবহারকে নিয়মিত ও শাসিত করিবার জন্য, কতকগুলি আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিলেন। এই শাস্ত্র দ্বিবিধ—প্রথম কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় জ্ঞানকাণ্ড। শিষ্যবর্গের ক্রিয়াকলাপ ও রীতি-নীতিকে নিয়মিত করিবার জন্য যে-সকল বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত; এবং তাহাদের ধর্মোন্নতির ও জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশে যে-সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞানকাণ্ড নামে বিদিত। সকল দেশেই এই দুই প্রকার শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড -সমন্বিত শাস্ত্রেরও একটি ধারা আছে। অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র ও গ্রন্থ এক যুগে বা এক কালে রচিত হয় নাই; বংশপরম্পরানুক্রমে শাস্ত্র হইতে শাস্ত্র, গ্রন্থ হইতে গ্রন্থ -সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র যুগে যুগে রচিত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।

এই ত্রিধারা— প্রথম ধর্মসমাজ, দ্বিতীয় উপদেষ্টা গুরু বা আচার্য, তৃতীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ উপদেশ— ধর্মসম্প্রদায়-সকলের জন্ম অবধি জগতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এই ধারাত্রয় কখনই ধর্ম শব্দে বাচ্য নহে। ইহারা ধর্মের রক্ষক ও পোষক মাত্র। এই ত্রিধারার মধ্যে ধর্মসমাজ সর্বপ্রধান। ইহা অপর দুই ধারার জন্মদাতা এবং রক্ষক। ধর্মসমাজকে গুরু ও শাস্ত্রের জন্মদাতা বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, ধর্মসমাজ না থাকিলে ধর্মাচার্য থাকিত না। আচার্য, শিক্ষক, উপদেষ্টা বা গুরু যাঁহাদিগকে বলিতেছি, তাঁহারা কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? গুরুদিগের উৎপত্তির ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গুরুগণ তৎ তৎ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চিন্তা ও সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানগণ বলেন যে, ধর্মসম্প্রদায় অর্থাৎ ধর্মসমাজ অপেক্ষা

শাস্ত্র অর্থাৎ বাইবেল শ্রেষ্ঠ। আবার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় বলেন যে, বাইবেল অপেক্ষা ধর্মসমাজ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথার্থ চিন্তা করিয়া দেখিলে রোমান ক্যাথলিকদের মতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ ধর্মসমাজ যদি না থাকে, অর্থাৎ অনুরাগী, বিশ্বাসী লোকসকল যদি না থাকেন, সত্যকে সাধন করিবার জন্য ব্যাকুল সাধকদল যদি না থাকেন, তবে গুরু ও শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় না, কোনও সত্যই জগতে দাঁড়াইতে বা কার্য করিতে পারে না। সত্যরূপ অগ্নিকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকরূপ কাষ্ঠসকল সর্বদাই প্রয়োজনীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রের ত কথাই নাই। ধর্মসমাজ যতক্ষণ জীবিত, শাস্ত্রও ততক্ষণ জীবিত। ধর্মসমাজের বিলোপ হইলে শাস্ত্রেরও বিলোপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন ব্যাবিলন, নিনিভা, মিশর, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের সমাজ-সকলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে-সকল সমাজের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শাস্ত্রসকলও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন পুরাতন সমাধি-মন্দিরে ও প্রোথিত প্রস্তরফলকে খোদিত লিপিসকল পাঠ করিয়া তাহাদের শাস্ত্রীয় উক্তিসকল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণকে গভীর গবেষণা সহকারে সেই সমুদয় প্রোথিত প্রস্তর অবলম্বনে উক্ত জাতিসকলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, তাহাদের শাস্ত্রীয় বচনসকল উদ্ধার করিতে হইতেছে। ইহার সহিত জেন্দাভেস্তার উক্তিসকলের তুলনা কর, সেগুলি অদ্যাপি জীবিত, কারণ অগ্ন্যুপাসক পারসিক সম্প্রদায় এখনও জীবিত রহিয়াছেন।

সেইজন্য বলি, শাস্ত্র ও উপদেষ্টা অপেক্ষা ধর্মসমাজ শ্রেষ্ঠ। যে ধর্মসমাজ যতক্ষণ জীবিত, তৎসঙ্গে-সঙ্গে তাহার শাস্ত্র এবং গুরুও ততক্ষণ জীবিত। সমাজের যখন মরণ, শাস্ত্র ও উপদেষ্টাও তখন মৃত। তখন আর সে সমাজের শাস্ত্রসকল জীবন্ত ভাবে মানব-প্রাণে কার্য

করিতে পারে না, তখন সে সমাজের শাস্ত্র প্রাচীন গ্রন্থে, প্রোথিত প্রস্তরফলকে অথবা অন্য কোনও আকারে বাস করে।

এই যে ত্রিধারা নামিয়া আসিতেছে, এই ত্রিধারার সম্মিলিত ফল এই সকল ধর্মসম্প্রদায়। এই সমাজধারা, গুরুধারা ও শাস্ত্রধারা সম্মিলিত হইয়া সম্প্রদায় গঠিত হয়। এগুলি যেন আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের কোষ-স্বরূপ। যেমন বৃক্ষের বীজ এক-একটি ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে বাস করিয়া অল্পে অল্পে বর্ধিত হয়, এবং কালক্রমে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফুল এবং ফল -সমন্বিত এক-এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলও সমাজ, গুরু এবং শাস্ত্র -স্বরূপ কোষে নিহিত থাকিয়া অল্পে অল্পে বর্ধিত হয়, এবং কালক্রমে শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত এক-একটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ের আকারে পরিণত হয়। এগুলি কোষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধর্মতরুর বীজ এই কোষের মধ্যে বাস করে। কোষ যেমন বীজের রক্ষক এবং পরিপোষক, সেইরূপ এগুলিও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের রক্ষক ও পরিপোষক। এগুলি আধার মাত্র। কোষ যেমন বৃক্ষের সারভাগকে রক্ষা করে, এগুলিও সেইরূপ ধর্মের সার যাহা তাহাকে রক্ষা করে।

সকল দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এ ত্রিধারা— অর্থাৎ ধর্মসমাজ, শাস্ত্র এবং গুরু— কোষরূপ হইয়া তৎ তৎ ধর্মের সারভাগকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ধর্ম-সম্প্রদায়সকলের গতি যেন নদীর গতির ন্যায়। যখন কোনও নদী-স্রোত কোনও নির্ঝর হইতে নামিতে থাকে, সে স্থানের বারিরাশি কেমন স্বচ্ছ ও নির্মল। কিন্তু যতই সেই জলস্রোত নানা দেশের মধ্য দিয়া, বন ও উপবন প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, যতই বিস্তৃতি এবং গভীরতা লাভ করে, ততই তাহার জল মলিন ও পঙ্কিল হইয়া

যায় ; দেশ-দেশান্তরের আবর্জনারাশি সেই জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার স্বচ্ছতা, তাহার নির্মলতা নষ্ট করিয়া দেয়। সেইরূপ ধর্মস্রোত-সকল যখন ধর্মপ্রবর্তক মহাজনদিগের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছিল, তখন তাহারা কেমন নির্মল ছিল। কিন্তু যতই তাহারা নামিয়া আসিয়াছে, দেশ-দেশান্তরের নরনারী আসিয়া যতই সেই সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছে, ততই তাহাদের প্রসার ও বিক্রম বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আদিম নির্মলতা কিয়ৎপরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। যতই তাহাদের প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই যেন তাহারা আবর্জনারাশির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। যতই দিন গিয়াছে, ততই তাহারা অসার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল কোষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেমন বীজের রক্ষা এবং পোষণের জন্য আধার আবশ্যক, সেইরূপ ধর্মবীজের রক্ষা এবং পোষণের জন্য শাস্ত্র, গুরু এবং সমাজ-রূপ আধার-সকলের আবশ্যক। কিন্তু এগুলি অসার। বীজ যেমন সার এবং কোষটি অসার, সেইরূপ ধর্মই সার, যে অধ্যাত্মতত্ত্বের রক্ষা-হেতু শাস্ত্র ও গুরু প্রভৃতির আবশ্যক, তাহাই সার এবং এইগুলি অসার। কিন্তু জগতের সাধারণ লোক আশৈশব এতদুভয়কে একত্র-সন্নিবিষ্ট দেখিয়া এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ধারণা করিতে পারে না যে এগুলি অসার ও পরিবর্তনশীল, এগুলি ধর্ম নহে কিন্তু ধর্মের বহিরাবরণ মাত্র।

সাধারণ স্থূলদর্শী মানুষ বীজ এবং কোষকে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে পারে না ; তাহারা মনে করে, এতদুভয়ে অভিন্ন। কিন্তু আমরা জানি, কোষ হইতে বীজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। কোষটি থাকিবে না, উহা পচিয়া কালক্রমে মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে ; সার বস্তু যাহা তাহাই কালক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত হইবে। সেইরূপ পৃথিবীর লোক ভাবিতে

পারে না যে, ধর্ম ঐ সকলকে বর্জন করিয়া দৃঢ় এবং পরিপুষ্ট হইতে পারে। যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পোষণ-হেতু সমাজ, শাস্ত্র এবং গুরুর প্রয়োজন, তাহাই যে কালক্রমে পরিপুষ্ট হইবে, এবং অসার ভাগ ক্রমান্বয়ে খসিয়া যাইবে, ইহা পৃথিবীর লোকে ভাবিতে পারে না।

বাহিরের আবরণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াও যে ধর্ম দাঁড়াইতে পারে, এ সত্য বুঝিতে এ দেশের লোকের এখনও বহুদিন লাগিবে। সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, শ্রুতি অর্থাৎ লৌকিক আচার এবং শাস্ত্রোপদেশ ও গুরূপদেশ যাহা আছে, তাহা পালনই ধর্ম। ধর্ম ও-সকলকে ছাড়িয়া অন্য আকারে থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে যে একটি চিরপ্রচলিত উক্তি আছে, "নাস্তিকো বেদনিন্দুকঃ"—নাস্তিক কে? না, যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা করে, তাহাও এই ভাব হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের বাক্যের ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহারা ঐ বাহিরের সামগ্রীগুলিকে ধর্ম বলিয়া মনে করেন। উহাকেই তাঁহারা সার জানেন; তাঁহারা মনে করেন, ওগুলিকে ছাড়িয়া ধর্মসাধন সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব। তাঁহাদের ধারণা যে, বেদের উপদেশ এবং বিধিব্যবস্থা -সকল না মানিলে ধর্মসাধন হইতে পারে না।

কেবল যে আমাদের দেশেই এই সংস্কারের প্রাবল্য দেখিতে পাই তাহা নহে। অন্যান্য দেশেও ইহা দেখা যায়। মানুষ এই সমুদায় অসার বিষয়কে সার বিবেচনা করিয়া তাহারই ধ্যানেতে ধর্মের সার ভাগকে ভুলিয়া যায়। ইউরোপের ন্যায় সুসভ্য এবং সুশিক্ষিত দেশে দেখি, শাস্ত্রের প্রতি মানুষের এমনই আস্থা যে, যদি কেহ বাইবেলে লিখিত সমুদয় কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করে, তবে সে ব্যক্তি অধার্মিক বলিয়া সাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়। কিন্তু একজন বাইবেল না মানিয়াও, বাইবেলের এক পংক্তি না পড়িয়াও যে ধার্মিক হইতে পারে, উক্ত

পুস্তককে সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করিয়াও যে মানুষ উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে পারে, ইহা তাঁহারা ভাবিতেই পারেন না। ঐ শাস্ত্র দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের মানসিক অবস্থা এমনই হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা মনে করেন যে, ধার্মিক হইতে হইলেই বাইবেলের উপদেশ সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করা চাই।

বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে দুই শ্রেণীর নাস্তিক আছেন, ইঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণী অ্যাগ্‌নস্টিক (অজ্ঞেয়তাবাদী) এবং দ্বিতীয় শ্রেণী সেকুলারিস্ট (লৌকিকতাবাদী) নামে অভিহিত। প্রথম-শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ জ্ঞানোন্নত, শিক্ষিত এবং সভ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী জ্ঞান বিষয়ে উঁহাদের অপেক্ষা হীন, অশিক্ষিত। এই উভয় শ্রেণীই আপনাদিগকে ধর্মের বাহিরে মনে করেন, কারণ উভয়েই বাইবেলোক্ত খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে এমন বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোক আছেন, যাঁহারা কোনও প্রকার ধর্ম মানেন না। তাঁহারা এই কারণে ধর্মকে বর্জন করিয়াছেন যে, বাইবেল গ্রন্থের উপর তাঁহারা বিশ্বাস রাখিতে পারেন নাই। কিন্তু বাইবেলে বিশ্বাস না থাকিলেও যে মানুষ ধার্মিক হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন, "যখন বাইবেল ছাড়িয়াছি, তখন ধর্মের ভিত্তিও ছাড়িয়াছি।"

এই প্রকার সংস্কার থাকাতেই আমাদের দেশে অনেক লোকে ব্রাহ্ম-দিগকে নাস্তিক মনে করেন। এমন অনেক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আছেন, যাঁহারা বলেন, "ব্রাহ্মেরা নাস্তিক।" অনেক সময় এরূপ লোকের সহিত আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা বলেন, "আরে, তোমরা ত নাস্তিক।" "কেন, নাস্তিক হইলাম কিরূপে?" "আরে, তোমরা শাস্ত্র মান না, গুরু মান না, তোমরা নাস্তিক নও ত কি? তোমরা বেদের নিন্দা কর, শাস্ত্রোপদেশ-সকলকে অগ্রাহ্য কর, তোমরা নাস্তিক নও ত

নাস্তিক আবার কে ?" বেদকে অভ্রান্ত না মানিয়াও আমরা যে ধর্মসাধন করিতে পারি, প্রতিমা গঠন না করিয়াও আমরা যে পরব্রহ্মের অর্চনা করিতে পারি, ইহা তাঁহারা কিছুতেই ধারণা করিতে পারেন না। উপাসনা বলিলেই তাঁহাদের মনে পড়ে সাকারোপাসনা, আরাধনা বলিলেই তাঁহারা ভাবেন ফুল এবং বিল্বপত্র।

এইস্থানে আমার একটি গল্প মনে পড়িতেছে। এটি একটি সত্য ঘটনা। কোনও এক পল্লীগ্রামে একবার একটি শিশু বালিকাকে একটি মৃতদেহ দেখান হইয়াছিল। একটি তেঁতুলবৃক্ষতলে, একটি জলাশয়ে ঐ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে অন্তর্জল করা হইয়াছিল। বালিকাটিকে বলা হইল, "দেখ, ইনি মরিয়াছেন।" বালিকাটি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিল, মৃত শরীর হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার কিছুদিন পরে একদিন সেই গ্রামে ঝড় আরম্ভ হইল। সেই ঝড়ে এক বুড়ীর একখানি গৃহ ভূমিসাৎ হইল। একজন চিৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, বুড়ী যে মরে, তোমরা দেখ।" তখন সেই বালিকা ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মা, তেঁতুলতলায় বুড়ী কি হাঁ করেছে?" সে জানে, মরিতে হইলে তেঁতুলতলায় হাঁ করা চাই ; তেঁতুলতলায় হাঁ না করিয়াও যে মানুষ মরিতে পারে, সে জ্ঞানটি তাহার তখন হয় নাই। তেমনই আমাদের দেশের লোকের এ কথা বুঝিতে সময় লাগিবে যে, মানুষ বিশেষ শাস্ত্র বা গুরু প্রভৃতি না মানিয়াও ধর্মসাধন করিতে পারে।

এই শাস্ত্র, গুরু এবং সমাজ— এই তিনটি ধারা, এই তিনটি কোষ। কোষের অর্থ আছে। কোষটি অসার তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অসার কোষের মধ্যে যেমন বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহার ভিতর যেমন বৃক্ষের সার ভাগ রক্ষিত এবং পরিপুষ্ট হয়, তেমনই ধর্মের যেটুকু আসল জিনিস অর্থাৎ ধর্মতরুর বীজস্বরূপ, সেটুকু ঐ ত্রিবিধ কোষের মধ্যে

লুক্কায়িত থাকিয়া রক্ষিত এবং পরিপুষ্ট হয়। বীজের রক্ষার জন্য কোষ যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, ধর্মবীজের ধারণ, রক্ষণ, এবং পরিপোষণের জন্য তেমনি সমাজ, আচার্য ও শাস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। জগতের ইতিবৃত্তে এগুলি ফুটিবেই ফুটিবে। ধর্মের সার ভাগের সঙ্গে এই অসার ভাগ থাকিবেই থাকিবে। অনেক সময় দেখা যায়, এগুলিকে ছাড়াইয়া ধর্ম তেমন সুন্দর রূপে বাড়িতে পারে না।

পূর্বে বলিয়াছি, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের অপেক্ষা ধর্মসমাজ শ্রেষ্ঠ। আবার শাস্ত্র অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ঠ। এক-একজন জীবন্ত গুরুর সাহায্যে, তাঁহাদের সংস্পর্শে মানুষ যত জানিতে পারে, যত শিখিতে পারে, আজীবন শাস্ত্রের পাতা উল্টাইয়াও ততটা কখনই শিখিতে পারিবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকখানি ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্ম আচার্যগণের উপদেশাবলীও মুদ্রিত হইয়াছে। যদি কেহ দূরে বসিয়া সেইগুলি পাঠ করেন তাহা হইলে কি ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম সংক্রান্ত সকল কথা জানিতে পারিবেন? কখনই না। আমাদের সঙ্গে একমাস কাল বাস করিলে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ভিতরকার ভাব যত ধরিতে পারিবেন, দশ বৎসর শাস্ত্র পড়িয়াও ততটা ধরিতে পারিবেন না। কেন পারিবেন না? সব কথা কি গ্রন্থে লিখিত থাকে? একটা জীবনের সকল অভিজ্ঞতা কি লেখা যায়? মানুষ নির্জনে, গোপনে, জীবনের নানা মুহূর্তে এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে যাহা ঢালিয়া দেয়, তাহার সকল কথা কি গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়? রামমোহন রায়ের প্রমুখাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যত কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহার সকল কথা কি লিখিত হইয়াছে? তাঁহার নিকট হইতে যে ভাব পাইয়াছিলেন, তাহার অবিকল ছবি কি কোনও গ্রন্থে

আছে? আবার মহর্ষিতে আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহার ভাব কি কোনও গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব? তেমনই আবার স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় মহর্ষি মহাশয়ের প্রমুখাৎ যে-সকল উপদেশ পাইয়াছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার নিকট বাস করিয়া যে সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আমরা জানি। কেশববাবুর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া, বহু বৎসর তাঁহার সহিত যাপন করিয়া সে-সকল উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার যে কয়খানি জীবনচরিত লেখা হইয়াছে, তাহাতে এমন অনেক কথা নাই যাহা আমরা জানি। আমরা কেশববাবুকে যেরূপ জানি, কেহ কি সেই জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সেরূপ ভাবে জানিতে পারিবেন? জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যত শোনে বা দেখে, গ্রন্থাদিতে কখনই তাহা নিবদ্ধ হইতে পারে না। জীবন হইতে জীবন উৎপন্ন হইয়াছে। কেশবচন্দ্র না জন্মিলে কে আজ আমাদিগকে এখানে দেখিত? এই কারণেই গুরু অপেক্ষা শাস্ত্র নিকৃষ্ট।

আবার ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া খ্রীষ্টীয় সমাজের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। সকলেই জানেন যে, এরূপ প্রবাদ যে, যীশুর জীবন সম্বন্ধে যে চারিখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, তাহা ম্যাথিউ, মার্ক, লুক এবং জন নামক তাঁহার চারিজন পার্শ্ববর্তী শিষ্য কর্তৃক লিখিত। কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বর্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা নির্ধারণ করিয়াছেন যে, সে-সকল এক কালে বা এক যুগে লিখিত নহে। তাঁহারা বলেন যে, জনের নামে পরিচিত গ্রন্থখানি যীশুর মৃত্যুর অন্তত দেড় শত বৎসর পরে লিখিত। অপর তিনখানিও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের দ্বারা লিখিত নহে, তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে সংকলিত। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত

না হইয়াও এ কথা বলা যায় যে, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ যদি উক্ত গ্রন্থ-চতুষ্টয় মহাত্মা যীশুর পার্শ্বস্থিত চারিজন শিষ্যের দ্বারা অর্থাৎ যাঁহারা খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার গতি ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিতেন, এমন চারিজন শিষ্যের দ্বারা লিখিত হয়, তাহা হইলেও কি ইহাতে যীশুর জীবন সংক্রান্ত সমুদয় কথা আছে ? কখনই না, তাহার অনেক কিংবদন্তীর আকারে নামিয়া আসিয়াছে। এ কথা কখনই বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নয় যে, একটি সমাজের প্রাচীন আচার্যগণের সকল উপদেশ, তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধীয় সকল কাহিনী শাস্ত্রাকারে নিবদ্ধ হয় না ; অনেক কথা শ্রুতির আকারে থাকে। শ্রুতি অর্থে বাচনিক উপদেশ, অর্থাৎ গুরুদিগের যে-সকল উপদেশ গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া শিষ্য-পরম্পরানুক্রমে মুখে মুখে নামিয়া আইসে।

প্রায় সকল ধর্মসমাজেই দেখিতে পাই যে, গুরুদিগের উপদেশসকল শ্রুতি এবং স্মৃতি এই দ্বিবিধ আকারে বাস করে। জগতের সমুদয় জাতি -মধ্যেই শ্রুতি এবং স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি কি ? প্রাচীন আচার্যগণের যে সমুদয় উপদেশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া বাস করে, সেই সমুদয়ের নাম স্মৃতি। যেমন আমাদের দেশের স্মৃতি মন্বাদি-প্রণীত গ্রন্থ। এই সকল শ্রুতি এবং স্মৃতির সাহায্যে মানুষ পূর্ব আচার্যগণের উপদেশাদি জ্ঞাত হয়। এই যে বংশপরম্পরায় উপদেশ নামিয়া আসা, ইহা সকল দেশেই আছে এবং থাকিবে। ঋষিগণ যে কিছু পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিবেন, তাহার কিয়দংশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া স্মৃতির আকারে থাকিবে, অবশিষ্টাংশ লোকমুখে শ্রুতির আকারে নামিয়া আসিবে।

সব ধর্মসমাজে এই শ্রুতি এবং স্মৃতি নামিয়া আসিয়াছে ; আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও শ্রুতি আছে, স্মৃতিও আছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন

রায় এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের যে-সকল কথা আমরা মুখে মুখে শুনিয়াছি এবং আমাদের পরবর্তী বংশের জন্য আমরা মুখে মুখে রাখিয়া যাইব, তৎসমুদয় আমাদের শ্রুতি। আমাদের পরবর্তী বংশ আবার তৎপরবর্তী বংশের নিকট সেই সমুদয় কথা বলিবে, বংশানুক্রমে এই সকল শ্রুতি নামিয়া যাইবে। আর তাহার যে অংশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইবে তাহা স্মৃতি।

এখন প্রশ্ন এই, আমরা যে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিয়া একটা সমাজ স্থাপন করিয়াছি, এই সমাজের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? নিশ্চয় আছে। ব্রাহ্মসমাজ কোষ, ব্রাহ্মধর্মতরুর বীজকে রক্ষণ এবং পোষণ করিবার আধার। ব্রাহ্মসমাজে যত ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা সকলে সেই বীজকে ধারণ করিবার কোষ মাত্র। ব্রাহ্মধর্মের বিশেষ ভাব এই সমাজ-রূপ কোষের মধ্যে রক্ষিত হইবে। এই ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিলে ইহা হইতেই শাস্ত্র ও গুরু সমুদয় উত্থিত হইবে।

গুরু, শাস্ত্র ও সমাজ এই তিন ধর্মবীজের আবরণ মাত্র, সুতরাং ধর্মের অসার ভাগ হইলেও ধর্ম-বীজের রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, ধর্মের সার ভাগ কি? বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও মহম্মদীয়ধর্ম প্রভৃতি জগতের প্রত্যেক ধর্মবিধানের এক-একটি বিশেষ ভাব আছে, তাহাই উক্ত ধর্মের বীজ; গুরু, শাস্ত্র, সমাজ তাহারই রক্ষণ ও পোষণ করিয়া আসিয়াছে। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্মেরও একটি বিশেষ ভাব আছে, তাহার রক্ষণ ও পোষণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়। ভারতের পক্ষে সে বিশেষ ভাবটি এই—ভারতের চিরপরিচিত ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তির ধর্মে পরিণত করিয়া ব্রাহ্মধর্মের আকারে গৃহ-পরিবারে ও জনসমাজে প্রয়োগ করা। রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই ভাব ধারণ করেন, তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ইহাকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র ইহাতে কিছু কিছু পাশ্চাত্য ভাব যোগ করিয়া ইহাকে উদার সার্বভৌমিক ধর্ম রূপে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরাও সেই কার্যে ব্রতী রহিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম অপরাপর দেশে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিবে, কিন্তু সর্বত্রই গুরু, শাস্ত্র ও সমাজ এই তিন কোষে তাহার রক্ষণ ও পরিপোষণ হইবে।

ব্রাহ্মধর্মের এই বিশেষ ভাবের আর একটু পশ্চাতে গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল ধর্মের মধ্যে এমন কিছু সারতত্ত্ব আছে, যাহা সকল ধর্মেই এক। সেখানে সকল ধর্মের একতা। সকল ধর্ম ও সকল ধর্মপ্রবর্তক মহাজন একটা বিষয় চাহিতেছেন, যে বিষয়ে তাঁহাদের অদ্ভূত একতা। সকলেই মানবের ইচ্ছাকে অপর এক মহা নিয়ম বা শক্তি বা ইচ্ছার অধীন করিতে চাহিতেছেন।

শক্তি বা ইচ্ছাকে ভিন্ন ভিন্ন মহাজন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ করিয়াছেন। ভক্তিপথাবলম্বিগণ এই শক্তিকে প্রেমের চক্ষে পুরুষ রূপে দেখিয়া তাহার নানা স্বরূপ প্রতীতি করিতেছেন এবং এক-একজন এক-একটি স্বরূপ অবলম্বন করিয়া বিশেষ ভাবে সাধন করিয়াছেন। কেহ পিতৃভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ সখাভাবে, কেহ পতিভাবে, কেহ পবিত্রাত্মাভাবে তাঁহাকে ধরিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যে ভক্ত যে ভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি তাহাতেই বিভোর হইয়া জগদ্‌বাসীর সমক্ষে তাহা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার ভাববিহ্বল চিত্তের নিকটে বোধ হইয়াছে, সেই ভাবটিই শ্রেষ্ঠ, অপর সমুদয় ভাব নিকৃষ্ট ; তিনি সেই ভাবেই প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অনুবর্তী শিষ্যগণ তাঁহারই ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই অবলম্বিত সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে জগতে ভক্তদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম আমাদের অন্তরে যে উদার আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন ভাব আনিয়াছেন, তাহার প্রসাদে আমরা অনুভব করিতেছি যে, জগতের ভক্তদিগের মধ্যে ভাব ও সাধনপ্রণালীর পার্থক্য যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে বাস্তবিক বিরোধ নাই। একজন যাহা প্রস্ফুটিত করেন নাই তাহা অপরে ফুটাইয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ। তাঁহাদের বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যোগ দিলে এক সুন্দর সাধন-চক্র নির্মিত হইতে পারে।

ব্রাহ্মধর্ম যে আমাদিগকে এই উদার ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ করিয়াছেন, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের মহত্ত্ব। ধন্য ঈশ্বর যে, আমরা ধর্মের মধ্যে সার ও অসার বিচার করিতে পারিতেছি এবং অসারের মধ্যে সারকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। যাঁহারা মনে করেন যে, কুসংস্কারের প্রতিবাদ করাই ব্রাহ্মধর্মের প্রধান কাজ, তাঁহারা এই মহা ধর্মবিধানের উদ্দেশ্য ও কায এখনও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। মানবের ধর্মজীবনকে এক উদার মহৎ বিশ্বজনীন ও যুক্তিসংগত ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়া গঠন করা ইহার প্রধান কাজ। ইহা মানুষকে গুরু, শাস্ত্র ও সমাজ হইতে দূরে লইয়া যাইবে না, কিন্তু এ-সকলকে আরও উন্নত করিয়া দৃঢ়তর ভিত্তির উপর স্থাপন করিবে। ইহা মানুষকে জ্ঞান বা চিন্তার বিরুদ্ধে কিছু গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে না, কিন্তু বিচার ও জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া এক নবতর ভিত্তির উপরে মানবের আধ্যাত্মিক আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করিবে। ইহা ধর্মের অসার ও আবরণ ভাগ লইয়া মানুষকে বিবাদে প্রবৃত্ত করিয়া শক্তির ক্ষয় করিবে না, কিন্তু সার ভাগের উপরেই দৃষ্টিকে প্রধানত নিবদ্ধ করিয়া তাহাতেই মানুষকে অধিক মনোযোগী করিবে। ঈশ্বর করুন, আমরা ব্রাহ্মধর্মের এই উদার ও মহৎ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হই।

১২ মাঘ ১৮১৯ শক। ১৮৯৮ খ্রী

ধর্মভাবের বিবর্তন

সর্বাগ্রে বিবর্তন কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। বিবর্তন শব্দের অর্থ— স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে আপনার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করিয়া এক বস্তুর বিভিন্ন আকার ধারণ করা। এই নিয়মে জল বাষ্পে, অগ্নি তাপে, বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়। এ-সকল প্রকৃতির নিয়ম, স্বভাবের ধর্ম। স্বাভাবিক নিয়মে একই বস্তু, একই পদার্থ ভিন্ন আকার ধারণ করিল মাত্র। ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ Evolution ; এই Evolution theory বা বিবর্তনবাদ বর্তমান সময়ে বহুলরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষত এখনকার চিন্তাজগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিরা ইহার প্রতি বিশেষ রূপে মনোনিবেশ করাতে মানুষের চিন্তাস্রোত দিন দিন এই পথে ছুটিয়াছে।

বর্তমান সময়ে জগতের চিন্তাশীলগণের চিন্তাতে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের উক্তিসকল নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দিন দিন তাঁহাদের চিন্তাতে "ধর্ম কি ?" এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এক মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে। দুইটি বিষয়ে এই পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে।

প্রথম, বিগত শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্মকে উপেক্ষা-বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্, যাঁহারা দার্শনিক, যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে বিদিত, ধর্মটা তাঁহাদের চিন্তা ও গবেষণার বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারা অপর সকল বিষয়ের চিন্তাতে সময় দিতেন, কিন্তু ধর্মচিন্তাকে মনে স্থান দিতেন না। তাঁহারা জগৎ, জনসমাজ, আইন-আদালত, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা,

বিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কেবল ধর্মকে উপেক্ষা-বুদ্ধিতে রাখিয়াছিলেন।

বর্তমান কালে সভ্য জগতে এই একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে যে, জগতের মহা মহা জ্ঞানী ও প্রধানতম চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও অপর অপর সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্মকেও চিন্তার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এক্ষণে সমাজতত্ত্বের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় ধর্মতত্ত্বকেও আলোচনার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত পনের-ষোল বৎসর এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে এই বড় আশ্চর্য বোধ হয় যে, এত অল্পকালের মধ্যে চিন্তাজগতের নেতাদের মনে এরূপ মহা পরিবর্তন কিরূপে উপস্থিত হইল। এ বিষয়ে সভ্য জগতের চিন্তা তিনটি ক্রম বা সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া বর্তমান মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে।

প্রথম, ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়িগণের এই ভাব ছিল যে, ইহা ধূর্ত ও প্রবঞ্চক পুরোহিতগণের কল্পনা মাত্র। স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষে পুরোহিতগণ অজ্ঞ প্রজাগণকে একটা ধুয়া ধরাইয়া দিয়াছে, এবং তদুপযোগী নানা শাস্ত্র, নানা বিধিনিষেধ রচনা করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা এত স্থূল ও অবিবেচনাসম্ভূত যে চিন্তা করিলে এখন আমাদের ইহা বড়ই আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় যে, এক সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও এই মত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এই ভ্রান্ত মতের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি বক্তব্য আছে। সেটি এই— জগতের পুরোহিতেরা ও আচার্যগণ যে প্রবঞ্চনা করেন নাই, তাহা নহে। তাঁহারা যে অনেক স্থলে জ্ঞাতসারে অসত্য-জাল রচনা করিয়া মানুষকে ভ্রান্তিতে জড়িত করেন নাই,

তাহা বলিতে পারি না। বরং ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে, ধর্মাচার্যগণ ধর্মের নামে অনেক মানুষকে প্রতারণা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয়-ধর্মাবলম্বি-গণের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক নামে যে সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলে পুরোহিতেরা স্বীয় স্বীয় মনঃকল্পিত কাল্পনিক ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া তৎসমুদয় সত্য বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়াছেন। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা এবং কল্পনা-প্রসূত ইতিবৃত্তকে প্রচার করিয়া লোকচক্ষুতে ধূলি দেওয়া, ইহা অপেক্ষা অধর্ম আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাহাও ধর্মাচার্যগণ করিয়াছেন। Pious fraud নামে ইংরাজিতে একটি কথা আছে, তাহার অর্থ ধর্মার্থে প্রবঞ্চনা। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, মানুষ এইরূপে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য Pious fraud-এর রচনা করিয়া ধর্মের নামে জগতে অধর্ম প্রচার করিয়াছে। কেবল রোমান ক্যাথলিক কেন, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও ধর্মাচার্যগণ অনেক সময় ধর্মের নামে অধর্ম প্রচার করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন।

তথাপি কেবল যে স্বার্থসাধনের উদ্দেশেই মানুষ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। দুইটি প্রধান যুক্তি দ্বারা এই মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত করা যায়।

প্রথমত, পুরোহিতের দ্বারা যদি ধর্মকে ব্যাখ্যা কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, পুরোহিত কিরূপে আসিল? পুরোহিতের সৃষ্টি তবে কে করিল? পুরোহিতেরা যে তোমার আমার মনের উপরে একটা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে অন্যায় ও অসত্যকে জগতে খাড়া করিয়া রাখিতে পারিলেন, তাহার কারণ কি? কেন জগতের লোক কান পাতিয়া তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিল এবং তাহা

পালন করিবার জন্য চেষ্টা করিল? তাঁহাদের শক্তির মূল কোথায়? চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, মানবের প্রকৃতিগত নৈসর্গিক ধর্মই তাঁহাদের শক্তি। অতএব পুরোহিতের দ্বারা ধর্মকে ব্যাখ্যা অপেক্ষা ধর্মের দ্বারা পুরোহিতকে ব্যাখ্যা করাই অধিক যুক্তিসংগত মনে হয়।

দ্বিতীয় যুক্তি এই, তাঁহারা প্রবঞ্চনাতে কৃতকার্য হইলেন কেন? আসলের যদি কোনও মূল্য না থাকে, তাহা হইলে কি নকলের কোনও শক্তি হয়? নকলের দ্বারা যে কাজ চলে তাহাতেই প্রমাণ যে, তাহার আসল বস্তুটার মূল্য আছে। ঐ যে বাজারে মেকি টাকাটা চলিয়া যায় তাহাতেই প্রমাণ যে, উহার আসল যেটা, সেটার মূল্য আছে। মিথ্যাতে যে মানুষকে ভুলাইয়া রাখা যায় তাহাতেই প্রমাণ, সত্যটার কত মূল্য। তেমনি আসল ধর্মে মানুষের স্বাভাবিক আস্থা আছে বলিয়াই নকলের দ্বারা ভুলান সম্ভব।

ধর্ম পুরোহিতদিগের প্রবঞ্চনা— এই মতের পর আর-এক মত শুনা গিয়াছে। সেটি এই যে, ধর্ম সুবুদ্ধির রচনা, অর্থাৎ লোকস্থিতি রক্ষার জন্য লোকহিতেচ্ছু শাস্ত্রকারগণের রচিত প্রণালী মাত্র। এই মতের মর্ম এই— ধর্ম জ্ঞানীদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু অজ্ঞ মানবকুলকে সুপথে রাখিবার উপায় মাত্র। এই কারণে সাধুগণ একটা ধর্ম খাড়া করিয়াছেন; এইজন্য স্বর্গ নরক প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই মতের উত্তরে এই বলা যায় যে, এই সকল সাধু ও শাস্ত্রকারগণের শক্তির মূল কোথায়? কেন জগতের লোক তাঁহাদের সেই সমুদয় আদেশ উপদেশ জীবনে পালন করিল? শাস্ত্রকারের সেই সকল আদেশ ও উপদেশের এত শক্তি কেন হইল যে, তজ্জন্য পৃথিবীর লোকে নিজ নিজ সুখ ও স্বার্থ ভুলিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তৎসমুদয় চিরদিন শিরোধার্য করিয়া রাখিল? সাধুমুখের এক-একটি বাণী মানবপ্রাণের অস্থি-

মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া মানুষকে এইরূপে যে আত্মহারা করিয়া ফেলিল, ইহার কারণ, ধর্ম আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। মানব-প্রাণে ধর্মের একটা আদর্শ আছে বলিয়া সাধুদিগের উপদেশ এইরূপ কার্যকরী হইয়াছে। যে ভাব তোমাতে আমাতে বাস করিতেছে, তাঁহারা সেই ভাবের মুখপাত্র মাত্র, এইজন্যই তাঁহাদের প্রভাব। মানব-অন্তরে ধর্মের স্বাভাবিক ভিত্তি আছে বলিয়াই সাধুরা তদুপরি গৃহ নির্মাণ করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম কেবল সুবুদ্ধি-রচনা নয়। ইহা মানব-অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এবং তদুপরি সাধুগণের উপদেশ দণ্ডায়মান। তাঁহারা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্মভাবের সাক্ষী ও পরিপোষক বলিয়াই তাঁহাদের এত আদর ও তাঁহাদের উপদেশের এত শক্তি।

তৎপরে তৃতীয় কথা এই শোনা গিয়াছিল যে, ধর্মটা কেবল মানব-মনের ভয় ও অজ্ঞতা -সম্ভূত একপ্রকার বিকার মাত্র। যেমন উন্মাদ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের ঘরে বসিয়া মনে করে, চারিদিকে শত্রুকুল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তেমনি মানব-মন একপ্রকার বিকারের অবস্থাতেই মনে করে যে, এক বা ততোধিক অতিনৈসর্গিক শক্তি তাহাকে ঘিরিয়া আছে ও তাহাকে শাসন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস মানব-মনে চিরকাল থাকিবে না। যেমন এক সময়ে সকল দেশের লোকেই "ডাইনে" বিশ্বাস করিত, কিন্তু এখন সে বিশ্বাস নাই, তেমনি ভয়-প্রসূত ধর্মবিশ্বাসও একদিন মানব-হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবে।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই ভাবে ধর্মকে দেখিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে জ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ভাব চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অন্তর হইতে উঠিয়া যাইতেছে। কেননা মানুষ ভাবিয়া দেখিতেছে যে, যাহা বিকার, যাহা বাতুলতা, তাহা মানবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ও অনৈসর্গিক। তাহাতে

মানব-চরিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করে, মানবের চিন্তা ও কার্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে। যাহা বাতুলতা, তাহা মানব-প্রকৃতিকে কদর্য করে, বিকৃত করে। কিন্তু ধর্ম ত তাহা করে না, বরং আমরা দেখি, ধর্ম মানব-প্রকৃতির যে কোনও বিভাগকে স্পর্শ করে, তাহাকেই সুন্দর করে, তাহাতেই শৃঙ্খলা আনয়ন করে। ইহা মানব-প্রকৃতিকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত করে ও মানব-জীবনকে সুশৃঙ্খল করে।

অবশ্য ধর্ম যে জগতে কখনও কখনও কদর্যতা উৎপন্ন করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারি না। বরং এই কথাই সত্য যে, ধর্মের নামে আজ পর্যন্ত মানুষ যতপ্রকার অধর্ম করিয়াছে, তেমন অপর কিছুতেই করে নাই। জগতে এমন কোনও পাপ নাই, যাহা মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়া করে নাই। ধর্মের নামে মানুষ মানুষের উপরে এরূপ নৃশংসতাচরণ করিয়াছে, মানুষকে এরূপ কঠোরভাবে নির্যাতন করিয়াছে যে, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর কণ্টকিত হয় এবং আপনা-দিগকে মানব বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সে-সকল ধর্মের বিকৃতি মাত্র। প্রকৃত ধর্মভাব যখনই মানব হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, তখনই তাহাকে সুস্থ, সুখী ও উন্নত করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম কখনই মানব-মনের বিকার নহে। ইহা মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল।

এই ভাব জ্ঞানীদের মনে আসাতে তাঁহারা এখন গভীর ভাবে ধর্মের প্রকৃতি ও উন্নতির পর্যায়ক্রমের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন মনে করিতেছেন যে, ধর্ম প্রণয়, পরিণয়, পরিবার, সমাজ, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির ন্যায় মানব-তরুর স্বাভাবিক ফল এবং অপরাপর সামাজিক বিষয়ের ন্যায় ইহারও প্রকৃতি ও ইতিবৃত্ত পর্যালোচনার বিষয়। তবে এখনও তাঁহাদের অনেকের ভাব এইরূপ দেখি যে, ধর্ম

তাঁহাদের আলোচনার বিষয়, কিন্তু অনুরাগের বিষয় নয়। যেমন মানুষ বিজ্ঞানের আলোচনা করে, পদার্থসকলের বিচার করে, অথচ তাহার সঙ্গে কখনও প্রেমে আবদ্ধ হয় না, তেমনই তাঁহারা যেন দূরে বসিয়া ধর্মের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিতেছেন, কিন্তু ইহার সহিত প্রেমে পড়িতেছেন না, ধর্ম সাধন করিতে চাহিতেছেন না। যাহা হউক, ধর্মের এই প্রকৃতি-পর্যালোচনার ভাব এখন জগতে অতিশয় প্রবল দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃতি ও ইহার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিতে গিয়া বর্তমান সময়ের পণ্ডিতেরা আর-এক মহা প্রশ্নের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন, ঈশ্বর-চিন্তা মানব-অন্তরে কিরূপে প্রবেশ করিল? ইহার যতপ্রকার উত্তর অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, Ghost theory বা প্রেতবাদ। এই মতে বলে, অগ্রে মানুষ ভূতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তৎপরে ধর্মবিশ্বাসে উপনীত হইয়াছে। ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হইল? সর্বপ্রথমে মানুষ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াছে; তৎপরে যখন ঘুম ভাঙিয়াছে, তখন সে চিন্তা করিয়াছে, "আমি যে অমুক অমুক বিষয়ে দেখিলাম, অমুক অমুক স্থানে বেড়াইলাম, অথচ আমি ত যে স্থানের জীব সেই স্থানেই আছি। তবে আমার এরূপ স্মরণ হইতেছে কেন? এ স্মৃতির কারণ কি?" তখন সে বালকের ন্যায় ভাবিয়াছে, নিদ্রিতাবস্থায় আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া ঐ সকল স্থানে বেড়াইতে গিয়াছিল, তৎপরে বেড়াইয়া আসিয়া দেহে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছে। ইহা হইতে মানুষ ভাবিয়াছে, শরীর ও আত্মা ভিন্ন। পরে ভাবিয়াছে, মৃত্যুর পর আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যায়। ইহা হইতেই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস ফুটিয়াছে। এইরূপে মানুষ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিয়াছে।

এই কারণে আদিম কালে দেখা গিয়াছে, মৃত ব্যক্তির সমাধি-পার্শ্বে মানুষ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ দিয়াছে। যুদ্ধে সেনাপতির মৃত্যু হইলে তার সমাধির পার্শ্বে অস্ত্র দিয়াছে, কারণ আবার যখন যুদ্ধ করিবে, তখন অস্ত্র কোথা পাইবে? কোনও কোনও জাতি-মধ্যে দেখা যায়, স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহাদের পত্নীদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের পার্শ্বে সমাহিত করিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছে, স্ত্রী না হইলে ইহারা থাকিবে কিরূপে? এই সকল অজ্ঞ ও অসভ্য লোক বিবেচনা করিয়াছে, জাতির অগ্রণী নেতাদের মৃত্যু হইলেও তাহাদের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অবসর পাইলেই তাহাদের উপরে অত্যাচার করে। এই কারণে মানুষ বন্দনা বা স্তুতি করিতে শিখিয়াছে। যে-সকল জাতীয় নেতাকে মানুষ স্তুতিবন্দনা করিয়াছে, তাহারাই ক্রমে দেবতা বা জগতের বিধাতা বা ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই গেল প্রেতবাদ।

দ্বিতীয়, Demon theory বা পিশাচবাদ। ইহাতে বলে, ধর্ম ভয় হইতে উৎপন্ন। জগতের বাল্যাবস্থায় মানুষ যাহা হইতে দুঃখ পাইয়াছে, তাহাকেই জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছে। ভাবিয়াছে, মানুষকে দুঃখ দিবার জন্য জগতের অন্তরালে কোনও অতিনৈসর্গিক শক্তি আছে। এইরূপে জগতে দ্বীশ্বরবাদ প্রচার হইয়াছে। একটা ভাল ঈশ্বর, আর-একটা মন্দ ঈশ্বর। এখনও খাসিয়াদের মধ্যে এবং অন্যান্য অনেক পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে এরূপ দুই ঈশ্বরের ধারণা রহিয়াছে। যে ঈশ্বর উপদ্রব করে না, যে ঈশ্বর উৎপীড়ন করে না, সে ভাল ঈশ্বর। আর যে ঈশ্বর নির্যাতন করে, ক্লেশ দেয়, সে মন্দ ঈশ্বর। প্রাচীন অগ্ন্যুপাসক পারসিকদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল ছিল, তাহাদের নিকট হইতে য়িহুদীরা ইহা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নিকট হইতে খ্রীষ্টীয়দিগের মধ্যে আসিয়াছে। এখনও অনেক অসভ্যজাতীয়

মানুষেরা বলে, মন্দ ঈশ্বরেরই স্তুতি ও বন্দনার প্রয়োজন, তাহাকেই সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক, কারণ সে অনিষ্টকারী। ভাল ঈশ্বরের পূজার কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি ত অনিষ্টকারী নহেন। ভয় হইতে যদিও পূজার সৃষ্টি, তথাপি কখনও কখনও দেখা গিয়াছে যে, আদিম মানুষ ভাল ঈশ্বরেরও শরণাপন্ন হইয়াছে। সে কেবল ঐ মন্দ ঈশ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য। এই গেল পিশাচবাদ।

তৎপরে আর-এক ভাব আছে, তাহা Beyond theory বা অনন্তবাদ। বর্তমান সময়ে মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই অনন্তবাদের প্রচারক। ইহাতে কি বলে? আমরা দেখিতে পাই যে, মানব-জ্ঞান যতই প্রসারিত হউক না কেন, মানুষ সর্বদাই অনুভব করে যে তাহার পরেও আছে। এই 'তার পর' তার পর' ভাবটা আর ঘোচে না। মানব-মনের এই 'তার পর' 'তার পর' ভাবটা হইতেই ধর্মভাবের উৎপত্তি। এক অনন্ত সত্তা মানবাত্মার সত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, সেই অনন্ত সত্তার ভাব গ্রহণ করিয়াই মানব অভিভূত হইয়াছে, তাহার নাম ধর্মভাব।

চতুর্থ, Dependence theory বা নির্ভরবাদ। বর্তমান শতাব্দীতে ধর্মজগতের অন্যতম নেতা থিওডোর পার্কার এই নির্ভরবাদের প্রধান প্রচারক। এই মতে বলে, মানুষ যখন আত্মচিন্তাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখনই আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া অনুভব করিয়াছে, এবং ইহা প্রতীতি করিয়াছে যে, সে নিরন্তর অপর কোনও শক্তির উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নির্ভরের ভাব হইতেই ধর্মভাবের উৎপত্তি।

পঞ্চম, কারণবাদ। এই মতাপন্ন ব্যক্তিরা বলেন, জগৎকার্যের পরিদর্শন করিতে গিয়াই মানব-মনে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণানুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছে, তাহা হইতেই ধর্মভাবের উৎপত্তি।

সর্বশেষে অধ্যাত্মবাদ। ভারতের প্রাচীন আর্য ঋষিগণ এবং আধুনিক পশ্চিমদেশের অনেক পণ্ডিত এই অধ্যাত্মবাদের প্রচারক। ইঁহারা বলেন, একই জ্ঞান জগতের মূলে রহিয়াছে। পরমাত্মা রূপে তিনিই মানবাত্মার মূলে। তিনিই জড়ে, চেতনে। এই ভাবেই ঋষিগণ বলিয়াছেন—

যশ্চায়স্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ।
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষ সর্বানুভূঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

যে তেজোময় অমৃতময় সর্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই মানবের আত্মাতে নিহিত ; তিনিই আমাদের বিধাতা, তাঁহাকে জানিলে মানুষ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। তদ্‌ভিন্ন অন্য গতি নাই।

এই যে এক পদার্থ তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই মানব-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই আমাদের আরাধ্য পরমেশ্বর, তাঁহাকে দেখাই ধর্ম এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। এই পরমসত্তার ভাব হইতেই ধর্মভাব উৎপন্ন।

বর্তমান সময়ে তিনটি প্রধান বিষয়ে মানবের ধর্ম-চিন্তাতে মহা পরিবর্তন ঘটিতেছে।

প্রথম মহা পরিবর্তন এই যে, আদি কালের ন্যায় মানুষ আর ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না। পূর্বকালে মানুষ এ জগৎকে অনেক ক্ষুদ্র বলিয়া জানিত; বর্তমান সময়ে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের সাহায্যে সৃষ্টিরাজ্য পরিদর্শন করিয়া জগৎকে অসীম-প্রসারিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে জানা গিয়াছে, এই জগৎ এই আকারে বিবর্তিত হইতে বহু বহু লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের অসীম প্রসার দেখা

গিয়াছে। এই দেশ ও কালের অসীমতা মানব-মনে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্মচিন্তাকেও উন্নত ও মহৎ করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহা পরিবর্তন এই আসিয়াছে যে, মানুষ আর ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড রূপে বিভক্ত করিয়া ভাবিতে পারিতেছে না। মানুষ যতই চিন্তা করিতেছে, মানুষের জ্ঞান যতই প্রসারিত হইতেছে, ততই ব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ডত্ব বা একত্বের জ্ঞান তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কালে মানুষ ভাবিয়াছে, প্রকৃতির শক্তিসকল পরস্পর হইতে বিভিন্ন। অগ্নির দেবতা একজন, বায়ুর দেবতা আর-একজন, এইরূপ আকাশ, সূর্য চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে যতই বিজ্ঞানের আলোচনা বাড়িতেছে, যতই মানবের জ্ঞান ফুটিতেছে, ততই মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিসকলকে অভিন্ন বলিয়া দেখিতে পাইতেছে। ইহার এক অংশের সহিত অপর অংশের অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, এককে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিবার উপায় নাই।

একটি পদার্থকে জানিতে গেলেই সমুদয় বিশ্বকে জানিতে হয়। একটি তৃণকণার বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই দেখিবে, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার সহিত বাঁধা রহিয়াছে। অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই শৃঙ্খলে, একই নিয়মে বাঁধা রহিয়াছে; জগৎটা এক ও অখণ্ড। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে ফল ধরা-পৃষ্ঠে পতিত হয়, সেই নিয়মে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। যে শক্তিতে তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত শর এই মেদিনীতে অবতীর্ণ হয়, সেই নিয়মে মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়। যে শক্তি যে নিয়ম ঐ গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে, সেই শক্তি সেই নিয়ম এই মেদিনীতে। সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক জ্ঞান, এক শক্তি ও এক নিয়ম। ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড, দুই নয়। দুই শক্তি এখানে নাই; দুইজনের কার্য এ জগতে নাই।

সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেমন জড়ীয় শক্তিসকলে একই শক্তির প্রকাশ, তেমনি সমুদয় চেতনে একই চৈতন্যের প্রকাশ। যে অনন্ত শক্তি জড় পরমাণুতে শক্তি রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই আবার মানবের আত্মাতে বিধা॰॰ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত তোমার যোগ রহিয়াছে, এ বিশ্ব না থাকিলে তুমি থাকিতে না, এ ব্রহ্মাণ্ড না হইলে তুমি বাঁচিতে পার না। অতএব জগৎ ও তুমি একত্র বাঁধা। এখানে একেরই কার্য, একেরই নিয়ম, একেরই রাজ্য, সমুদায় বস্তু একেকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। জড়ে চেতনে একেরই প্রকাশ। এ-সকল তাঁহারই অভিব্যক্তি।

এ জগৎ এক, জগৎপতিও এ॰ ইহা বর্তমান বিজ্ঞানের এক মহা আবিষ্কার। ব্রহ্মাণ্ডও এক, ব্রহ্মাণ্ডপতিও এক। জগতের শক্তিও এক, শক্তির মূলও এক। এই একত্বের জ্ঞান এখন যেমন উজ্জ্বল রূপে মানব মনে ফুটিয়াছে, পূর্বে এরূপ ছিল না। দুইজনের কার্য এখানে নাই, দুই জ্ঞান, দুই শক্তি, দুই ইচ্ছা এ জগতে নাই। দুই মনে করিও না, সৃষ্টিকর্তা দুইজন হইতে পারে না। এক, এক, এক। ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর একজন, একেরই রাজ্য, একেরই জ্ঞান, একেরই শক্তি এবং একেরই কৌশল। এই যে একত্বের জ্ঞান, ইহা বর্তমান সময়ে মানব-মনে বড়ই প্রবল হইয়াছে।

ইহা হইতে আর-এক মহা পরিবর্তন মানব-অন্তরে আসিয়াছে, তাহা মানবের ভ্রাতৃত্ব-জ্ঞান। বিশ্বের একত্ব যখন প্রমাণিত হইল এবং বিশ্বকারণও যখন এক হইলেন, তখন মানুষ বলিল, "মানব-মণ্ডলীও তবে এক।" জগৎ যেমন এক এবং ইহার প্রভুও যেমন এক, মানুষও তেমনি এক। জগতের একত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানবের একত্ব-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল; সব মানুষই পরস্পর-সম্বদ্ধ। এখন মানুষ

দেখিয়াছে, সব মানুষকে এক না বলিলে আর উপায় নাই। জগতের সকল জাতি যে কোনও দেশে যে কোনও কালে জন্মিয়াছেন, সকলেই এক, সকলেই আমার ভাই ; আমার সুখদুঃখের সহিত সকলেরই যোগ।

এই মহা সত্য মানব প্রাণে কিরূপে প্রস্ফুটিত হইল? মানুষ জগতের ইতিবৃত্ত সমালোচনা করিয়া দেখিয়াছে উন্নতির ক্রম সকল দেশেই এক। পৃথিবীর সুসভ্য জাতিরা এক সময় অসভ্যাবস্থায় ছিলেন, আমরাও তখন অসভ্য ছিলাম। আবার এখনও যাহারা অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে তাহাদেরও মধ্যে দেখা যায়, উন্নতির ক্রম উন্নতির নিয়ম এক। যে নিয়মে সুসভ্য জাতিসকল উন্নত হইয়াছেন, তাহারাও সেই নিয়মে উন্নত হইয়া আসিতেছে। কেবল যে উন্নতির ক্রমই এক, তাহা নহে। অ'বার স্নেহ, দয়া, দাম্পত্যপ্রেম, বাৎসল্য, ন্যায়-অন্যায়-বোধ প্রভৃতি মানবীয় প্রকৃতি সর্বত্রই এক।

কেবল তাহাই নহে, মানবের সামাজিক ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে, কোনও জাতি অপর সকল জাতি -নিরপেক্ষ হইয়া এ জগতে সুখী হইতে পারে না। তাহারা পরস্পরের সহিত সুখদুঃখে সম্বদ্ধ। সুতরাং মানব-সমাজও একত্ব-সূত্রে গ্রথিত। বাণিজ্য-সূত্রে, স্বার্থের বন্ধনে, নানা বন্ধনে জগতের জাতিসকল দিন দিন এমনই আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে, আর সকলকে বাদ দিয়া নিজেদের কল্যাণ চিন্তা কাহারও পক্ষে সম্ভব থাকিতেছে না। যুদ্ধবিগ্রহও দিন দিন দুষ্কর হইয়া পড়িতেছে। এক দেশে যুদ্ধবিগ্রহ হইলে অপর সকল জাতি সেই সঙ্গে ক্লেশ পায়। আজ যদি ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধে, কাল দেখিবে আমাদের দেশে নানাবিধ অসুবিধা উপস্থিত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনুষ্য জাতি দিন দিন আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্তমান সময়ে মানব-সমাজের একত্ব -জ্ঞান দ্বারা ধর্মের আদর্শ যেমন এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহার সাধনের ভাবও তেমনি পরিবর্তিত হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্মসাধন সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই, ইহা দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া তৃতীয় অবস্থাতে আসিয়াছে।

সর্বপ্রথমে সাধনের ভাব ছিল. বলিদান ও নিষ্কৃতি লাভ। অগ্রেই বলিয়াছি, ভয় হইতেই স্তুতিবন্দনার উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই ভয় -নিবন্ধন বলিদানের প্রথা আসিয়াছে। অর্থাৎ কিছু দেওয়া চাই। চিন্তা করিলে বোধ হয়, কুপিত রাজাদের ব্যবহার দেখিয়া মানুষের মনে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। এক দেশের রাজা যখন অপর দেশকে আক্রমণ করিতেন, তখন মানুষ দেখিত যে কর না দিলে তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িতেন না। কিছু দিতেই হইবে। যেমন আমাদের দেশের বর্গীরা যখন দেশে আসিত, তখন কিছু না দিলে কোনও মতেই ছাড়িত না। রাজা ধরিয়াছেন, কিছু দিতেই হইবে। এই সকল কুপিত রাজা যেমন ধরিলে কিছু না লইয়া ছাড়েন না, তেমনই মানুষ ভাবিয়াছে. দেবতারাও ধরিলে কিছু না দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। তাই মানুষ দেবতাকে বলিয়াছে, "কিছু নেও, হে ঈশ্বর! কিছু লইয়া আমাকে নিষ্কৃতি দেও। আমি যাহা পারি তাহাই দিতেছি, তুমি তাই লইয়া সন্তুষ্ট হও। আমি মহিষ দিতে পারি না, ছাগলটা লইয়া সন্তুষ্ট হও।" নিষ্কৃতি লাভের জন্য কিছু বলিদান, এই ভাব ভয়ের উপরে স্থাপিত।

তৎপরে সাধনের দ্বিতীয় স্তর, সন্তোষ-সাধন ও তপস্যা। এ ভাবটা কিন্তু পূর্বোক্ত স্তরের ভিতরে নিহিত ছিল, কারণ বিবর্তনের স্বভাবই এই, পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। সন্তোষ-

সাধন- দেবতা কুপিত নহেন, তবে তাঁহাকে খুসি রাখা ভাল। সকল দেশেই দেখা যায়, এই সন্তোষ-সাধনের ভাব হইতে তপস্যা ফুটিয়াছে এবং এই তপস্যা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশে দেখি, মানুষ ভাবিয়াছে, এই শরীরটাকে ক্লেশ দেওয়াই বুঝি ধর্মসাধন। এইজন্য দেখা যায়, কেহ বা প্রখর রৌদ্রের সময় চতুর্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া পঞ্চতপা হইতেছেন, কেহ বা গজালের শয্যাতে শয়ন করিয়া সাধন করিতেছেন, কেহ বা বিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া রহিয়াছেন। কেহ বা মনকে কঠোর ভাবে নিগ্রহ করিতেছেন, মনকে প্রিয় বস্তু হইতে দূরে রাখিয়া মনে করিতেছেন, ধর্মসাধন হইতেছে। এই সকলই মানুষ দেবতার সন্তোষ-বিধানের জন্য করিয়াছে।

ইহা অপেক্ষা উন্নত স্তর হইল, প্রেম ও সেবা। অর্থাৎ ঈশ্বর যে কুপিত তাহা নহে, তাঁহাকে কিছু দিলেই যে তিনি প্রসন্ন থাকেন, তাহাও নয়। তুমি তাঁহার জন্য কিছু কর আর নাই কর, তাঁহাকে কিছু দাও আর নাই দাও, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি লাভ নাই। তবে প্রেমে তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়ার নামই ধর্ম। ভগবানের প্রতি প্রেমে যদি তোমার হৃদয়মন পূর্ণ থাকে, তাহারই নাম ধর্ম। প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রেমে ক্ষতি লাভের অপেক্ষা রাখে না। প্রেম মানুষকে গঠন করে, প্রেম মানব-চরিত্রকে সুন্দর করে, প্রেম মানব-হৃদয়কে শীতল করে, প্রেম আত্মবিস্মৃতি আনিয়া দেয়।

প্রেমের এই উন্নত ভাব মানুষের মনে আসাতে তৎ সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইটি ভাব মানবের ধর্ম-চিন্তাতে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম, ধর্মের সর্বাঙ্গীণতা; দ্বিতীয়, ধর্মের সামাজিকতা ও নরসেবা।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে দেখা যায়, পূর্বে ধর্ম মানব-

জীবনের একাংশ মাত্র অধিকার করিয়াছিল। মানুষ মনে করিত, ধর্ম মানব-জীবনের অপরাপর দশটি কাজের মধ্যে একটি কাজ; যেমন মানুষ আহার করে, নিদ্রা যায়, ভ্রমণ করে, অন্যান্য কর্ম করে তেমনই ধর্ম যেন একটা কাজ। ধর্মের এই আংশিক ভাব পূর্বে মানব মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব, ধর্মের আধ্যাত্মিক ভাব মানবের মনেতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহা এই যে, ধর্মজীবনের সর্বব্যাপী প্রভাব, ধর্মই জীবন। তোমার খাওয়া, পরা, ভ্রমণ করা, নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি সকল কার্যই ধর্মের অধীন। ধর্ম সমুদয় জীবনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জ্ঞানে গভীরতা, কর্তব্য-সাধনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম ও পবিত্রতা, মানব-প্রেমে বিশালতা, নর-সেবায় নিপুণতা, ঈশ্বর-প্রীতিতে হৃদয়মনের পূর্ণতা বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই ধর্ম। ধর্মের এই উদার ও মহৎ ভাব মানবের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্বে আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে ধর্মসাধন কেবলমাত্র ক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তোমার মন থাক্ আর নাই থাক্, তুমি যদি ধর্মের ঐ বাহিরের নিয়মগুলি পালন কর, তবেই তুমি ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইবে। ইহাতে ধর্মকে যেন জীবন হইতে, চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হইয়াছে। তুমি দরিদ্র পীড়ন কর, তুমি লোকের সহিত মিথ্যা ব্যবহার কর, যাহা ইচ্ছা যাহাই কর, কিন্তু ব্রহ্মমুহূর্তে উঠিয়া অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান কর, মালা জপ সন্ধ্যাহ্নিক কর, তবেই তুমি মহা ধার্মিক বলিয়া পরিচিত হইবে।

পূর্বে যে কেবল ধর্ম বাহিরের ক্রিয়াতে আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে, এ দেশে ইহাকে আবার মানব-সমাজ হইতে বিমুখ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। যেন ধার্মিক হইতে হইলে জনসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া

অপর স্থানে চলিয়া যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যে পরিমাণে তুমি সমাজকে পরিহার করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তুমি ধার্মিক। এই কারণে দেখা যায়, আমাদের দেশের লোকের এই একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ধার্মিক হইতে হইলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিতে হইবে। এবং এই কারণেই অনেকে ব্রাহ্মদের প্রতি অভিযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "তুমি তবে কি রকম ধামিক! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী, তোমার আবার স্ত্রীই বা কে, পুত্রই বা কে, পরিবারই বা কে? তোমার আবার সংসারই বা কি? তুমি স্ত্রীপুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিতে পার না, কামিনীকাঞ্চনের সম্পর্ক গেল না, তুমি আবার ধর্মসাধন করিবে কিরূপে?" সমাজের সহিত ও স্ত্রীপুত্রের সহিত যোগ রাখিয়াই যে মানুষ ধার্মিক হইতে পারে, ইহা তাঁহারা ভাবিতেই পারেন না। আমাদের দেশে ধর্মের এই সমাজ-বিমুখতার ভাব যেরূপ প্রবল, এরূপ আর কোনও দেশে পাই নাই।

কিন্তু বর্তমান সময়ে এই এক মহা ভাব মানব-মনের সমক্ষে আসিতেছে যে, মানবের সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সম্পদ বিপদ, পাপ প্রলোভন সকলের সহিত ধর্মের যোগ। এই সত্য এখন মানব-চিন্তাকে এতই প্রবল রূপে অধিকার করিয়াছে যে, এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবিতেই পারিতেছেন না যে, নরসেবা ছাড়িয়া আবার ধর্ম কিরূপে দাঁড়াইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই মহা সত্য এমনই উজ্জ্বল রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল, "মানবের সেবাই ভগবানের সেবা।" সেই মহাপুরুষের জীবনের যে কিছু কার্য আমরা দেখিতে পাই, সমাজ-সংস্কারই বল আর যাই কেন বল-না, সকলই ঐ এক মূল ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। এই মূলমন্ত্র বর্তমান সময়ে জগতের সর্বত্র প্রবল।

ব্রাহ্মধর্ম কি? যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সংক্ষেপে বলি যে, ঈশ্বর প্রীতি ও নর সেবা। ব্রাহ্মসমাজ বলিলে আমি সেই সমাজ বুঝি, যে সমাজের লোকের হৃদয় ভগবানের প্রতি ভক্তিতে পূর্ণ ও মানবের সেবার জন্য লালায়িত। এই ব্রাহ্মধর্মকে বর্তমান সুসভ্য ও জ্ঞানোন্নত সময়ের উপযোগী করিতে হইলে ঈশ্বর-করুণাকে জীবনে অবলম্বন করিয়া মানবের কল্যাণের জন্য হৃদয়মন নিয়োগ করিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির জ্ঞানীরা চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা দেখিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কোনও দেশে বা কোনও কালে আবদ্ধ নহে। এমন দেশ বা এমন কাল নাই, যেখানে বা যে সময়ে ভগবান্ সাধু-হৃদয়ে আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন নাই। তিনি যেমন ভারতীয় আর্য ঋষিগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন, তেমনি আবার পাশ্চাত্য জগতের সাধুগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। যে কোনও দেশে, যে কোনও কালে মানুষ অকপট চিত্তে ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে জানিতে চাহিয়াছে, তিনি সেখানেই এবং সেই কালেই নিজ স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই যে তাঁহার অভিব্যক্তির সার্বভৌমিকতার জ্ঞান, ইহাই এখনকার জ্ঞানিগণের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। জ্ঞানীরা দেখিয়াছেন, সমুদয় মানব-সমাজ এক, ব্রহ্মাণ্ডও এক এবং ব্রহ্মাণ্ড-পতিও এক এবং অখণ্ড। মানবের উপাস্য দেবতা এক ও সমুদয় মানব-পরিবার এক সূত্রে আবদ্ধ। এই মহা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহার সহিত প্রেমে ও ইচ্ছায় একীভূত হইয়া যাওয়ার নামই ধর্ম। ধর্ম-সাধন কেবল বাহিরের কতকগুলি প্রাণবিহীন ক্রিয়াতে আবদ্ধ নহে। যাগ, যজ্ঞ ও বলিদান প্রভৃতি বাহিরের কতকগুলি কার্য করিলেই ধর্ম-

সাধন হয় না। একমাত্র কঠোর তপস্যা বা আত্মনিগ্রহের নাম ধর্মসাধন নয়। ধর্ম প্রাণের বস্তু, ধর্ম-সাধন প্রেমে ও আত্ম-সমর্পণে। ঈশ্বরকে প্রাণমন দেওয়ার নামই ধর্ম। সেই চরণে আপনাকে সমর্পণ করা এবং সেই ইচ্ছার অধীন হইয়া জীবনের প্রতি অগ্রসর হওয়ার নামই ধর্ম-সাধন। ইহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম। এস, তবে সকলে মিলিয়া দেহ-মনের সমুদয় শক্তি দিয়া এই ধর্ম সাধন করি।

১২ মাঘ ১৮২০ শক। ১৮৯৯ খ্রী

মহাপুরুষদিগের বাণী

ধর্মভাবের কিরূপ বিবর্তন জগতে হইয়া আসিতেছে, মানব-ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। মনোযোগ সহকারে মানব-ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাম্পত্য প্রণয়, বিবাহ, বাণিজ্য প্রভৃতির ন্যায় মানবের ধর্মভাবও বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রণালী কি? এই বিষয়ের চিন্তাতে ও আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, ধর্মভাব মনের কতকগুলি স্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া বর্তমান আকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইগুলিকে ধর্মভাবের বিকাশের ক্রম বলা যাইতে পারে। সর্বাগ্রে এই ক্রম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

সকলেই জানেন যে, জগতের বাল্যাবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক পদার্থ-সকলকে জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত। যেমন শিশু খাট হইতে পড়িয়া গিয়া মনে করে, খাট তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে, তেমনই জগতের আদিম কালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিসকলের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া মনে করিত, প্রকৃতির পদার্থসকল জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তি -সম্পন্ন। ইচ্ছা করিয়াই তাহারা মানবকে ক্লেশ দেয়। ইতিবৃত্তে দেখা যায় এই ভাব বহুকাল পর্যন্ত জগতে চলিয়া আসিয়াছিল।

তৎপরে মানুষ ভাবিল, প্রকৃতির পদার্থসকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছা -সম্পন্ন নহে। তখন ভাবিতে লাগিল, "তবে এ-সকল কি? এই যে বিভিন্ন কালে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, এই যে জগতের চারিদিকে বিবিধ শক্তির ক্রীড়া দেখিতেছি, এ-সকল তবে কি? প্রত্যেক পদার্থ কি স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি -সম্পন্ন? না প্রত্যেকের কোনও পৃথক্ দেবতা আছেন? জল, অগ্নি, বায়ু এই সকল নানাপ্রকার পদার্থ

দেখিতেছি, এ-সকল কি নিজ নিজ শক্তিতে কাজ করে? না প্রত্যেকের এক-একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন? অগ্নি কি নিজের তেজে এবং নিজের শক্তিতে পদার্থসকলকে দগ্ধ করে? না উহার অন্তরালে অপর কোনও শক্তির ক্রিয়া আছে? জলের ধর্ম শীতলতা, বায়ুর ধর্ম প্রবাহিত হওয়া, কিন্তু জল কি স্ব ইচ্ছায় এবং স্বীয় শক্তির বলে শীতলতা উৎপাদন করে? বায়ু কি নিজ শক্তিতে প্রবাহিত হয়? না ঐ-সকলের পশ্চাতে প্রত্যেকের কোনও ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, যিনি পশ্চাতে থাকিয়া উহাদের কার্যকারিণী শক্তি বিধান করেন?” যখন আদিম পুরুষগণ এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের বিশ্বাস হইল যে, এই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভিন্ন ভিন্ন। এইরূপে ইন্দ্র, বরুণ, পবন প্রভৃতি বহু বহু দেবতার সৃষ্টি হইল এবং এই ভাব হইতেই বেদমন্ত্রসকল রচিত হইয়াছিল।

কেবল যে মানুষ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহা নহে, ঐ-সকল দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিতেও মানুষ বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিল। তখন তাহারা মনে করিত যে, আমাদের ন্যায় ঐ-সকল দেবদেবীও রুষ্টি ও তুষ্টির নিয়মাধীন। মানুষ যেমন আপনাদের প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছে যে, ইহারা প্রিয় কার্য করিলে তুষ্ট হয়, আবার অপ্রিয় কার্য করিলে রুষ্ট হয়, তেমনি মনে করিয়াছে যে, প্রকৃতির ঐ-সকল দেবতাও আমাদের ন্যায় রোষ এবং তোষের নিয়মাধীন। আমরা যেমন রোষের চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি অপ্রিয় কার্য করি, এবং তোষের চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি প্রিয় কার্য করি, তেমনি বুঝি প্রকৃতির শক্তিসকলও রুষ্ট হইলে আমাদের অনিষ্ট সাধন করে, আর তুষ্ট হইলে আমাদের ইষ্ট সাধন করে। মেঘ যখন বারিবর্ষণ করে, যখন সুশীতল বৃষ্টিধারা দ্বারা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং

শস্যোৎপাদনে সহায়তা করে, তখন ইন্দ্র তুষ্ট। আর যখন মেঘ বারি বর্ষণ করে না বা দারুণ বজ্রাঘাতে মানুষকে কম্পিত করে, তখন ইন্দ্র রুষ্ট। বায়ু যখন মৃদুল হিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া আমাদের শরীর মন জুড়াইয়া দেয়, তখন বায়ু তুষ্ট। আর যখন ভীমমূর্তি ধারণ করিয়া প্রচণ্ড ঝটিকার দ্বারা আমাদের গৃহাদি ভূমিসাৎ করে, তখন তিনি রুষ্ট।

কিন্তু প্রকৃতি কেন যে রুষ্ট হন, আর কেন যে তুষ্ট হন, তাহার কোনও কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রকৃতি অকারণ তুষ্ট হন এবং অকারণ রুষ্ট হন। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই যথেচ্ছাচারিতার উল্লেখ সকল দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত-সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন যে প্রকৃতির দেবতাসকলে মানুষ এই প্রকারে রুষ্টি তুষ্টির ভাব আরোপ করিয়াছে তাহা নিশ্চিত রূপে বলা সুকঠিন। তবে এই মাত্র অনুমান করা যায় যে, সকল দেশেই আদিম কালের সাধারণ অজ্ঞ মানুষ নিজ নিজ জাতি-মধ্যে যথেচ্ছাচারী রাজা, নেতা বা দলপতিদিগের অকারণ রুষ্টি তুষ্টি দেখিয়াই তাহা প্রকৃতির দেবতাসকলে আরোপ করিয়াছে। দেখিয়াছে রাজারা অব্যবস্থিত-চিত্ত, তোষামোদ-প্রিয়, সুতরাং নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতাকেও সেই প্রকার ভাবিয়াছে।

সর্বশেষে একদেববাদ। এই একদেববাদে উপনীত হইতে মানব-জাতির বহু বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল। কত শতাব্দী যে লাগিয়াছিল, তাহা সম্যক্ রূপে নির্দেশ করা যায় না। সমুদয় সৃষ্টি যে এক মহা নিয়মশৃঙ্খলের দ্বারা শৃঙ্খলিত, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, ভৌতিক রাজ্য ও অধ্যাত্মরাজ্য এ সকলের মধ্যে যে একই নিয়মশৃঙ্খলা একই শাসন-শক্তি কার্য করিতেছে, এই মহাসত্যে উপনীত হইতে মানব-জাতির বহু যুগ লাগিয়াছিল। বহুদেববাদ জগতে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত

ছিল। ভৌতিক রাজ্যে ও অধ্যাত্মরাজ্যে যে একই শক্তির প্রকাশ, এ সত্য মানব-মনে আজিও দৃঢ় রূপে মুদ্রিত হয় নাই।

এই বহুদেববাদের অবস্থাতে যখন মানুষ বাস করিতেছিল, তখন কোনও কোনও জাতি-মধ্যে সময়ে সময়ে কতিপয় চিন্তাশীল মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা একেশ্বরবাদের তত্ত্ব হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে আশ্চর্য ঐক্য দেখিলেন। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে তাঁহারা এমন এক আশ্চর্য একতা উপলব্ধি করিলেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রাণমন পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা বলিলেন, "এ সকল ত ভিন্ন নয়। ঐ যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের অচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে। অগ্নির সহিত বায়ুর যোগ, বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে অগ্নির ক্রিয়া হয় না, বায়ু না হইলে অগ্নি জ্বলিতে পারে না। আকাশের সহিত সূর্যের যোগ, আকাশ পথ না দিলে সূর্যের আলোক জগতে আসিতে পারে না। সুতরাং ঐ সমুদয় পরস্পর পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। একে অন্যের সহিত বাঁধা হইয়া রহিয়াছে। সূর্যের সঙ্গে আকাশ বাঁধা, বায়ুর সঙ্গে অগ্নি বাঁধা, পৃথিবীর সঙ্গে চন্দ্র বাঁধা, চন্দ্রের সঙ্গে সৌরজগৎ বাঁধা— ঐ-সকল পরস্পরে বাঁধা রহিয়াছে।" তাঁহারা ভাবিলেন, এ-সকল কি কখনও পরস্পরবিরোধী হইতে পারে? পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে কি এমন শৃঙ্খলা থাকিতে পারে? না, তাহা পারে না। কেহ কাহারও হইতে পৃথক্ হইয়া বাস করিতে পারে না, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মশৃঙ্খলে বাঁধা, একই শক্তির অধীন। এই একতার ভাব সাধুরা যখন প্রাণে পাইলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

অর্থ— যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার প্রণাম।

এই ভাব এখন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোনও কোনও ঋষি আবার অগ্নি বায়ু এ-সকলকে পৃথক্ করিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা দুইটি দুইটি করিয়া লইয়া পূজা করিয়াছেন। কোনও ঋষি বলিলেন, "অগ্নি-বায়ু" অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু ইহারা দুইজনে এক, ইহারা পরস্পরের বন্ধু। কেহ বলিলেন, "মিত্রবরুণৌ" অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ দু'জনে এক। মিত্র অর্থাৎ সূর্য আর বরুণ অর্থাৎ আকাশ পরস্পরের সাহায্য করেন, ইঁহারা দুইজনে একত্রে আছেন। এই ভাব হৃদয়ে লাভ করিতে অনেক সাধনা, অনেক ধ্যানধারণা ও অনেক চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হইয়াছিল।

যাঁহারা একত্বের ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রাণে স্বভাবতই এই জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তি একেরই প্রকাশ মাত্র। একত্বের জ্ঞান যখন বিকাশপ্রাপ্ত হইল তখন মানব-মনে এই মহা সমস্যার উদয় হইল, তবে কি কোথাও স্বাধীনতা নাই? তবে কি আত্মাতে পৃথক্ কোনও শক্তির কার্য নাই? তবে কি আমার আত্মাতেও এই শক্তির কার্য? আমার প্রকৃতিও কি এই নিয়মের অধীন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ এই সত্য দেখিল যে, যেমন সমুদয় সৃষ্টি এক দুর্ভেদ্য দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে আবদ্ধ, মানব-জীবনও তেমনই এই দুর্ভেদ্য অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের দ্বারা সংযত। তখন হইতে মানুষ দেখিল যে, প্রাকৃতিক রাজ্যে যে শক্তির প্রকাশ, অধ্যাত্মজগতেও সেই শক্তির ক্রীড়া। মানব-জীবন সেই শক্তির ক্রোড়ে শায়িত, সেই শক্তির মহাসিন্ধুতে নিমগ্ন। একই শক্তি-পারাবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোনও কোনও

চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিলেন, মানবাত্মার কোনওই স্বাধীনতা নাই, বাহিরে যেমন কার্যকারণ-শৃঙ্খলা, মানব-অন্তরেও তেমনই কার্যকারণ-শৃঙ্খলা। বহির্জগৎ যেমন নিয়মের অধীন, অন্তর্জগৎও তেমনই কর্মের নিয়মের অধীন। ইহার নাম কর্মবাদ। কর্মবাদ প্রকৃতি-রাজ্য পরিদর্শন হইতে উৎপন্ন। ইহা জড়রাজ্য হইতে অধ্যাত্মরাজ্যে সংক্রান্ত সংস্কার মাত্র।

সকল দেশের সকল কালের সাধুরাই বলিলেন, "মানুষ ধর্মশাসনের অধীন, এক মহা ধর্মনিয়ম মানব-জীবনকে প্রতি মুহূর্তে শাসন করিতেছে।" সাধুরা এই সত্য জগতে প্রচার করিবার জন্যই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন; তাঁহারা এই ধর্মশাসনের সাক্ষ্য দিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন। ইহা যে কেবল জগতের মহাপুরুষেরাই বলিয়াছিলেন তাহাও নয়, এখন প্রায় সমুদয় মানব জাতিই এই কথা একবাক্যে স্বীকার করিতেছে যে, যেমন ঐ অনন্তপ্রসারিত বিশ্বব্যাপী আকাশের নিম্নে মানুষ এবং অপরাপর জন্তু সুখে বাস করে, যেমন ঐ মহাসিন্ধুর দিগন্তপ্রসারিত বারিরাশির মধ্যে মৎস্যসকল সুখে বিচরণ করে, যেমন পক্ষিগণ ঐ নিয়তপ্রবাহিত বায়ুসাগরে সুখে বিহার করে, তেমনই মানব-জীবন এবং মানব সমাজ এক ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত সত্তার মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছে। তাঁহার আদি নাই, অন্তও নাই। ধর্মশাসন এই সত্তারই অধ্যাত্ম প্রকাশ। যখন মানব প্রাণে এই সত্য অনুভব করে, তখন ভক্তিতে অবনত হইয়া ইহার চরণে আপনাদিগকে সমর্পণ করে এবং ইহার মহা আবির্ভাবে হৃদয় মন পূর্ণ দেখে। যখন এই ধর্মশাসন মানব-দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই মানব-সমাজ দুর্নীতিতে নিমগ্ন হইতে থাকে। আর যখন মনুষ্য-সমাজ পাপের পথে চলিতে থাকে, তখনই জগতের লোককে এই ধর্মনিয়মের বার্তা শুনাইবার জন্য মহাপুরুষেরা অভ্যুত্থিত হন।

মহাপুরুষেরা অভ্যুত্থান করেন কি করিয়া? না, জীবে দয়া হইতে। মূলে প্রেরক জীবে দয়া। জীবে দয়া বলিবার উদ্দেশ্য কি? না, মানব-সমাজে বিবিধ পাপাচরণ ও দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহারা ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করেন, তাহা হইতেই তাঁহাদের অভ্যুত্থান।

মহাজনগণ মানবের হৃদয়নিহিত ধর্মশাসনের সাক্ষী বটে, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তি এই ধর্মশাসনকে বিভিন্ন ভাবে ধারণ করিয়াছেন। কেহ ভাবিলেন যে, মানুষকে এই শক্তির অধীন করিবার উপায় জ্ঞান; কেহ ভাবিলেন, তাহা প্রেম; কেহ বলিলেন, তাহা ইচ্ছা-শক্তি। এইমাত্র প্রভেদ। মহাত্মা বুদ্ধ ইহাকে জ্ঞান বলিলেন। যীশু বলিলেন, ইহা প্রেম। প্রেম হইতে এই জগতের উৎপত্তি, প্রেম হইতেই এই মানব-জীবনের উৎপত্তি, প্রেমই মানব-জীবনকে শাসন করিতেছে। এই প্রেমের দিক্ দিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বলিলেন, "ঐ যে অনন্ত শক্তি, ঐ যে অলঙ্ঘ্য ধর্মশাসন, উহা আমার পিতা।" ইহাকে কেবল যে যীশু পিতা বলিয়াছিলেন তাহাও নয়। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা যীশুর বহু পূর্বে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "পিতা নোঽসি", তুমি আমাদের পিতা। শুধু তাহা নয়, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ও গভীর কথা ঋষিরা বলিয়াছেন, "পিতৃতমঃ পিতৄণাম্", তুমি পিতাদিগের মধ্যে পিতৃতম। মহম্মদ বলিলেন, ইহা ইচ্ছাশক্তি। এক দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি দোর্দণ্ডপ্রতাপে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছে। তুমি চাও আর না চাও, তোমার ইচ্ছাকে চূর্ণ করিয়া সেই ইচ্ছা তোমার জীবনে নিয়ত কার্য করিতেছে। সেই ইচ্ছাই জড়, চেতন, উদ্ভিদ্ সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, সেই ইচ্ছাই মানব-জীবনকে শাসন করিতেছে।

কেন যে সাধুরা ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিলেন, কেন যে একজন

ইহাকে বলিলেন "প্রেম", আর-একজন বলিলেন "জ্ঞান", আর-একজন বলিলেন "ইচ্ছাশক্তি," তাহা ভাঙিয়া বলা কঠিন। তবে চিন্তা করিলে একটা কারণ স্বভাবতই মনে উদয় হয়। তাহা এই— ভারতবর্ষে ইহাকে জ্ঞান রূপে দেখা স্বাভাবিক। কারণ আমাদের দেশে যেমন আত্মচিন্তা ধ্যানধারণা বিকাশ পাইয়াছে, এমন আর জগতে কোথাও ফুটে নাই। কেন যে এ দেশের লোক এমন আত্মচিন্তাশীল, এমন ধ্যানপরায়ণ হইলেন, তাহার সকল কারণ নির্দেশ করা সহজ নহে। তবে এই একটা কারণ মনে হয়, যে দেশে মানুষকে স্বভাবতই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাস করিতে হয়, যে দেশে নিরন্তর ঋতুর পরিবর্তন হয়, যে দেশে শীত-গ্রীষ্মের তারতম্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি না রাখিলে মানুষকে ক্লেশ পাইতে হয়, সে দেশে মানব-চিত্ত স্বভাবতই ভিতর হইতে বাহিরে যায়। আর যেখানে প্রকৃতি এরূপ চঞ্চল নয়, শীত-গ্রীষ্মের তারতম্য যেখানে প্রবল রূপে অনুভূত হয় না, যে দেশে শীতাতপের সাম্যাবস্থা এবং যেখানে মানুষকে নিরন্তর প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় না, সেখানে মন বাহির হইতে ভিতরে আসে।

যে কারণেই হউক, আমাদের দেশের লোক স্বভাবতই ধ্যানশীল ও আত্মচিন্তাপরায়ণ, সুতরাং এ দেশে নিত্যানিত্যজ্ঞান সহজেই বিকশিত হইয়াছে। আত্মদৃষ্টির সাহায্যে আমরা দেখি, আমাদের আত্মা এ জগতে নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছে— কখনও হর্ষ, কখনও বিষাদ, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ এইরূপ বিবিধ অবস্থার মধ্যে থাকিতেছে, কিন্তু একটা জিনিস সর্বদাই অপরিবর্তিত রহিয়াছে, তাহা "আমি"। এই "আমি" নামে বস্তু সকল পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তিত। ঋষিরা এই ব্যক্তিত্ব-জ্ঞানকে বলিয়াছেন, "সূত্রে মণিগণাইব" অর্থাৎ মণির অভ্যন্তরে সূত্রের ন্যায়। যেমন দেখা যায়, একগাছি সূত্র ভিন্ন ভিন্ন

কতকগুলি মণিকে বাঁধিয়া মালা করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই যেন বিচিত্র ঘটনাবলী এ জীবনে আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, আর এই "আমি"-রূপ বস্তু একগাছি সূত্রের ন্যায় হইয়া এ-সকলকে ধারণ করিয়া ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিতেছে।

জগতের মহাজনেরা এই ধর্মশাসনের চক্ষে মানব-প্রকৃতিকে পর্যালোচনা করিতে গিয়া দেখিলেন, মানবের প্রকৃতিতে আবার এমন কিছু আছে, যাহা ধর্মশাসনের বিরোধী। ভারতীয় ঋষিদিগের ন্যায় যাঁহারা জ্ঞানের দিক্ দিয়া ধর্মনিয়মকে দেখিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, সকলের মূলে জ্ঞান, নিত্যানিত্য-বিবেকের দ্বারাই মুক্তি। সুতরাং তাঁহাদের মতে অবিদ্যাই পাপ, অবিদ্যা বা অজ্ঞতা ধর্মের প্রধান শত্রু। এই অবিদ্যা হইতেই মানবের সর্বপ্রকার দুঃখদুর্গতি উৎপন্ন হয়; সুতরাং অবিদ্যা এবং তৎপ্রসূত বাসনাই পাপ, আর জ্ঞান বা বিদ্যা মুক্তির উপায়। জ্ঞান মানুষকে নিত্যানিত্য-বিবেকে সমর্থ করে, সুতরাং জ্ঞানই মানবের শ্রেষ্ঠাবস্থা। আবার যীশুর ন্যায় যাঁহারা ভক্তি-পথাবলম্বী, তাঁহাদের মতে বিষয়াসক্তি, যাহাতে ঈশ্বর হইতে মানুষকে দূরে লইয়া যায়, তাহাই পাপ। আর যাহাতে তাঁহার সহিত আমাদিগকে যুক্ত করে, যাহাতে ঈশ্বরের চরণে মানুষকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দেয়, তাহাই পুণ্য। আবার মহম্মদের মতে ঈশ্বরের অবাধ্যতাই পাপ। কিন্তু এ-সকল একই কথা। ভিন্ন ভিন্ন সাধু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন যে, এক ধর্মশাসন নিরন্তর জগতে জয়যুক্ত হইতে চাহিতেছে, তাহার অধীন হইতে পারিলেই মানবের কল্যাণ, তাহাতেই মানবের সদ্‌গতি।

সকল মহাজনই দেখি দুইটি কথাতে মিলিতেছেন। প্রথম কথা এই যে, মানব-জীবনের পশ্চাতে এক মহান্ ধর্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত।

সর্বপ্রকার অসত্য, সর্বপ্রকার অনিত্যের মধ্যে একটা স্থায়ী জিনিস, একটা নিত্য পদার্থ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় এক বিষয়ে সাধুরা সকলে মিলিতেছেন। তাহা এই—মানবের ইচ্ছাকে সংযত করিয়া সেই ধর্মশাসনের অধীন করিতে হইবে। সুতরাং মানব-সমাজকে সংযম এবং বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য ইঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা মানব-জাতির পরম বন্ধু।

আমাদের বন্ধু কে? যে উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলের অধীন হইতে শিক্ষা দেয় সে, না যিনি সংযম শিক্ষা দেন তিনি? যেমন, যে ব্যক্তি বাহিরের জগতে অরাজকতা আনয়ন করে সে সমাজের বন্ধু নয়, কিন্তু যিনি সুশাসন স্থাপন করেন তিনিই বন্ধু, তেমনই আমাদিগকে যাঁহারা ধর্মশাসনের অধীনে আনয়ন করেন, তাঁহারাই মানব-সমাজের প্রকৃত বন্ধু।

মহাত্মা মহম্মদকে অনেকে আরব দেশের বন্ধু বলিয়াছেন। সত্য সত্যই কি তিনি আরব দেশের বন্ধু নন? যে জাতি ধর্ম কি জানিত না, নীতি কি, চরিত্র কি, তাহা জানিত না, যাহারা উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলের হস্তে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, যাহারা সকল প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত ছিল, সেই দুরন্ত জাতিকে যিনি পাঁচ নমাজ, রোজা প্রভৃতি নিয়ম, সংযম, বৈরাগ্য প্রভৃতির অধীনে আনিলেন, তাঁহার ন্যায় সে জাতির হিতৈষী বন্ধু আর কে? আজ মুসলমানগণ আর কিছু করুন আর না করুন, দিবসে রাজা প্রজা সকলেরই পাঁচবার ঈশ্বরের বন্দনা করিতে হইতেছে। ইহা কি প্রকার শাসন! ইহা কিরূপ সংযম! একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, মহম্মদের প্রতিষ্ঠিত রোজা, নমাজ প্রভৃতির এত প্রকার কঠিন ব্যবস্থা যে, ঠিক সেই সকল ব্যবস্থা জীবনে পালন করিতে হইলে মানুষকে অতিশয়

সংযত হইয়া থাকিতে হয়। ইহা যে অতীব সত্য, তদ্‌বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তৎপরে সাধনার উপায় বিষয়েও সাধুদের বিরোধ দেখি না। বুদ্ধ বলিলেন, প্রধান সাধনা জ্ঞানের দ্বারা। তিনি বলিলেন, "হে মানুষ! তোমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর। করিয়া নিত্য যাহা, স্থায়ী যাহা, তাহাকে গ্রহণ কর এবং অনিত্য যাহা, অস্থায়ী যাহা, তাহাকে বর্জন কর ও বাসনার বিলয় করিয়া ধর্মের অধীন হও।" যীশু বলিলেন, প্রধান সাধনা প্রেমের দ্বারা। তিনি বলিলেন, "তোমরা প্রেমে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হও এবং Mammon বা বিষয়াসক্তিকে পরিহার কর এবং ঈশ্বর-চরণে আত্মসমর্পণ কর।" আর মহাত্মা মহম্মদ বলিলেন, প্রধান সাধনা ইচ্ছার দ্বারা। তিনি বলিলেন, "তোমরা স্বীয় ইচ্ছাকে বলিদান কর, নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিও না; এবং সর্বান্তঃকরণের সহিত প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন হও।" এ তিনই ত এক কথা। তিনই ত সাধনার পথ বটে। সুতরাং আমরা এ সকলই লইতে পারি। এ তিনের মধ্যে কিছুই বিরোধ নাই।

আমি অনেক সময়ে মনে মনে কল্পনা করি যে, সাধুরা সকলে পরকালে বসিয়া আপনাদের উক্তিসকল তুলনা করিতেছেন। মনে ভাবি, তাঁহারা কি বলাবলি করিতেছেন? নিশ্চয়ই তাঁহারা পরস্পরকে বলিতেছেন, "ও ভাই, আমিও যা বলেছি, তুমিও ঠিক তাই বলেছ। কিছুই ত বিরোধ নাই। তবে এরা করে কি? আমরা সকলেই ব'লে এলাম এক কথা, আর এরা ক'রে বসল আর কত রকম।" আবার হয়ত বলিতেছেন, "ওমা, এ আবার কি রকম? আমরা দিলাম এক জিনিস, আর এরা ধ'রে বসল আর-এক জিনিস। আমরা শিখালাম ভগবদ্‌ভক্তি, আর এরা কি না ধ'রে বসল আমাদেরই পা; ও মা এ

আবার কি হ'ল।" হয়ত যীশু বলিতেছেন, "আমি ত ভাই খ্রীষ্টান নই।" বুদ্ধ বলিতেছেন, "আমি ত ভাই বৌদ্ধ নই।" মহম্মদ বলিতেছেন, "আমি ত ভাই মোসলেম নই। আমরা ত আমাদের কথা ভাবিও নাই, এরা তবে আমাদের নিয়ে টানাটানি করে কেন? আমরা যাঁর সিংহাসন উঁচু ক'রে ধরলাম, তাঁকে পিছে ফেলে দিল, আর বসাল কি না আমাদিগকেই সিংহাসনে।" নিশ্চয়ই মহাপুরুষেরা আজ এইরূপ বলিতেছেন।

আমি বলি, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। তাজা ধর্ম, জীবন্ত ধর্ম, সাক্ষাৎ-করা ধর্ম, আস্বাদন-করা ধর্ম, সম্ভোগ-করা ধর্ম—যে ধর্ম পাইয়া মানুষ নবজীবন লাভ করে, যে ধর্ম লাভ করিয়া মানুষ মানুষ হয়, সেই ধর্ম ইঁহারা জীবনে লাভ করিয়াছিলেন; সেই ধর্ম পাইয়াই ইঁহারা সিংহের তেজে প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেই ধর্মের কথা মানুষকে বলিবার জন্যই ইঁহারা সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন।

মহাপুরুষগণ বিধাতৃতত্ত্বের ব্যাখ্যাকর্তা মাত্র, কিন্তু ধর্মের নিয়ামক নহেন। তাঁহারা ধর্মসাধনের পথপ্রদর্শক মাত্র, কিন্তু ধর্মের ব্যবস্থাপক নহেন। তাঁহারা ধর্মভাবের মহা উদ্দীপনা আনিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ধর্মকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস পান নাই। নূতন নিয়ম, নূতন ব্যবস্থা দিবার জন্য তাঁহারা জগতে আসেন নাই। তাঁহারা যে কিছু বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া; তাঁহারা যে কিছু নূতন বিধি, নূতন নিয়ম জগতে দিয়াছেন, তাহা নিজ নিজ সময়ে নিজ নিজ জাতি-মধ্যে যে-সকল অভাব দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়কে দূরীকরণোদ্দেশ্যে। এক যুগের বিধি সর্ব যুগের মানুষকে বাঁধিবে, ইহা তাঁহাদের মনে ছিল না।

ধর্মসাধনের নাম দিয়া এ জগতে মানুষ যতপ্রকার শৃঙ্খল সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে মনে দুঃখ হয়। মনে হয়, যেন ধর্ম মানুষের চরণে নানা প্রকার নিগড় পরাইতেই আসিয়াছে। বিজ্ঞান ও সত্যের যে বন্ধন তাহা খুলিয়া দিয়া যেন ঐ অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের বন্ধনে মানুষকে বাঁধিতেছে। আবার মানুষের এমনই দুর্মতি যে, মানুষ কুসংস্কারের এক প্রকার শৃঙ্খল খুলিয়া ঐ আর-এক প্রকার শৃঙ্খল পায়ে পরিতেছে। মানুষ নিজের স্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন কার্যকে এত ভয় পায় কেন? পরাধীনতাকে কি মানুষ এতই ভালবাসে যে, এক প্রকার রজ্জু খুলিয়া আর-এক প্রকার রজ্জুতে আপনাদিগকে বাঁধে।

কেন যে মানুষের এমন দুর্মতি হয়, তাহা ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। কতকটা কারণ মনে হয় যে, মানব-প্রকৃতিতে স্বভাবতই এক প্রকার আলস্য আছে, যাহাকে অনুকরণ-প্রিয়তা বলা যায়। এই অনুকরণ-প্রিয়তা মানব-প্রকৃতিতে বড়ই প্রবল। মানুষ সাধারণত যে পথে কাঁটা ফুটে, সে পথে পা দিতে ভালবাসে না। যে গাছে কাঁটা আছে, তাহার গায়ে মানুষ হাত দিতে চায় না; কিন্তু ঐ যে গাছটাতে কাঁটা নাই, তাহারই গায়ে হাত বুলাইতে ভালবাসে। মানুষ মনে করে, "কে বাপু অত চিন্তা করে? কে বাপু অত ভাবনা ভাবে, ওর চাইতে ঐ যা আছে তাই ভাল।" সুতরাং মানব-প্রকৃতিতে অনুকরণ-প্রবৃত্তি প্রবল।

ঐ অনুকরণ-প্রবৃত্তি নানা আকারে প্রকাশ পায়। আমি এক সময়ে একটা গ্রাম্য স্কুলের হেড মাস্টার ছিলাম। একবার সেই গ্রামের কায়স্থদের ইচ্ছা হইল যে, তাহারা সকলে পৈতা লইবে। তাহারা ত পৈতা লইল। তখন তাহাদিগকে সকলে একঘরে করিল। আমি হইলাম পৈতা ফেলে একঘরে, আর তারা হ'ল পৈতে নিয়ে একঘরে। যাহা

হউক কিছু দিন ত কাটিয়া গেল। তার পর দেখি, তারা সব একরকম ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া বিসর্জন দিতে লইয়া যাইতেছে। কানে কলম গোঁজা সবুজ রং-এর ঠাকুর, তাহার পূর্বে সে রকম ঠাকুর আমরা কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি?" তাহারা বলিল, "এ আমাদের ঠাকুর, এর নাম চিত্রগুপ্ত।" তারা কোথায় পুরাণ খুঁজিয়া এক চিত্রগুপ্ত ঠাকুরের উল্লেখ পাইয়াছে, অমনই সকলে চিত্রগুপ্ত প্রস্তুত করিয়া পূজা করিল। কিছুদিনের মধ্যে দেখি, গ্রামের অন্য কোনও কোনও ভবনে চিত্রগুপ্ত পূজা আরম্ভ হইল। কি নিয়মে চিত্রগুপ্ত পূজা করিতে হয় তাই কেহ জানে না। কে আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া জিজ্ঞাসা করে, তখন তারা আগে যাদের বাড়িতে পূজা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে চিত্রগুপ্ত পূজা করিতে হয়। তাহারা যে নিয়ম বলিয়া দিল, অমনই সকলে সেই নিয়মে পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে পৌত্তলিক পূজা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

মানব-প্রকৃতিতে স্বভাবতই এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি রহিয়াছে। যাহাতে আনন্দ হয়, যাহাতে মনে সুখ হয়, যাহা অপর দশজনে করে, মানুষ না ভাবিয়া চিন্তিয়া অমনই সেই কাজ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে এ দেশে অনেক পৌত্তলিক পূজা প্রচলিত হইয়াছে।

আর-একটা গল্প একবার শুনিয়াছিলাম। একবার একজনদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হইতেছিল। সেই বাড়িতে একটা বিড়াল ছিল; সেটা বড় দুষ্ট, বড় উপদ্রব করিত। সেজন্য যেখানে শ্রাদ্ধ হইতেছিল, তাহার এক পাশে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার কিছু দিন পরে সেই বাড়ির নিকটবর্তী আর-একজনদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হইতেছিল। ঐ বাড়ির লোকেরা পূর্ব বাড়ির বিড়াল বাঁধা দেখিয়াছিল

এবং সেটা তাদের মনে ছিল। সে বাড়িতে বিড়াল ছিল না; শ্রাদ্ধের সময় দেখা গেল, তাহারা কোথা হইতে একটা বিড়াল ধরিয়া আনিয়া শ্রাদ্ধ-স্থানের এক পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তদবধি সে দেশে শ্রাদ্ধের সময় বিড়াল বাঁধার নিয়ম হইল। মানুষ এমনি অনুকরণ-প্রিয়।

তার পরে দ্বিতীয় কারণ মানুষের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির অভাব। যেমন দেখি, খনির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধাতু উদ্ধার করে অতি অল্প লোকে, কিন্তু সেই ধাতুকে পরিষ্কার করিয়া, তাহা ছাপিয়া, তাহাতে রাজার মুখ আঁকিয়া টাকা করিয়া লক্ষ লক্ষ, হাজার হাজার লোকের হস্তে দেওয়া হয় এবং তদ্দ্বারা তাহাদের নানা প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তেমনই দেখি ধর্মজগতের যত চিন্তা, যত পরিশ্রম, যত ক্লেশ তাহা ভোগ করেন ঐ দুই-চারি ব্যক্তি, দুই-চারিজন লোক গভীর ধ্যান, গভীর চিন্তা, দুরন্ত পরিশ্রমের দ্বারা সত্যরত্ন উদ্ধার করেন, আর তাহা ছাপিয়া তদুপরি তাঁহাদের নামের ছাপ দিয়া জগতের লোককে দেওয়া হয়। মানুষ স্বাধীন ভাবে নিজে চিন্তা করিয়া, নিজে খাটিয়া কিছু জানিতে চায় না।

তৎপরে তৃতীয় কারণ অতিরিক্ত সাধুভক্তি। সাধুজনের প্রতি মনের ঐকান্তিকী ভক্তি-বশত মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে না। মানুষ ভাবে, "উনি যাহা বলিয়াছেন, ঐ ঠিক। উনি জ্ঞানী, উনি ধার্মিক, উনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, নিশ্চয়ই উহা ভাল। আমি কি জানি? আমি অধম, আমি অজ্ঞ, আমি অধার্মিক, ধর্মের তত্ত্ব আমি কি বুঝি? উনি যাহা বলিতেছেন, নিশ্চয়ই উহা ভাল হইবে, আমি এখন বুঝিতেছি না, কিন্তু হয়ত একদিন বুঝিব।" মানব-মনের এই ভাবটা অতীব প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রকার অতিরিক্ত সাধুভক্তির

দ্বারা সময়ে সময়ে মানুষের এক মহা অনিষ্ট এই হয় যে, ইহাতে মানুষের সত্য বিচারের শক্তি হরণ করে।

এই সকল কারণে মানুষ সাধুদের উক্তিসকল পরীক্ষা না করিয়া, নিত্য অনিত্য, সত্য অসত্য, যুক্ত অযুক্ত সব লইয়া শাস্ত্র রচনা করে। সাধুরা কিন্তু কোনও দিনই ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের উক্তিসকল লইয়া মানুষ আবার শাস্ত্র করিবে। অবশ্য মহাত্মা মহম্মদ কোরানে অনেক বিধিনিষেধ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাও সকলের জন্য নহে, কেবল দুর্দান্ত আরব জাতির জন্য। কিন্তু অন্য কোনও মহাজন এরূপ করেন নাই। মহাত্মা বুদ্ধও কোনও দিনই শাস্ত্রের কথা ভাবেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া শেষ কথা এই বলিলেন যে, "তোমরা আপনাপন মুক্তির পথ আপনারা দেখিয়া লও।" কিন্তু মানুষ এই সকল কথা লইয়া শাস্ত্র করিয়াছে। সাধুরা আমাদিগকে শাস্ত্র দিতে আসেন নাই। তাঁহারা মানবের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তিকে জাগাইয়া দিবার জন্যই জগতে অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কোনও দিনই ভাবেন নাই যে, তাহাদের মুখের উক্তিসকল লইয়া মানুষ অভ্রান্ত শাস্ত্র করিবে।

তবে কি সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা এতদুভয়ের মিলন হইবে না? কেন হইবে না? সাধুদের নিকট হইতে আমাদিগকে কি লইতে হইবে এবং কি লইতে হইবে না, তাহা স্মরণ রাখিলেই অনায়াসে মিলিতে পারে। তবে এখন প্রশ্ন এই যে, সাধুদের নিকট হইতে আমরা কি কি লইব?

প্রথমে উদ্দীপনা (inspiration); সাধুরা আমাদিগকে উদ্দীপ্ত করেন, এই উদ্দীপনা আমরা ইঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই। উদ্দীপনা জিনিসটা মানবের ধর্মজীবন গঠনের পক্ষে একটা মস্ত

জিনিস। ধর্মমত কেবল কেতাবে, কেবল দর্শনশাস্ত্রে থাকিলে কি হইবে? দর্শনশাস্ত্রে ধর্মমত-সকল পাঠ করিয়া কাহারও ধর্মজীবন গড়ে না। কিন্তু যখন সেই ধর্মমত জীবন্ত মানুষের অন্তরে কার্য করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই মানুষের চরিত্র, সেই মানুষের জীবন মানব-অন্তরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দৃষ্টান্তে মানুষের ধর্মজীবন গড়ে।

এ বিষয়ে যখন ভাবি তখন আমার যুদ্ধযাত্রার কথা মনে হয়। রণক্ষেত্রে যখন কোনও সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তখন কিরূপ লোক দেখিয়া সেনাপতি করা হয়? মানুষ বাছিয়া বাছিয়া এমন লোককে সেনাপতি করে, যিনি সৈন্যদিগকে উদ্দীপ্ত করিতে পারিবেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁর মুখের বাণী শুনিলে সৈন্যগণ প্রবল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। আবার কেবল ভাল সেনাপতি হইলেই চলে না; উপযুক্ত সেনাপতির অধীনে উপযুক্ত সৈন্যদল চাই। কেবল যদি জেনারেল গর্ডনের ন্যায় সেনাপতি দেওয়া যায়, আর তাঁহার অধীনে যদি একদল উড়িয়া সৈন্য বা একদল বাঙালী সৈন্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোনও কাজ হয় না। আবার যদি একদল সুশিক্ষিত ইংরাজ সৈন্যের উপরে একজন উড়িয়া সেনাপতি বা একজন বাঙ্গালী সেনাপতি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কোনও কাজ হয় না। সেনাপতি এবং সৈন্যদল উভয়ে এরূপ হওয়া চাই যে, পরস্পরের মুখ দেখিলে পরস্পরের মধ্যে উদ্দীপনা-শক্তি বাড়িয়া যায়। কেবল জেনারেল গর্ডন হইলেও চলে না, আবার কেবল একমাত্র ইংরাজ সৈন্য হইলেও চলে না।

বর্তমান সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে যুদ্ধ হইতেছে, তার বিষয়ে সকলেই জানেন যে, প্রথমত জেনারেল বুলারকে সেনাপতি করিয়া সেখানে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, তিনি

সৈন্যদিগকে ভাল করিয়া উদ্দীপ্ত করিতে পারিলেন না, তখন আবার লর্ড রবার্ট্‌স্‌কে সেনাপতি করিয়া পাঠান হইল। রবার্ট্‌স্‌ সেনাপতি হইয়া যাইতেছেন এই সংবাদ Cape Colonyতে পৌঁছিবামাত্র অমনি সৈন্যগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, অমনি যেন তাহাদের হৃদয়ে তাড়িৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল, অমনি তাহাদের ধমনীতে রক্তধারা প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। তাহাদের হৃদয়ে যেন কোথা হইতে নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিল। সৈন্যগণ বুঝিল যে, এমন একজন মানুষ তাহাদের নেতা হইয়া আসিতেছেন যিনি তাহাদিগকে জয়শ্রী দিতে পারিবেন।

নেল্‌সন যখন তাঁর জাহাজের মাস্তলের নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সমুদায় রণতরী সোৎসাহে পতাকা তুলিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত।

ইহারই নাম inspiration বা উদ্দীপনা। এইরূপ আবার নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, ধার্মিক জনের সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ জীবন পায়, স্বার্থত্যাগ শিক্ষা করে।

সাধু মহাজনগণ পৃথিবীতে উদ্দীপনা আনিয়া মহা কাজ করিয়াছেন। এই উদ্দীপনা জগতে এক মহা জিনিস। এটা চাই, ধর্মজীবন গঠনের পক্ষে ইহা একটি প্রধান সহায়। ধর্মজীবনের গঠন, ধর্মজীবনের উন্নতি, ধর্মজীবনের দৃঢ়তালাভ এ সকল ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব ব্যতীত কখনই হয় না। এই ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে কি আমরা ইহার পরিচয় পাই নাই ? ব্রাহ্মসমাজে কি আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখি নাই ?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, যখন তাঁর ১৩।.৪ বৎসর বয়স, তখন একবার তাঁহাদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়া

দেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া দেখেন, রামমোহন রায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া উপরে যাইতেছেন। তিনি যখন সিঁড়িতে উঠিতেছেন, তখন মহর্ষি তাহাকে বলিলেন, "আমার নিবেদন এই যে, আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হইবে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক গিয়া ঠাকুর দর্শন করিবেন এবং আহারাদি করিবেন, আমি নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া রামমোহন রায় বলিলেন, "সে কি, আমাকে আবার নিমন্ত্রণ কেন? যাও যাও, উপরে রাধাপ্রসাদ আছে, তাকে গিয়ে নিমন্ত্রণ কর।" মহর্ষি বলিয়াছেন, "রামমোহন রায় এই কয়টি কথা এমন ভাবে বলিলেন যে, আমি তখনই বুঝিলাম যে, পৌত্তলিকতাটা ভাল নয়। সেই যে রামমোহন রায়ের একটিমাত্র কথাতে আমার মনে পরিবর্তন আসিল, সেই যে বালককালে আমার ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিল, তাহা অদ্যাপি সমান ভাবে রহিয়াছে; ইহা আর গেল না।"

এইরূপে রামমোহন রায় অনুপ্রাণিত করিয়া যান মহর্ষিকে। রামমোহন রায়ের নিকট হইতে জীবন লাভ করেন রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট হইতে মহর্ষি, আবার মহর্ষির নিকট হইতে জীবন লাভ করেন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, আর তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া, তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া, তাঁর নিকটে উপদেশ পাইয়া জীবন পাইয়াছি আমরা। এইরূপে জীবনধারা নামিয়া আসিতেছে। একজনের নিকট হইতে অপর শতজনে জীবন পায়। ধর্মজীবন জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শে গঠিত হয়; মানুষে পোষণ করে। তুমি আমি আমরা সকলেই এইরূপে জীবন পাইয়াছি।

এইজন্যই বলি যে, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যে প্রথা ছিল, যাহাতে শৈশবকালে ছাত্রগণকে গুরুর নিকটে দীক্ষিত করিয়া গুরু-

গৃহে রক্ষা করা হইত, যাহাতে ছাত্রগণকে জীবনের প্রথম ভাগ গুরুর পরিচর্যাতে নিয়োগ করিতে হইত, তাহা অতীব উৎকৃষ্ট, অতীব উপকারী ছিল। তদ্দ্বারা ছাত্রগণ গুরুর নিকট হইতে যে জীবন লাভ করিত, তাহা চিরদিন তাহাদের সঙ্গে থাকিত। ব্রাহ্মদিগকে বলি যে, যদি সম্ভব হয়, তবে আপনাদের সন্তানগণকে উপযুক্ত বিশ্বাসী, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরানুরাগী গুরুর নিকটে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের নিকটে রক্ষা করুন। গুরু কোনও খারাপ অর্থে বলিতেছি না। যেখানে ঈশ্বর-প্রীতি নিয়ত বাস করে, যেখানে মানুষ অকপটে ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, যেখানে বৈরাগ্য সংযম ভগবদ্‌ভক্তি, সেখানে বাস করিলে মানুষের ধর্মজীবন অতি সহজেই গঠিত হয়।

আজকাল সকলে এই বলিয়া দুঃখ করেন যে, আমাদের মধ্য হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি চলিয়া গেল। দেশের অগ্রণী যাঁহারা, তাঁহারাও এই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন, আবার রাজারাও বলিতেছেন যে, বাঙ্গালাদেশের ছাত্রদের মধ্যে আর Reverence দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন যে, যুবকগণ দিন দিন উদ্ধত ও অবিনীত হইয়া উঠিতেছে; বিনয়, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি এ-সকল ছাত্রজীবন হইতে চলিয়া গেল। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, গেল কেন? এজন্য কি ছাত্রেরা দায়ী, না দেশের নেতারা দায়ী? আজকাল যে প্রণালীতে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়, বিদ্যালয়সমূহে যে প্রকার ব্যবস্থা, তাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রে কোনও প্রকার আত্মীয়তা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ছাত্রগণের দুর্বিনীত ও উদ্ধত হওয়া অতিশয় স্বাভাবিক। এরূপ ছাত্র মাষ্টারের চোখে ছোরা মারিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? গুরুচরিত্রের প্রভাব যদি ছাত্রচরিত্রের উপরে কাজ না করে, তবে ছাত্র কখনই ভাল হইতে পারে না। ধর্মজীবনের পোষণ হয় ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবে। এই

উদ্দীপনা আমরা সাধুদের নিকট হইতে পাই। সাধুরা আমাদের এই এক মহোপকার করেন যে, তাঁহারা চরিত্রের প্রভাব আমাদের উপরে বিস্তার করেন।

দ্বিতীয়ত সাধুদের নিকট হইতে আমরা পাই আনুগত্য বা বিশ্বস্ততা। ইংরাজিতে বলা যায় Fidelity। বিশ্বস্ততা কি? না, নিজেরা যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়াছিলেন, নিজেরা যাহাকে কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ রূপে তাহার অধীন হইয়াছিলেন, আপনাদিগকে তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিরূপে সত্যকে জীবনে পালন করিতে হয়, কিরূপে নিজ বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে হয়, তাহা এই সকল সাধু মহাজন জগৎকে শিখাইয়াছিলেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন, কিরূপে সত্যকে প্রাণ দিয়া ধরিতে হয়।

তৎপরে সাধুদের নিকট হইতে আমরা আর-এক জিনিস পাই, তাহার নাম আত্মসমর্পণ, সত্যের চরণে আত্মবিক্রয়। সাধুরা কেবল যে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় সত্যকে দেখিয়াছিলেন, তাহা নয়, তাঁহারা যে কেবল সাধনার দ্বারা, কঠোর আত্মনিগ্রহের দ্বারা, খনি হইতে ধাতু উদ্ধারের ন্যায় সত্য-রত্ন উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা নয়, কিন্তু একেবারে দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই সত্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহাদের যাহা কিছু ছিল, সব আনিয়া সেই সত্যাগ্নিতে আহুতি দিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আগে ত আপনাকে দেই, আগে ত যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তার হাতে প্রাণটা দিই, তার পরে আর সব চিন্তা, তার পর আর সব গড়িবে। জীবনের লক্ষ্য যাহা, তাহা ত আগে ধরি, তার পরে উপলক্ষ্য। আগে ত আপনি বাঁচি, তার পরে আর সব, তারপরে আর যা কিছু। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে, আর কতকগুলি উপলক্ষ্য

থাকে। লক্ষ্য যাহা তাহার জন্য মানুষ অপর সকল প্রকার ক্ষতি স্বীকার করে। উপলক্ষ্য পরে। উপলক্ষ্য লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে যতটা থাকে, তাই ভাল।

সব সাধুই এই এক কথা বলিয়াছেন, সকলেই একবাক্যে এই সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। সকলেই বলিয়াছেন "ঈশ্বরে প্রাণ দাও।" সকলেই বলিয়াছেন, "বিষয়াসক্তি ছাড়, সত্যের চরণে আত্মবিলোপ কর।" সেই একই কথা। ইহাই মহাপুরুষদিগের বাণী।

আমাদের স্বার্থপরতা কি এতই ভারী, আমাদের স্বেচ্ছাপরতন্ত্রতা কি এতই প্রবল, আমাদিগের বিষয়াসক্তির বন্ধন কি এতই দৃঢ়, লোকভয় কি এতই ভারী, পাপপ্রলোভন কি এতই ভারী যে, আমরা ঈশ্বরে প্রাণমন সমর্পণ করিতে পারিব না? আমরা কি এতই অধম, আমরা কি এতই ক্ষুদ্র যে, সত্য যাহা, নিত্য যাহা, বস্তু যাহা, যাহা আমাদের চিরদিনের সম্বল, তাহাকে আমরা প্রাণ দিয়া ধরিতে পারিব না? ঐ শুন, তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকর্তা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আজ স্বর্গ হইতে তোমাদিগকে বলিতেছেন—

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহাকে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।

ইহাই রামমোহন রায়ের বাণী। ইহাই সাধুদিগের বাণী, ইহাই মহাপুরুষদিগের বাণী। এই বাণী সাধু মহাজনগণ জগতে চিরদিন প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

তোমরা ভয় পাইও না, প্রাণ দাও, সত্যেতে আত্মসমর্পণ কর, সকল সুখের আকর যিনি, সকল মঙ্গলের আধার যিনি, চিরদিনের সম্বল যিনি, সেই মহান্ পরমেশ্বরের চরণে আত্মবলিদান কর। আমি বলিতেছি, তোমাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমাদের ঐহিক

পারত্রিক সর্ববিধ কল্যাণ হইবে। ভাই! ঈশ্বরকে একটা সন্দেশ দিলে তিনি দুইটা সন্দেশ দেন। তোমরা এমন অধম হইও না, তোমরা এমন অপদার্থ হইও না, ঈশ্বরকে ভুলিও না। যাঁহা হইতে তোমাদের এই জীবন এবং যাঁহা হইতে জীবনের সর্ববিধ সুখ, তাঁহাকে তোমরা ভুলিও না। তোমরা তাঁহাতেই বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁহাকে দেহ মন প্রাণ দাও, তিনিই সকল সুখের উৎস। মহাপুরুষেরা এই ঈশ্বর-ভক্তি জগতে প্রচার করিয়াছেন। বিধাতা করুন, যেন আমরা মহাপুরুষদিগের চরণে বসিয়া এই ঈশ্বর-প্রীতি শিক্ষা করি।

১২ মাঘ ১৮২১ শক। ১৯০০ খ্রী

নবযুগের নব আকাঙ্ক্ষা

ঊনবিংশ শতাব্দী আমাদিগকে যে যুগে উপস্থিত করিয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, সেটা নবযুগ। বর্তমান সময়ের জ্ঞানিগণ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাকে নবযুগ বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই যুগ সম্বন্ধে এক্ষণে যিনি যাহা লিখিতেছেন বা বলিতেছেন, সকলেই ইহাকে নবযুগ নামে অভিহিত করিতেছেন। বর্তমান সময়ে ইউরোপ প্রভৃতি স্থান হইতে যে-সকল নূতন নূতন পত্রিকা বাহির হইতেছে, তৎসমুদয়েরও এই যুগ অনুসারে নামকরণ হইতেছে। The New Age, Herald of the Golden Age প্রভৃতি পত্রিকা এই নবযুগকেই প্রকাশ করিতেছে।

কেন ইহাকে নবযুগ বলা হইতেছে? একটুকু চিন্তা করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহার বিশেষ কারণ আছে। কি বিষয়-বাণিজ্যে, কি মানবের সুখ-সৌভাগ্যে, কি মানবের সাহিত্যে, কি সামাজিক ইতিবৃত্তে, কি জ্ঞানরাজ্যে, কি মানবের ধর্মভাবে, সর্বত্রই দেখি বিগত শতাব্দীতে কতকগুলি মহা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চিন্তা করিলে অতি আশ্চর্য বোধ হয় যে, এক শতাব্দীতে এত পরিবর্তন! বাস্তবিক বিগত শতাব্দী মানবের সকল ব্যাপারে এমন সকল ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে যে, তৎপূর্বে দুই তিন শতাব্দী একত্র করিলেও তাহার সমান হয় না। বিগত শতাব্দীতে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে যে-সকল নব নব সত্য মানব-জ্ঞানে ফুটিয়াছে, বিজ্ঞানের যে-সকল নব নব আবিষ্কার মানব-চিন্তাতে উদ্‌ভূত হইয়াছে, সে-সকলের বিবরণ একটি বক্তৃতাতে দেওয়া সম্ভব নয় এবং তাহা আমার শক্তিরও অতীত। এই কয়দিনের সুযোগ্য বক্তাদিগের মুখে শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার কিছু কিছু

শুনিয়াছেন এবং অনেকেই সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করিয়াছেন। তথাপি সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

প্রথম, জীবনের বাহ্য ব্যাপারে যদি বাহিরের বিষয়ে (Matters Physical) আলোচনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, বিগত শতাব্দী মানুষের সুখ-সৌকর্যে, বিষয়-বাণিজ্যে, আইন-আদালতে অতি আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়াছে। আমি অতি সংক্ষেপে তাহার দুই-একটির উল্লেখ করিব। তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, বিগত শতাব্দী মানবের বাহ্যিক ব্যাপারে কত দিকে কত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

প্রথম, রেলওয়ে। এই রেলওয়ে পূর্বে ছিল না। বিগত শতাব্দীতে এই রেলওয়ে জগতে আবিষ্কৃত হইয়া জগতের কি ঘোর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, নরনারীর কি সুমহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা সকলেই কল্পনাতে ধারণ করিতে পারেন। বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া, গতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া, জাতিসকলকে পরস্পর এক-সূত্রে বাঁধিয়া, ইহা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এখন যে সকলে অনুভব করিতেছেন জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নরনারী দিন দিন এক অচ্ছেদ্য একতাসূত্রে গ্রথিত হইতেছে, ইহা প্রধানত এই রেলওয়ের কাজ।

অধিক কি, ভারতবর্ষে সে পরিবর্তনের আঘাত এমনই লাগিয়াছে যে, এখন ভারতের সকল লোক মনে করিতেছে তাহারা এক পরিবার -ভুক্ত। এখন আর স্বদেশ বলিতে আমরা কোনও এক ক্ষুদ্র পল্লীকে বুঝি না, স্বজাতি বলিতে কোনও এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ কোনও ক্ষুদ্র জাতিকে বুঝি না। এখন স্বদেশ বলিতে আমরা হরিদ্বার হইতে কুমারিকা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝিয়া থাকি, স্বজাতি

বলিতে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে যাহারা বাস করে তাহাদিগকেই বুঝিয়া থাকি।

এই যে একতার ভাব, যে ভাব প্রাণে আসাতে আজ আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতিকে এক জাতি বলিয়া অনুভব করিতেছি, যে ভাব প্রাণে আসাতে আজ রাণাডে মহোদয়ের মৃত্যুর জন্য আমরা বোম্বাইবাসীর সহিত এক হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেছি, তাহা সমগ্র জগতের পক্ষে এক নবযুগের সূচনা কি না? রেলওয়েতে যে কি এক ঘোর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমি সমগ্র রূপে ব্যক্ত করিতে পারি না। আমার মনে হয়, ইহা এক মহা সমাজ-সংস্কারক, ব্রাহ্ম প্রচারকের অপেক্ষা বড। ব্রাহ্ম প্রচারকগণ দেশবিদেশে ঘুরিয়া বক্তৃতা করিয়া যাহা করিতে না পারেন, রেলওয়ে নিঃশব্দে নীরবে তাহা করিতেছে। আমার পিতা— তিনি হিন্দু, পরম হিন্দু— নীচ জাতির সংস্পর্শে আসিলে তিনি গঙ্গাস্নান করা আবশ্যক মনে করেন, নতুবা তাঁহার জাতি যায়, তাঁহাকে নীচজাতীয় মেথরের পাশাপাশি বসাইয়া কাশীতে লইয়া যাইতেছে।

রেলওয়ের পরে স্টীমার, বাঙ্গালাতে বলা যায় বাষ্পীয় জলযান। বিগত শতাব্দীতে এই বাষ্পীয় জলযানের সৃষ্টি হইয়া কি এক অত্যদ্ভুত পরিবর্তন ঘটাইয়াছে তাহা কল্পনাতে ধারণা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যেমন রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের জাতি-সকলের মধ্যে একতা স্থাপন করিতেছে, এই সকল বাষ্পীয় জলযানও তেমনি জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রণয়, মিত্রতা এবং বন্ধুত্বের ভাবকে বর্ধিত করিতেছে, সমুদয় মানব-জাতিকে এক বিশাল মানব-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিতেছে, বাণিজ্য ও স্বার্থ -বন্ধনে সকলকে বাঁধিতেছে।

রেলওয়ে এবং ষ্টীমশিপ সৃষ্টি হইয়া যেমন মানব-জাতির মধ্যে একত্ব স্থাপন করিয়াছে, তেমনই আবার বিগত শতাব্দীতে Electric Telegraph সৃষ্টি হইয়া কি এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটন করিয়াছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ইহাতে কি ঘোর পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। এক স্থানের লোকের সহিত অপর স্থানের দেশের লোকের চিন্তার আদানপ্রদান চলিতেছে, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? মানব-জাতির একত্ব স্থাপন -পক্ষে ইহা কি কম সহায়?

বিগত শতাব্দীতে মানবের সুখের আরও অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় ক্ষুদ্র হইলেও উল্লেখযোগ্য। বিগত শতাব্দীতে বিলাতি দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হইয়া মানবের কিরূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে সভ্যসমাজের শ্রীবৃদ্ধির কতটা সাহায্য করিয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। যেমন দিয়াশলাই দ্বারা গৃহে আলো জ্বালিবার সুবিধা হইয়াছে, তেমনই আবার গ্যাসের আলো, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়াতে বাহিরের অন্ধকার নষ্ট হইতেছে। তৎপরে বিগত শতাব্দীতে আবার রণ্ট্জেন রে আবিষ্কৃত হইয়া মানুষের কি মহোপকার সাধন করিতেছে। এই আলোর সাহায্যে এক্ষণে অস্ত্রচিকিৎসার কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

বিগত শতাব্দীর আর-একটি আবিষ্কার ফটোগ্রাফি। ইহার সাহায্যে মানুষ মানুষের মুখকে চিরস্থায়ী করিতেছে। বন্ধুবান্ধবের মুখশ্রীকে চির-নবীন করিয়া রাখিতেছে, দূরস্থিত প্রিয়জনের আকৃতিকে আপনার কাছে আনিতেছে। ইহার সাহায্যে দূরস্থ চন্দ্রাদির প্রতিকৃতিও পাওয়া যাইতেছে। তেমনই আবার ফনোগ্রাফের সাহায্যে মানুষের

কণ্ঠের স্বরকে ধরিয়া মানুষ আপনার আনন্দবর্ধনের উপায় বিধান করিতেছে।

কেবল ইহাই নহে, আবার বিগত শতাব্দীতে আর-এক প্রকার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ। ইটালী-দেশীয় সুবিখ্যাত মার্কনি ও এ দেশের ডাক্তার জে. সি. বসু ইহার আবিষ্কারকর্তা। এই যে বিনা তারে টেলিগ্রাফ, যাহার সাহায্যে ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে অনায়াসে অবলীলা-ক্রমে সংবাদ প্রেরণ করা যাইবে এরূপ আশা হইতেছে, তাহা কি আশ্চর্য নয়?

বিগত শতাব্দীতে বহির্জগতে যে-সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া সভ্যসমাজকে চমৎকৃত করিয়াছে, আমি স্থূল ভাবে তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। অতি সংক্ষেপে যেগুলির উল্লেখ করিলাম, সেগুলিকে একত্রিত করিলে বড় সহজ বোধ হয় না। বিগত শতাব্দীর বাহ্য কীর্তিসমূহকে একতালিকাভুক্ত করিলে বলিতে হয়—(ক) Railways; (খ) Steamships; (গ) Electric Telegraph; (ঘ) Telephone; (ঙ) Lucifer matches; (চ) Gas illuminations; (ছ) Electric Lightening; (জ) Rontgen Rays; (ঝ) Photography; (ঞ) Phonography; (ট) Wireless Telegraphy.

এক শতাব্দীতে এমন সকল অভিনব আবিষ্কার বড় সহজ ব্যাপার নয়। ইহার একটি যদি ত্রিশ বৎসরে আবিষ্কৃত হইত তবে সেই ত্রিশ বৎসর ইতিহাসে স্মরণীয় কাল হইয়া থাকিত। এই যে দশটা বিষয় স্থূল ভাবে উল্লেখ করিলাম, এতদ্ব্যতীত বিগত শতাব্দীতে আরও কত যে নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রস্তুত সুকঠিন। যে শতাব্দীর

মধ্যে এতগুলি নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা জগতের সভ্যতার পক্ষে কি নবযুগ আনয়ন করে নাই ?

যেমন বাহিরের বিষয়ে দেখা যাইতেছে যে, উনবিংশ শতাব্দী আমাদিগকে এক নবযুগের দ্বারে আনিয়া উপনীত করিয়াছে, সেইরূপ আবার চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই শতাব্দী জ্ঞানরাজ্যেও এমন কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, যে কারণে বর্তমান যুগকে নবযুগ বলা যাইতে পারে। বিগত শতাব্দী মানব-জীবনে যে সকল সুমহৎ পরিবর্তন সংঘটিত করিয়াছে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তৎসমুদয়ের আলোচনা করা সম্ভব নয় এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নয়। তবে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, বিগত শতাব্দীতে জ্ঞানরাজ্যে দুইটি বিষয়ে অতি সুমহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতি স্থূল ভাবে সেই দুইটির উল্লেখ করিব।

প্রথম, Evolution and Natural Selection-এর মত। বাঙ্গালাতে বলা যায় বিবর্তন-প্রক্রিয়া ও স্বাভাবিক নির্বাচন প্রণালী। এই বিবর্তনবাদ যে কি তাহা বিজ্ঞানবিদ্ মাত্রেই জানেন। সকলেই জানেন, বিগত শতাব্দীতে মহাত্মা ডারউইন এই বিবর্তনবাদের আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমরা সকলেই জানি যে, জগতের সর্বত্রই জাতিভেদ বিদ্যমান আছে— কি জড়জগতে, কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে, কি প্রাণিজগতে, সর্বত্রই ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, কোনও জাতির সহিত কোনও জাতির মিল নাই। নিম আম নয়, আম নিম নয়, এ দুই ভিন্ন জাতি। নিম কখনও আম হইতে পারে না, আম কখনও নিম হইতে পারে না। চিল ঘুঘু নয়, ঘুঘু চিল নয়, ইহারা বিভিন্ন জাতি, ইহারা পরস্পর মিলে না। এইরূপ দেখি, জগতের সর্বত্রই জাতিভেদ বিদ্যমান।

প্রাচীন কালের লোকের ধারণা ছিল যে, সৃষ্টির আদি হইতেই বিধাতা জাতিসকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য চিরদিন আছে, তাহা কিছুতেই ঘোচে না এবং সে পার্থক্য কোনও কালে ঘুচিবার নয়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানির ও ফ্রান্সের পণ্ডিতগণ জীবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আর এই পুরাতন মতে সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টির আদি কি এ বিষয়ে কেহ কেহ গবেষণা আরম্ভ করিলেন।

১৮৪৪ সালে রবার্ট চেম্বার্স নামে এক ব্যক্তি Vestiges of Creation নামে বহু চিন্তা ও গবেষণা-পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে তিনি এই আভাস দিলেন যে, এক অত্যাশ্চর্য বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা নানা জাতীয় জীব বিবর্তিত হইয়াছে। তিনি যে বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিলেন, সে বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সুবিখ্যাত ডারউইন ও তাঁহার সমকালবর্তী মিস্টার ওয়ালেস বহু পরিশ্রম সহকারে প্রমাণ করিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ এক মহা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এক জাতি হইতে নানা জাতীয় জীব বিবর্তিত হইয়াছে।

এই যে নিয়ম ইহাকে ক্রমবিকাশ বল, বিবর্তন-প্রক্রিয়া বল, Evolution বল, সবই এক কথা। এই বিবর্তন-প্রক্রিয়া যে কি তাহা কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন সুযোগ্য বক্তা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আমিও সেই দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করিতে যাইতেছি।

সকলেই জানেন যে, শেয়ালকাঁটা নামে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার পাতায় কাঁটা আছে। এইরূপ পাতায় কাঁটা থাকার অর্থ

এই যে, উদ্ভিদ্‌টি প্রাণীরা খাইতে পারিবে না। হয়ত আদিতে শেয়াল-কাঁটার গায়ে কাঁটা ছিল না। শেয়ালকাঁটার বংশের যে সকল গাছ অদ্যাপি পাওয়া যায়, দেখা যায় যে, তাহাদের গায়ে কাঁটা নাই। তবে শেয়ালকাঁটার গায়ে কাঁটা জন্মিল কিরূপে? তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এক সময়ে কোনও এক শেয়ালকাঁটা গাছের পাতার অগ্রভাগ সরু হইয়াছিল। উদ্ভিদাশী প্রাণীরা হয়ত সেই পাতা খাইতে আসিয়া দেখিল যে, পাতার ছুঁচলো অগ্রভাগ তাহাদের জিহ্বাতে ফুটিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা আর তাহা খাইতে পারিল না। শেয়ালকাঁটা যেন ভাবিল, "এ ত ভারি মজা! তবে ত পাতায় কাঁটা থাকা ভাল।" এই কাঁটা-সমন্বিত গাছ কাঁটার গুণে বাঁচিয়া গেল।

ফল কথা এই, কি জীব কি উদ্ভিদ্ আত্মরক্ষার্থে যেটা যার দরকার সেটা তাহার পক্ষে থাকিয়া যায়। অপর জীবের হস্ত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য যে জীবের পক্ষে যেটা নিতান্ত প্রয়োজন হয় সেটা তাহাতে ফুটিয়া উঠে। কি রকম করিয়া প্রকাশ পায়, কি নিয়মে ফুটিয়া উঠে, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। কিন্তু দেখিতে পাই, বিধাতার অদ্ভুত বিধানে এই নির্বাচন-প্রক্রিয়া বিশ্বের সর্বত্র প্রতিনিয়ত চলিয়াছে। বিধাতা যেন তাঁহার এই জগতে এই এক মহা নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন, "যে যাহার আপনার যেরূপে পার সকলে আপনাকে রক্ষা কর।" তাই দেখি এ জগৎ যেন এক সুবিস্তীর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। এখানে জীবের বাঁচিবার জন্য যেটি যার প্রয়োজন, সেটা আপনা আপনি তাহাতে প্রকাশ পায়, সেটা তাহাতে ফুটিয়া উঠে। সকলে ইহা হাসির কথা মনে করিতে পারেন যে, গাছ কি কখনও বুদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে? কিন্তু

সৃষ্টির সর্বত্র যেন এই নিয়ম দেখা যায় যে, কঠোর জীবন-সংগ্রামে যে আপনার বাঁচিবার উপায় করিয়া লইতে পারে, সেই এখানে বাঁচে, অন্যেরা মারা যায়। ইহার নাম Survival of the fittest— অর্থাৎ এ ব্রহ্মাণ্ডে যোগ্যতমেরই স্থান হয়, সেই এখানে থাকিবে, অন্য সব নিধনপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদের জন্য এ স্থান নয়।

এখন প্রশ্ন এই, বিধাতার এ কিরকম বিধান? এ জগতে যত প্রাণীর জন্ম হয় তাহার অধিকাংশই যদি এখানে থাকিবে না, তবে কেন তাহাদিগকে এখানে আনেন? তবে কেন তাহাদিগকে জন্ম দেন? কেন যে পাঠান, কেন যে দুই-চারিটি প্রাণীকে রাখিয়া বহুসংখ্যক প্রাণীকে মারিয়া ফেলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই দেখি যে, কতকগুলি জীব এ ব্রহ্মাণ্ডে বাঁচিয়া যাইবে, আর ঐ অগণ্য প্রাণী আত্মরক্ষাতে অসমর্থ হইয়া সবলের হাতে জীবন বিসর্জন করিবে। তবে কি তাহাদের জীবন বৃথা যায়?

একদিন এক উপদেশে আমি বলিয়াছিলাম যে, মানুষ যখন পাখিটিকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন দেখি যে, একমুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল। কিন্তু পাখিটি যখন মরে, তখন একটি বা দুইটি গুলিতেই মরে। যদি সে বিংশতিটি গুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে, তবে তাহার একটি বা দুইটি গুলিতেই তাহার কাজ সম্পন্ন হইল, অপর অষ্টাদশটি বৃথা গেল। বন্দুকের ঐ অবশিষ্ট আঠারটা গুলি কি সম্পূর্ণ বৃথা যায়? কখনই না। সেই অষ্টাদশটি গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটির বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা হইয়াছে। তাহারা ঐ দুইটিকে বলশালী করিয়া দিবার জন্যই বন্দুকের ভিতরে থাকে। সেইরূপ ঐ যে অগণ্য প্রাণী জগতে রহিয়াছে, উহারা সকলে যদি জগতে থাকিত, সকলে যদি বাঁচিয়া এখানে কাজ করিত,

তবে অচিরকাল-মধ্যে ভুবন ভরিয়া যাইত। অল্পসংখ্যক জীবকে বলশালী করিয়া দিবার জন্য এ ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীব জন্মিতেছে ও মরিতেছে। বিধাতার কি মহিমা, তাহা তিনিই জানেন। অজ্ঞ মানুষ তাঁহার উদ্দেশ্য কিরূপে বুঝিবে?

মিস্টার ওয়ালেস কিছুদিন পূর্বে Darwinism নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি এক অতি অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এ জগতে যত প্রাণী জন্মে সব যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে আর রক্ষা ছিল না। তিনি তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কত জীব আছে যাহারা লক্ষ লক্ষ ডিম পাড়ে, সেই সকল ডিমের যদি ছানা হইত, আর সেই সব ছানা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে একজাতীয় প্রাণীতেই পৃথিবী পূরিয়া যাইত। তিনি বলিয়াছেন যে, আমেরিকার অরণ্যে ঘুঘু জাতীয় এক প্রকার পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পক্ষীর এককালে একটির অধিক বাচ্চা হয় না, তাহাও আবার ছয় মাস অন্তর। সে অরণ্যে সর্বপ্রথমে হয়ত এক জোড়া পাখি আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল যে, সেখানে এত পাখি জন্মিয়াছে যে এক মাইল দূর হইতে সেই পাখির ডাক শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের আবাসবৃক্ষের তলে পাশা-পাশি দুইজনে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে পরস্পরের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহাদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে।

এইরূপ জগতে কত পাখি জন্মিতেছে, সব যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে কি আর রক্ষা ছিল? সুতরাং অধিকাংশ প্রাণীই মরে। বর্ষাকালে অথবা রাস্তাঘাটে কত ভেকশিশু দেখিতে পাই, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, অন্যমনস্ক ভাবে পা বাড়াইতে গেলেই তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে

গঙ্গার জলে চিতিকাঁকড়া নামে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে কলসী ডুবান যায় না। কলসটি ডুবাইতে গেলেই তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক কুলীরক প্রবেশ করে। কিন্তু এই সকল ভেকশিশু বা কুলীরক যায় কোথায়? ইহারা সকলে কি বাঁচিয়া থাকে? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আমরা আর পা বাড়াইতে পারিতাম, অথবা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারিতাম? এই অগণ্য প্রাণীর মধ্যে অল্পসংখ্যক বাঁচে এবং বহুসংখ্যক বিধাতার ঐ প্রাকৃতিক নিয়মে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীবনধারণের উপযোগী এমন সকল গুণ থাকা চাই যাহাতে জীব বাঁচয়া থাকিতে পারে।

এই বিবর্তনবাদ বিগত শতাব্দীর এক মহা আবিষ্কার। বিগত শতাব্দীতে এই মতটা সভ্যসমাজের মানবের চিন্তাতে প্রধান রূপে প্রবেশ করিয়াছে। এই নবাবিষ্কৃত সত্য এক্ষণে মানবীয় সর্ববিধ ব্যাপারে সর্ববিধ কার্যে প্রযুক্ত হইতেছে। এটি এক্ষণে মানবের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, আইনে, ইতিহাসে, সমাজতত্ত্বে, ধর্মচিন্তায় সর্বত্র মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে।

দ্বিতীয়, আর-একটি বিষয় মানবের চিন্তাতে সুমহৎ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। তাহারও কথা সকলে শুনিয়াছেন। তাহা Conservation of Energy। ইহাতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতে দুই চারি, দুই শত, পাঁচ শত শক্তি নাই। শক্তি এক এবং অবিনাশী, একই শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে, একই জ্ঞান সমস্ত পদার্থে। এই নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্থাপিত হইয়াছে। আগে যেখানে মানুষ পৃথক্ পৃথক্ শক্তি কল্পনা করিত, এখন দেখিতেছে, সেখানে এক ভিন্ন দুই শক্তি নাই। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একই শক্তি, বিশ্বচরাচরে একই নিয়ম।

ঐ তাপের আকারে যাহাকে দেখিতেছ, উহা বাস্তবিক তাপ নয়, উহা গতিরই আর-এক আকার মাত্র। ঐ তাড়িৎ বলিয়া যাহাকে বলিতেছ, উহা আর কিছু নয়; তাপই সেখানে আর-এক আকারে বাস করিতেছে। এইরূপে পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, তাপ, গতি, শব্দ, আলোক, তাড়িৎ এ-সকল একই শক্তির প্রকারান্তর মাত্র, এবং সে শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই। যিনি যত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে ডুবিয়াছেন, তিনি তত দেখিয়াছেন, সর্বত্র একই জ্ঞান এবং একই শক্তি। একটি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম পদার্থকে হাতে লইয়া তাহার বিষয়ে চিন্তা কর, দেখিবে তাহা ঐ সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত বাঁধা। একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলিকণার জ্ঞানকে যদি তুমি পূর্ণ করিতে চাও, তবে ঐ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তোমাকে জানিতে হইবে। এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড এক তারে বাঁধা রহিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ এক শক্তি কর্তৃক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

সমুদয় জ্ঞানের মধ্যে এই যে জগতে শক্তির একতা, ইহা বর্তমান সময়ে মানবের জ্ঞানে প্রবেশ করিয়া মহা পরিবর্তন সাধন করিতেছে।

বিগত শতাব্দীর বিবর্তনবাদের মত বর্তমান সময়ে মানবের চিন্তাকে আশ্রয় করাতে পূর্বপ্রচলিত দুইটি মতে আঘাত পড়িয়াছে। প্রথম, আগেকার লোকের মত ছিল যে, বিধাতা সৃষ্টির প্রারম্ভে ভিন্ন ভিন্ন জীব এ জগতে সৃজন করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরাজিতে Special Creation বলে। এক্ষণে লোকে বিশ্বাস করিতেছে যে, সমুদয় পদার্থ ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে বিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, ইহার দ্বারা আর-একটি মতে গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে। তাহাকে ইংরাজিতে বলা যায় Design argument— অর্থাৎ সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া স্রষ্টার জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া। সেই সৃষ্টিকৌশলবাদ

বলে যে, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা, হরিণ দৌড়িবে বলিয়াই উহার পা সরু হইয়াছে। বিবর্তনবাদ এই প্রশ্ন তুলিয়াছে যে, জীবদেহ দেখিয়া যে মনে করিতেছ কোনও বিশেষ কার্য করিবার জন্য তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই কি সত্য? না সেই কার্য করিয়া করিয়া তাহাব দেহের গঠন ঐরূপ হইয়াছে, ইহাই সত্য? হরিণ দৌড়িবে বলিয়াই তাহার পা সরু হইয়াছে, না বহু পুরুষ ধরিয়া দৌড়িয়া দৌড়িয়া তাহার পদদ্বয় ঐরূপ হইয়াছে? বায়ু পাইবে বলিয়া হৃদ্‌যন্ত্র ঐভাবে নির্মিত হইয়াছে, ইহাই সত্য? না বায়ু পাইয়াছে বলিয়া হৃদ্‌যন্ত্র ঐরূপ হইয়াছে, ইহাই সত্য? এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা সত্য?

আমরা এই নিয়ম দেখি যে, কোনও এক কার্য করিতে করিতে জীবের শক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে। ক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল সেই ভাবে বর্ধিত হয়। আবার দেখি যে, ব্যবহারের অভাবে জীবের শক্তি হীন হইয়া যায়, বৃত্তিসকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে। হাঁস মুরগী প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর ডানা আছে, অথচ উড়িতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বহুকাল পর্যন্ত না উড়িয়া উড়িয়া তাহাদের উড়িবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে হয়ত ঐ-সকল জাতি হইতে অপর কোনও জাতীয় পক্ষী হইবে যাহাদের ডানা থাকিবে না। মাডাগাস্কর দ্বীপে একজাতীয় পতঙ্গ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ডানা আছে, অপর শ্রেণীর ডানা নাই। তাহারা উভয়েই একবংশজাত, কিন্তু আকৃতি বিষয়ে বিভিন্ন। ইহার কারণ এই যে, এই জাতীয় পতঙ্গদের মধ্যে যাহারা সমুদ্রের উপকূলে বাস করিয়াছিল, তাহারা সাগর-তরঙ্গের শব্দে সর্বদা ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইত; কিন্তু যাহারা সাগর হইতে দূরে অন্তঃপ্রদেশে বাস করিত,

তাহারা প্রচুর শস্য পাইয়া নিরুপদ্রবে বসিয়া গিয়াছিল, উড়িবার প্রয়োজন ছিল না। কালে ইহারা পক্ষহীন হইয়া গেল, অপরেরা পক্ষবান্ রহিয়া গেল।

প্রসঙ্গক্রমে একটি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে। এক্ষণে অনেকে একটি যুক্তি দেখান যে, মানুষ আমিষাশী। মানুষের intestine বা নাড়ীসকল এরূপভাবে নির্মিত যাহাতে সে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। তাহাতে আমি যদি বলি, মাংস খাইবার জন্য মানুষের নাড়ী ওরূপ হয় নাই, কিন্তু বংশপরম্পরাক্রমে মাংস খাইয়া মানুষের নাড়ীসকল ঐরূপ হইয়া গিয়াছে, তবে বোধ হয় কিছুই অন্যায় হয় না। ইহাতে আমি যদি বলি, আদিতে মানুষ মাংসভুক্ ছিল না, তবে অপর প্রাণীর মাংস খাইয়া খাইয়া মানুষ এক্ষণে সর্বভুক্ হইয়াছে, তবে কি কিছু অযৌক্তিক হয়?

সামাজিক বিষয়েও বিগত শতাব্দী সুমহৎ পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে, ঘোর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে।

প্রাচীন কালে সামাজিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, স্বজাতি-রক্ষা বা সামরিক প্রয়োজন। প্রাচীন কালে সমাজের ভিত্তি ছিল সমরকুশলতার উপরে। তখন জাতিতে জাতিতে সর্বদা বৈরনির্যাতন চলিত, জাতিতে জাতিতে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ হইত। সুতরাং সে কালের জাতিরা এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির থাকিতে পারিত না; সর্বদা ভয়ে ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত, কখন শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বৈদিক সময়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, তখন ঘোর শত্রুতাগ্নি দেশের সর্বত্র প্রজ্বলিত ছিল। শত্রুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতি-সকল সর্বদা এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে দেখা যায়, প্রাচীন কালের অধিকাংশ জাতি যাযাবর অবস্থাতে বাস করিত। এই যাযাবর শব্দের অর্থ কি, তাহা সকলেই জানেন। শত্রুকুলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক-এক জাতি আপনাপন পশুযূথ লইয়া সর্বদা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদিগকে যাযাবর বলা হইত।

এই যাযাবর দল তখন সকল দেশেই ছিল। আরব-ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, মহম্মদের সময় পর্যন্ত বহু বহু জাতি সেখানে যাযাবর অবস্থায় ছিল। মধ্য আসিয়াতে এখনও পর্যন্ত এই সকল যাযাবর দল বাস করিতেছে। তাহারা আপনাদের গোমেষাদি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান নির্মাণ করিয়া সর্বদা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রত্যেক যাযাবর দলের উপরে একজন দলপতি বা নেতা থাকেন, যাঁহার আদেশের বশবর্তী হইয়া এই সকল যাযাবর দল কার্য করে। আদিম কালে এরূপ লোক নেতা হইত যাহারা সমরকুশলতায়, সাহসে, তেজস্বিতায় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জাতিবিরোধ এবং সংগ্রামের সময় এই সকল নেতার উপদেশের অতিশয় প্রয়োজন হইত। সমাজমধ্যেও দেশ-রক্ষাতে সামর্থ্য ও সমরকুশলতা দেখিয়া মানুষের যোগ্যতার বিচার করা হইত।

প্রাচীন গ্রীস দেশে নিয়ম ছিল, যে-সকল বিকলাঙ্গ শিশু জন্মিবে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। যে-সকল শিশুর শারীরিক গঠন দেখিয়া মনে করা হইত যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইবে না, দেশরক্ষার্থে সমর্থ হইবে না, অপর জাতির সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বদেশ এবং স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হইত, অথবা নিকটবর্তী কোনও এক পর্বতের উপরে

রাখিয়া দেওয়া হইত যেন তাহারা তথা হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যেমন আমাদের দেশে কোনও গৃহস্থের গৃহে একটি শিশু জন্মিলেই গৃহস্থ ভাবেন যে, সে বড় হইয়া কিরূপ চাকরি করিবে, কি পরিমাণে অর্থ উপার্জন করিবে, যেমন তিনি অপর সমুদয় গুণের কথা ভুলিয়া গিয়া পুত্রের সেই গুণের উপরেই অধিক দৃষ্টি রাখেন, তেমনই প্রাচীন কালের জাতিসকল সর্বাগ্রে দেখিত, শিশু সমরকুশল হইবে কি না, সে রণক্ষেত্রে অস্ত্র ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কি না। এই যে সামরিক ভাব, ইহাই ছিল পুরাকালে সামাজিক জীবনের ভিত্তিভূমি। ইংরাজিতে বলিতে গেলে এই ভাবকে বলা যায় militarism, সামরিক প্রতিষ্ঠা।

সভ্যতার উন্নতি সহকারে এই সামরিক প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আসিয়াছে ধনাগমের স্পৃহা। পূর্বে ছিল সমরকুশলতা, এক্ষণে আসিল ধনোপার্জনে দক্ষতা। এই যে বাষ্পযান, কল-কারখানা, আইন-আদালত প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, এ-সকল কেবল ধনাগমের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য। এই যে ধন উপার্জনের প্রবৃত্তি, ইহাকে ইংরাজিতে বলা যায় industrialism অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠা। প্রথমে ছিল সামরিক প্রতিষ্ঠা, তৎপরে হইল আর্থিক প্রতিষ্ঠা।

যখন সমাজের প্রধান লক্ষ্যস্থলে সামরিক ভাব ছিল, যখন সমর-কুশলতা সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্থলে ছিল, তখন সমাজের শাসনের উপায় ছিল socialism বা সামাজিকতা। পূর্ণ বাধ্যতা না থাকিলে সামরিক শাসন থাকে না। সুতরাং যখন সামরিক ভাব সমাজের লক্ষ্যস্থলে তখন বাধ্যতা বা সামাজিকতা শাসনের প্রধান উপায়। পূর্বে সমগ্র জাতি-মধ্যে একই আদর্শ, একই সামরিক ভাব বিদ্যমান ছিল, সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই নিয়মের অধীনে থাকিতে হইত। সেই জাতি, সেই দল বা সেই সকল অধিবাসীর মধ্যে যখনই কোনও

বিষয়ে বিরোধ উৎপন্ন হইত, যখনই কোনও বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইত, তখনই সমাজ বা পঞ্চায়েতের বা নেতৃস্বরূপ প্রধান পুরুষের বাধ্যতা স্বীকার এবং উপদেশ গ্রহণ সামরিক ভাব -প্রধান সময়ের সমাজ-মধ্যে শান্তিরক্ষার উপায়। সামরিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিকতা— অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজের বাধ্য থাকিতে হইবে, কেহই স্ব-ইচ্ছাতে বর্ধিত হইতে পারিবে না, প্রত্যেকের গর্বকে খর্ব করিয়া একই ইচ্ছা এবং একই শাসনের অধীন হইতে হইবে, এই ভাব ছিল।

তৎপরে সামাজিক জীবনের লক্ষ্যস্থলে যখন আসিল আর্থিক প্রতিষ্ঠা বা ধনাগম, তখন সমাজ-মধ্যে প্রধান ভাব হইল, ব্যক্তিত্বজ্ঞান বা ব্যক্তিগত অধিকারের প্রাধান্য। প্রত্যেকে আপনার প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতে সমর্থ। মানুষ আপনার শক্তিকে নিয়োগ করিয়া, আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটাইয়া যাহা উপার্জন করিবে এবং যাহা লাভ করিবে, তাহাতে তাহার পূর্ণ অধিকার ; কাহারও সাধ্য নাই যে, মানুষকে তাহার প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যে যুগে সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্থলে আর্থিক প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তখন তাহার প্রধান ভাব। কারণ এই যে, মানুষ যদি স্বাধীন ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া স্বাধীন ভাবে তাহা ভোগ করিতে না পায়, তবে তার অর্থ উপার্জনের কোনও প্রয়াস থাকে না, তবে তার ধন উপার্জনের আর স্পৃহা থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই এ যুগের প্রধান ভাব। সমাজ-মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন, প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় অধিকার লাভে সমর্থ। এই উৎকট ব্যক্তিত্ব ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাণী প্রচার হইয়াছে, "যে যার আপনার সকলে আপনাকে সামলাইয়া লও।"

সমাজ-মধ্যে এই ঘোর পরিবর্তন আসাতে এই এক মহা অনিষ্ট ফল হইয়াছে যে, এখন সকলেই আপনাপন সুখসুবিধা লইয়া ব্যস্ত। এখন আর কেহই অপরের দিকে তাকাইতে চায় না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। ইহাতে গরিবদের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইতেছে। তাহাদের উপরে দিন দিন দুরন্ত অত্যাচার হইতেছে। তাহাদের এমন সাধ্য নাই যে, তাহারা বলপূর্বক আপনাদের স্বত্ব আদায় করিয়া লইবে, তাহাদের এমন ক্ষমতা নাই, জোর করিয়া আপনাদের প্রাপ্য অধিকারকে রক্ষা করিবে। সুতরাং ধনীদের প্রাপ্য অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া প্রকারান্তরে দিন দিন তাহাদিগকে ঘোরতর দাসত্বে পরিণত করা হইতেছে। তাহারা এমন শক্তিশালী নয় যে ধনীর গ্রাস হইতে আপনাদের অধিকারকে রক্ষা করিবে। সুতরাং ধনীর দ্বারে দাসখত লিখিয়া দিয়া তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতেছে। তাহারা ১৮ ঘণ্টা খাটিয়াও সুখে দিনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতেছে না। দিনরাত ধনীর দাসত্ব করিয়াও শ্রমের অন্ন সুখে আহার করিতে পারিতেছে না।

যদি বল, "খাট কেন? তোমাদের ত কেউ জোর করিয়া খাটায় না; তোমরা খাটিতে না আসিলেই পার", তাহার উত্তর এই যে, পেটের দায়ে, ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের যাতনায় মানুষ বাধ্য হইয়া গুরুতর শ্রম করে। না খাটিলে পরিবার না খাইয়া মারা যায়, স্ত্রীপুত্র অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করে, সেই কারণে তাহারা প্রাণভয় না রাখিয়া খাটিতে আসে। আর ধনীরা তাহারই সুবিধা লইয়া তাহাদের গলায় পা দিয়া কাজ আদায় করে।

দরিদ্রেরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়াও ধন রাখিতে পারিতেছে না। যাহা উপার্জন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের ভরণপোষণ সুচারু রূপে

নির্বাহ হইতেছে না। তাহার ফল বিষময় হইতেছে। এইজন্য ইহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ঐ পুরাতন socialism বা সামাজিকতা দেখা দিতেছে। ব্যক্তিগত প্রাধান্য অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে পুরাতন সামাজিকতা ও বাধ্যতা আবার মাথা তুলিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং বর্তমানে আমরা দেখিতেছি যে, পুরাতন সামরিক প্রতিষ্ঠা আবার imperialism বা সাম্রাজ্যস্পৃহা নাম ধরিয়া মাথা তুলিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। আগে যেমন বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন সময়ে সামাজিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে ছিল সমরকুশলতা, এখন আমরা দেখিতেছি সেই ভাবই আবার সমাজে প্রবেশ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কিন্তু তাহার দিন অবসান হইয়াছে।

পূর্বোক্ত উভয় ভাবের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আজকাল দেখিতেছি আর-একটা ভাব আসিয়া সামাজিক জীবনের ভিত্তিকে অধিকার করিয়াছে। তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় পূর্ণতা-লাভ বা perfection। অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব দোষে দূষিত আর্থিক প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করিয়া সভ্যজগতের লোক এখন আর-এক নূতন পথ অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা এই যে, মানবের সামাজিক জীবনের লক্ষ্য পূর্ণতা-প্রাপ্তি বা perfection। এইটিই নব সামাজিক আকাঙ্ক্ষা। ইহাতে বলে এই যে, মানুষ যতই সামান্য হউক না কেন, মানুষ যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, উন্নতির পথ সকলের জন্য প্রসারিত আছে। মানুষ ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, পুরুষ হউক আর নারী হউক, তাহার প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহার পূর্ণতা লাভ, জ্ঞানে গুণে উন্নতি সাধন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত ও সকলেরই অধিকার।

এই নব আকাঙ্ক্ষা সভ্য জাতিসকলের হৃদয়ে জাগিয়া দরিদ্রদিগের

জন্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে, মনুষ্যত্ব লাভের উপায় সকল শ্রেণীর নরনারীর হাতের নিকট আনিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা এই নবযুগের এক প্রধান লক্ষণ। মানব-জীবনের পূর্ণতার ভাব মনে আসাতে বর্তমান সময়ে ধনীর জন্য জ্ঞানের দ্বার যেমন উন্মুক্ত, গরিবের জন্যও তেমনি উন্মুক্ত হইতেছে। জ্ঞানের কাছে ধনী দরিদ্রের ভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য উন্নতির পথ দরিদ্রের অপেক্ষা হয়ত কিছু সুগম; কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমার উন্নতির পথ কেহ রোধ করিতে পারিবে না। মনুষ্যসাধারণের নিকট জ্ঞানসম্পত্তি এক। এই যে democratic ভাব যাহাতে গরিব এবং ধনীকে এক করিয়া দিতেছে, ইহা হইতে আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সভ্য দেশ-সমূহে গরিবদের জন্য বড় বড় পার্ক খুলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের জন্য বড় বড় চিত্র-শালিকার দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে, জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হইতেছে।

এই নূতন ভাব বর্তমান সময়ে সামাজিক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং বোধ হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এইটিই সর্বত্র প্রধান ভাব হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব দেখিতেছি যে, নবযুগে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে ছুটিতেছে।

বিগত শতাব্দীতে যেমন বাহ্যিক ব্যাপারে, জ্ঞান-রাজ্যে ও সামাজিক জীবনে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তেমনই আবার ধর্ম সম্বন্ধেও সুমহৎ পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে এক্ষণে পৃথিবীর জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনের ভাবের অনেক পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। পূর্বে তাঁহারা ধর্মকে চিন্তা বা গবেষণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তখন তাঁহারা ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার চক্ষেই দেখিতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব হইতে তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, মানবের বিষয়-বাণিজ্য,

আইন-আদালত প্রভৃতির ন্যায় ধর্মও একটি স্বাভাবিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ার ফল।

বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে এবং তৎপূর্ব শতাব্দীর শেষ ভাগে পৃথিবীর জ্ঞানিগণ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ধর্ম সুবুদ্ধিরচনা বা প্রবঞ্চক পুরোহিতদিগের রচিত জাল মাত্র। তখন তাঁহারা ভাবিতেন যে, সাধারণ লোকদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য প্রবঞ্চক পুরোহিতগণ ধর্ম নামে একটা মিথ্যা প্রবঞ্চনার জাল পাতিয়াছে। তৎপর এ ভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়া আর-এক ভাব আসিল।

বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জগতের জ্ঞানিগণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ধর্ম বাস্তবিক প্রবঞ্চক পুরোহিত-গণের প্রবঞ্চনার জাল নয়, কিন্তু উহা বিকৃত মানব-কল্পনা -প্রসূত অথবা উত্তেজিত মস্তিষ্ক -প্রসূত। অর্থাৎ মানুষ যেমন ডাইনে বিশ্বাস করে, তেমনই ধর্মে বিশ্বাস করে। পৃথিবীর অজ্ঞ ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরাই তাহাদের বিকৃত মস্তিষ্ক হইতে ধর্ম নামে একটা জিনিস উৎপন্ন করিয়াছে। এই ভাব যখন জ্ঞানিগণের মনে আসিল তখন তাঁহারা ভাবিলেন, ইহা সবলচিত্ত ব্যক্তিদিগের জন্য নয়, দুর্বল অজ্ঞ লোকদিগের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন। তখন তাঁহারা মনে করিলেন যে, স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগের জন্যই ধর্মের প্রয়োজন, জ্ঞানীদের জন্য নয়।

এই ভাব যখন প্রাণে আসিল তখন ধার্মিকগণ অবজ্ঞার পাত্র হইলেন, এবং পণ্ডিতগণ ধর্মকে ঘৃণার তলে রাখিতে চাহিলেন। পণ্ডিতেরা ভাবিলেন যে, ধর্ম হইল Superstition অর্থাৎ কুসংস্কার। এইজন্য একটা চলিত কথা আছে যে, Religion আর Superstition দুইই এক জিনিস, তবে Superstition is Religion out of

fashion, and Religion is Superstition in fashion— দুইই কুসংস্কার।

তৎপর বিগত শতাব্দীতে এ ভাবও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মানুষ বিবেচনা করিতেছে যে, যেমন মানুষের অপরাপর বিষয়—রাজকার্য, বিষয়-বাণিজ্য, আইন-আদালত প্রভৃতি বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ মানুষের ধর্মভাবও বিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। ধর্মকে বিবর্তনের ফলস্বরূপ দেখা যাইতেছে বলিয়া ইহা এক্ষণে পণ্ডিত-মণ্ডলীর গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি যে, পৃথিবীতে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহারাও ধর্মের উন্নতির ক্রম ও বিকাশ-প্রণালীর আলোচনাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। মহাত্মা হার্বার্ট স্পেন্সার-এর ন্যায় ব্যক্তিও এক্ষণে ধর্মের উন্নতি ও বিকাশের ক্রম পর্যালোচনা করিতেছেন। দেখিতেছি, পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানী-মহাজনেরা আগ্রহ সহকারে ধর্মের ইতিবৃত্ত পাঠে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই ত গেল বাহিরের জ্ঞানীদিগের ভাব, জগতের ধর্মসকলের ভিতরকার লোকদিগের ভাবেরও সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

প্রথম, ধর্মের সার্বভৌমিকতা।

আদিকালে এক-এক জাতি আপন-আপন ইষ্টদেবতাকে উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেমন পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সে কালে এক-একটি যাযাবর জাতির উপরে এক-একজন নেতা বা দলপতি থাকিতেন, সেইরূপ পূর্বকালে পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি এক-এক ক্ষুদ্র ইষ্টদেবতার কল্পনা করিয়া তাহারই পূজা করিত; এবং এরূপ বিশ্বাস করিত যে, সে ইষ্টদেবতা অপর সকল ইষ্টদেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন পুরাতন য়িহুদী জাতির ইষ্টদেবতা ছিলেন জাভে, পুরাতন হিন্দু জাতির ইষ্টদেবতা ছিলেন ইন্দ্র। য়িহুদীরা ভাবিতেন, জাভে সকল দেবতার

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আর্যগণ ভাবিতেন, ইন্দ্রের ন্যায় দেবতা নাই। যে জাতির যে ইষ্টদেবতা, তদ্‌ভিন্ন অপর সকলকে তাহারা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত ও উপহাস করিত। জাতিতে জাতিতে যেমন রাজ্য লইয়া বিরোধ ছিল, তেমনি স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট দেবতা লইয়াও বিরোধ ছিল। জাতীয় শত্রু যাহারা তাহারা ইষ্টদেবতাগণেরও শত্রু ছিল। কেবল যে আর্যগণ অনার্যদিগকে দ্বেষ করিতেন তাহা নহে, ইন্দ্রও তাহাদিগকে দ্বেষ করিতেন। মানুষ বন্ধুতার সচরাচর এই নিদর্শন দেখে যে, যিনি আমার বন্ধু তিনি আমার বন্ধুদিগকে প্রীতি করিবেন ও আমার শত্রুদিগকে দ্বেষ করিবেন, তাহা না হইলে আমার বন্ধু কি ? প্রাচীন জাতিসকল স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতিও এই বন্ধুতার ভাব আরোপ করিয়াছিল। ইহা হইতেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রাচীন কালের প্রত্যেক জাতি ভাবিয়াছে, ঈশ্বর যেন তাহাদের উপর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, আর অপর সকলকে বর্জন করিয়াছেন। এই ভাব হইতে তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, যাহা কিছু ভাল তাহাই বিধাতা কৃপা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর সকলকে তিনি সে কৃপাতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহারা ভাবিত যে, আমাদের স্বর্গ উত্তম, আমাদের ধর্ম উত্তম, এবং ধর্ম আমাদের একচেটিয়া। এই মত হইতে ভারতের হিন্দুরা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত. আর ম্লেচ্ছেরা তাঁহার বর্জিত। য়িহুদীরা ভাবিয়াছিলেন যে, যত কিছু ভাল কথা, যাহা কিছু ভাল জিনিস, সে সকল ভগবান্ তাঁহাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন, আর জেণ্টাইলদিগকে তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইসলাম-ধর্মাবলম্বী যাঁহারা তাঁহারা ভাবিতেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে বিশেষ কৃপা করিয়াছেন, আর কাফেরদিগকে তিনি দেখিতে পারেন না। প্রাচীন গ্রীকেরা ভাবিতেন যে, ধর্মের সমুদয়

সার কথা ভগবান্ তাঁহাদিগকে জানিতে দিয়াছেন, আর বার্বেরিয়ানদিগকে তৎসমুদয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে উক্ত মত পরিবর্তিত হইয়া এই মত প্রচারিত হইয়াছে যে, ধর্মের বিকাশ ও উন্নতি সকল জাতি-মধ্যেই ঘটিয়াছে। এখন আর মানুষ ভাবিতে পারে না যে, গুটিকতক বিশেষ কৃপা -লব্ধ মানুষের মধ্যে ভগবান্ সকল সার কথা নিহিত রাখিয়াছেন। এখন মানুষ অনিবার্য রূপে অনুভব করিতেছে যে, বিধাতা সর্বজাতি-মধ্যেই আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরের অভিব্যক্তি কোনও দেশ বা জাতি-বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে। জগতের ধর্মসকল অহংকারে প্রত্যেকে যতই স্ব স্ব -প্রধান হইয়া উঠুক না কেন, সকলেই এক নিয়মের অধীন। মানব-জাতি এক্ষণে অনুভব করিতেছে যে, যে ঈশ্বর সেই প্রাচীন কালে আর্য ঋষিগণের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি বিধান করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরই এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের মধ্যে বাস করিয়া বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। মানুষ এখন ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, জড়ে, চেতনে সর্বত্র একই সত্তার বিদ্যমানতা অনুভব করিতেছে।

বর্তমান যুগের আর-একটি লক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের একতা -জ্ঞান। এই একত্বের জ্ঞান এখন মানব-চিন্তাতে ফুটিয়াছে, একই শক্তিকে এখন মানব-জাতি বিভিন্ন আকারে দেখিতে শিখিয়াছে। এখন কি আর ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখা সম্ভব? আর কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিতে মানবের মন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? আর কি পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ লইয়া মানব-চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতে পারে? আর এ ব্রহ্মাণ্ডে দুই দশ বিশ বা ততোধিক শক্তি কল্পনা করিয়া মানবের মন তৃপ্ত হইতে পারে না। ঐ শুন, এক অনন্ত অখণ্ড বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মানবের স্তুতি উঠিতেছে।

ঐ দেখ, সেই মহা একেরই অভিমুখে মানবের চিন্তা ছুটিতেছে। কেবল যে জড়জগতে মানুষ তাঁহাকে এক বলিয়া দেখিতেছে তাহা নয়। মানব-ইতিবৃত্তে, আইন-আদালতে, বিষয়-বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মানবের চিন্তাজগতে, ভাবের আদানপ্রদানে, মানবের ধর্মভাবে সর্বত্রই মানুষ তাঁহাকে এক বলিয়া দেখিতেছে, সর্বত্রই মানুষ দেখিতেছে যে, মণিসকল যেমন সূত্রে বদ্ধ থাকে তেমনি একই সূত্রে সমুদয় বাঁধা রহিয়াছে।

বর্তমান যুগের আর-একটি ভাব মানব-জাতির একত্ব-জ্ঞান। নরতত্ত্বের যতই আলোচনা হইতেছে, মানব-ইতিবৃত্তের যতই অনুশীলন হইতেছে, ততই মানব-জাতি দেখিতেছে যে, মানব যেখানেই থাকুক, যে ভাবেই থাকুক, একপরিবারভুক্ত, একই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার অধীন। মানবের উন্নতির ক্রম সর্বত্রই এক। ঐ নগ্নকায় আন্দামান-দ্বীপবাসী বর্বর মানুষের উন্নতির ক্রমও যেরূপ, ঐ জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত সুসভ্য ইংরাজের উন্নতির ক্রমও ঠিক তদ্রূপ। ঐ সুসভ্য ইংরাজ এক সময়ে ঐ অসভ্য বর্বর মানুষের ন্যায় নগ্ন দেহে ছিল।

সুতরাং প্রাচীন কালে ধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে-সকল প্রাচীর ছিল, ধর্মের সংকীর্ণ যে-সকল সীমা ছিল, তাহা জগৎ হইতে তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। যে ইন্দ্র একদিন আর্যদের দেবতা ছিলেন এবং অনার্যদের উপরে কোপ বর্ষণ করিতেন, সেই ইন্দ্র গগন হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যে জাভে একদিন য়িহুদী জাতির উপাস্য ছিলেন আর সকলকে ঘৃণা করিতেন, সে জাভে মানব-সমাজ হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়াছেন। যত কিছু সংকীর্ণতা জগতে ছিল, যত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর জগতে ছিলেন, মানবের একত্ব-জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদয় কোথায় চলিয়া যাইতেছে। এখন আর ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখা সম্ভব নয়। এখন ধর্মের সমুদয় সংকীর্ণতা

জগৎ হইতে উঠিয়া যাইতেছে, সমুদয় ক্ষুদ্রতার প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। এ সকল ভাঙিয়া গিয়া এখন এক অনন্ত মহান্ পরমেশ্বর মানব-জ্ঞানে উথলিয়া উঠিতেছেন।

মানব-জাতি এক্ষণে অনুভব করিতেছে যে, সকলেই এক বিশাল মানব-পরিবারের সন্তান, পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমুদয় মানব-জাতির সাধারণ পিতা-মাতা, এই মেদিনী তাহাদের সাধারণ বাসগৃহ, আর তাহাদের অগ্রজ ভাই জগতের সকল দেশের ও সকল কালের সাধু মহাজনগণ। এই সার্বভৌমিকতার ভাব, ধর্মের এই মহৎ ভাব, ইহা নবযুগের এক সুমহৎ পরিবর্তন রূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি।

দুই প্রকারে এই একত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। প্রথম, Ethnological Studies-এ জগতের বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সমাজের উত্থান এবং উন্নতির ক্রম মানুষ এখন পাঠ করিতেছে। তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া মানুষ দেখিতেছে যে, মূলে মানব-জাতি এক। তৎপরে দ্বিতীয় আর-এক কারণ এই একত্বের ভাবকে বর্ধিত করিতেছে। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রসকল এক্ষণে মনোযোগ সহকারে পঠিত হইয়াছে। Sacred Books of the East প্রকাশিত হইয়া মানুষের একত্বের জ্ঞানকে ফুটাইয়া তুলিতেছে। এ-সকল মানুষ যতই পাঠ করিতেছে ততই দেখিতেছে যে, একই ধর্মভাব, একই ধর্মচিন্তা একই প্রণালী অনুসারে মানব-মনে ফুটিয়াছে। ধর্মের এই সার্বভৌমিক ভাব, এই উদার মহৎ ভাব মানবের জ্ঞানে ফুটিয়া এক মহা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে।

তৎপরে দ্বিতীয় ভাব দেখি ধর্মের স্বাধীনতা। এ বিষয়েও বিবর্তনের ক্রম আছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ও তৎপূর্ব শতাব্দীতে ধর্ম ছিল গুরুপুরোহিতের অধীন। ইউরোপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা

যায় যে, সেখানে ধর্ম ছিল পোপের অধীন। কেবল যে ইউরোপেই এইরূপ অধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই নহে, আমাদের দেশেও পূর্বে ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণদিগের অধীন। ইউরোপের ধর্মাচার্যগণের ন্যায় এখানেও তাঁহারা ছিলেন ধর্মের রক্ষক। সমুদয় সত্য ঈশ্বর যেন তাঁহাদের হাতে রাখিয়াছিলেন। ধর্ম পাইতে হইলে ঐ ব্রাহ্মণদের শরণাপন্ন হইতে হইত।

তৎপরে এ ভাব পরিবর্তিত হইয়া আর-এক ভাব এই আসিল যে, ধর্ম কতকগুলি মতের ও শাস্ত্রের অধীন। ইউরোপে দেখা যায় যে, মার্টিন লুথারের সংস্কারের প্রভাবে যখন পোপের অধীনতা হইতে ধর্মকে উদ্ধার করা হইল, তখন ধর্ম বিশেষ গ্রন্থ এবং বিশেষ মতের মধ্যে আবদ্ধ হইল। তৎসমুদয়কে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। এককালে যেমন মানুষ মনে করিত যে, গুরু ও পুরোহিতগণকে ছাড়িয়া ধর্মের থাকা সম্ভব নয়, তেমনই আর-এক সময়ে মানুষ মনে করিতে লাগিল যে, বিশেষ গ্রন্থ ও শাস্ত্রসংগত কতকগুলি মতই ধর্মের প্রধান অঙ্গ।

এই মতপ্রধান ধর্মভাব এখনও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন মানুষ এখনও বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু সশরীরে আবার অবতীর্ণ হইবেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, স্বর্গ ও নরক এ-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না, বাইবেলকে অস্বীকার করিয়া মানুষের ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়।

তেমনি আমাদের দেশেও এক সময় লোকে ভাবিত, এখনও বহু বহুসংখ্যক লোকে ভাবে যে, বেদকে ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ণাশ্রমকে পরিত্যাগ করিয়া, জাতিভেদ না মানিয়া ধর্ম যে আবার থাকিতে পারে, তাহা আমাদের

দেশের লোক ধারণাই করিতে পারে না। মানুষ যে ভাবের মধ্যে বর্ধিত হয়, গুরুজনদিগের উপদেশে যেটা সর্বদা শুনিতে পায়, সেটাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে বড় কম লোকই পারে। আমাদের দেশে বহুকাল ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অবরোধের মধ্যে রাখাতে মানুষ বালককাল হইতে নারীজাতিকে অবরোধে দেখিয়া দেখিয়া এই বিশ্বাসে বর্ধিত হয়, যেন নারীগণ অবরোধে অবরুদ্ধ না থাকিলে সমাজ থাকিতে পারে না। মানবের বদ্ধমূল সংস্কারের এমনি শক্তি।

মহাত্মা রামমোহন রায় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেল হইতে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া Precepts of Jesus নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যীশুর অলৌকিক ক্রিয়ার অংশগুলি বাদ দিয়া তাঁহার উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায় বাইবেলের বিশুদ্ধ সত্যসকলকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে, খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে দিনদিন পূর্বপ্রচারিত মতগুলি তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। এখন খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যীশুর আধ্যাত্মিক ভাবের উপরেই অধিক মনোযোগ দিতেছেন। এখন আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহারা বাইবেলের অনেক মত বর্জন করিয়া সার সত্য-সকল জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার নাম Teachings of Jesus in his own words। তাহাতে তিনি বাইবেল হইতে যীশুর উপদেশসকল সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সেই পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি, ধর্ম ক্রমে গুরু, পুরোহিত, আচার্য, গ্রন্থ, শাস্ত্র, মত এ-সকলের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন ভাব ধারণ করিতেছে। অতএব ধর্মের স্বাধীনতা এ যুগের একটি প্রধান লক্ষণ।

তৃতীয়ত, ধর্মের আধ্যাত্মিকতা। ইহা নবযুগের তৃতীয় লক্ষণ।

এ বিষয়েও ধর্মের বিবর্তনের ক্রম আছে। সর্বাগ্রে ছিল ধর্ম ক্রিয়াকাণ্ডের অধীন। সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। এখনও পর্যন্ত প্রাচীনেরা মনে করেন যে, ধার্মিক হইতে হইলে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ধর্ম কতকগুলি বাহ্যিক নিয়মপালনের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নবযুগে ক্রিয়াকলাপের ধর্ম হইতে চক্ষু তুলিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

আধ্যাত্মিক ধর্মের প্রধান ভাব এই— মানব জীবনের উপরে যে ধর্ম নিয়ম নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, যে মহা ধর্ম-নিয়মের দ্বারা মানব-জীবন শাসিত হইতেছে, তাহার অধীন হওয়াই ধর্মের প্রধান সাধন। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিন যে কথা প্রচার করিয়া আসিতেছেন, এই নবযুগে আমরা সেই কথারই সাক্ষ্য পাইতেছি। মহাপুরুষদিগের উক্তিসকল মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে দেখি, তাহারও ভিতরকার কথা এই। মানব-প্রকৃতির অন্তরালে যে শাসনশক্তি রহিয়াছে, যাহা জনসমাজকে ভাঙিয়া যাইতে দেয় না, সেই যে ধর্মশাসন, তাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করা, এবং তাহার হাতে আত্মসমর্পণ করার নামই ধর্ম। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি সকল মহাজনই এই এক কথা বলিয়াছেন। সকলেই দেখি দুইটি মাত্র সত্য, মানব-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। প্রথম তাঁহারা বলিলেন, "হে মানুষ, তোমার জীবনের পশ্চাতে যে ধর্মশাসন বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি তাহাকে সত্য বলিয়া দর্শন কর।" দ্বিতীয়

কথা এই বলিলেন যে, "আত্ম-বিলোপ করিয়া সেই শক্তির হস্তে তুমি আপনাকে সমর্পণ কর।" সকল সাধুই এই দুই কথা বলিয়াছেন।

ধর্মের এই যে মহান্ আদর্শ, এই আদর্শকে সকল সাধুই প্রাণে ধরিয়াছিলেন। যীশু ইহাকে বলিয়াছিলেন Kingdom of God', বুদ্ধ ইহাকে বলিয়াছিলেন 'ধর্ম', মহম্মদ বলিয়াছিলেন 'আল্লা হো আকবর'। সকলেরই এক কথা, "তোমরা আপনাকে ভুলিয়া যাও, বাসনাকে বিনাশ কর, আপনাকে সংযত করিয়া জগতের অন্তরালবর্তী ঐ ধর্মনিয়মের অধীন হও।" কিরূপে অধীন হইবে? বুদ্ধ বলিলেন, "যোগের দ্বারা তোমরা বাসনার বিনাশ কর, করিয়া জ্ঞানযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হও।" যীশু বলিলেন, "প্রেমের দ্বারা; প্রেমেতে তোমরা তাঁহার অধীন হও।" এই প্রেমের ভাবে দেখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহম্মদ বলিলেন, "ভয়ের দ্বারা; ভয়েতে তোমরা তাঁহার অধীন হও, না যদি হও তবে ঘোর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, যাইবে কোথায়?" এই আত্মসমর্পণ-মূলক আধ্যাত্মিক ভাব নবযুগে ধর্মের মধ্যে ফুটিতেছে। ক্রিয়াবহুল ধর্মের পরিবর্তে প্রীতিপ্রধান ও নীতিপ্রধান ধর্মের অভ্যুদয় হইতেছে।

নবযুগে ধর্মের চতুর্থ ভাব মানব-হিতৈষণা।

অগ্রে মানুষের ধারণা ছিল, মানব-প্রকৃতি ও মানব-সমাজ ধর্মের বিরোধী; ধর্ম লাভ করিতে হইলে এতদুভয়কে ঘৃণা করিয়া ও বর্জন করিয়া অরণ্যে যাইতে হয়। এ ভাব যে কেবল আমাদের দেশেই ছিল তাহা নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্মের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানেও পূর্বে মানুষ মনে করিত যে, এই শরীর ধর্মলাভের পক্ষে এক মহা অন্তরায়; ধর্মলাভ করিতে হইলে ইহাকে নিগ্রহ করা আবশ্যক, ইহাকে সাজা দেওয়া প্রয়োজন। আত্মা ঈশ্বরের কেল্লা,

শরীর শয়তানের কেল্লা, শরীরকে সাজা না দিলে মানুষ প্রকৃত ধর্ম লাভ করিতে পারে না। অতএব এই শরীরকে সাজা দাও, মনকে ক্লেশ দাও, জনসমাজ হইতে ইহাকে দূরে লইয়া যাও; সহজে যদি না যাইতে চায়, তবে বলপূর্বক ছিঁড়িয়া লইয়া যাও। এই যে মানব-প্রকৃতির প্রতি ঘৃণা, ইহা আমাদের দেশে এক আকারে ফুটিয়াছে, আর পশ্চিম দেশে আর-এক আকারে ফুটিয়াছে।

আমাদের দেশে অদ্বৈতবাদ বহুলপরিমাণে প্রচার হওয়াতে এই ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় এ দেশের লোকের মনে প্রবেশ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদ মানব-প্রকৃতি ও মানব-জীবনকে কুৎসিত করিয়া দিয়াছে।

হায় রে, কে এ জাতির চক্ষে এমন বিষাদের চশমা পরাইয়া দিল! যাহারা শিশুর ন্যায় পবিত্রচিত্ত ছিল, যাহারা বালকের ন্যায় সরল চিত্তে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখিত, যাহারা বর্ষাকালের ভেকের ধ্বনির মধ্যে একপ্রকার সুস্বর অনুভব করিত, কে তাহাদের চক্ষে এমন বিষাদের চশমা পরাইয়া দিল যে, আর তাহারা পূর্বের ন্যায় সরল ভাবে প্রকৃতিকে দেখিতে পারিল না। সকলই বদলাইয়া গেল। যেখানে আশা ছিল সেখানে নিরাশা দেখা দিল। যেখানে উৎসাহ ছিল সেখানে নিরুৎসাহ আসিল। যেখানে উদ্যম ছিল সেখানে মানুষ নিরুদ্যমে ডুবিল। অদৃষ্টের উপরে মানুষ নির্ভর করিতে শিখিল। মানুষ মনে করিতে লাগিল, কপালে যাহা আছে তাহা হইবেই। যেন কি এক ঘন নিগড়ে সকলেই বাঁধা রহিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই যে, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাকে খণ্ডন করিতে পারে।

এই অদৃষ্টবাদ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া মানুষকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। এখন মানুষ কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য হইলে মনে করে যে, কপালে ছিল, দুঃখ করিলে কি হইবে? নারীজাতির মধ্যে ইহা ঘোর

বিষাদের ভাব আনয়ন করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, কপালে যাহা আছে তাহা ত হইবেই, ভাবিয়া কি হইবে? দরিদ্র ব্যক্তি মনে করে, বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা সহ্য করিতে হইবেই।

আবার খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ধর্মকে পূর্বে অতিনৈসর্গিক মনে করা হইত। তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম মানবের পক্ষে এক অতিনৈসর্গিক বস্তু। এই অতিনৈসর্গিক হইতে এক্ষণে অনৈসর্গিক হইয়াছে।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্বে ধর্মকে মানব-সমাজ-বিরোধী ও মানব-প্রকৃতি-বিরোধী মনে করা হইত। সকলেই মনে করিতেন, ধর্ম সংসারের উপযোগী নয়। তৎপরে এই ভাব আসিল যে, ধর্ম মানবের পারলৌকিক কল্যাণেরই জন্য। সুতরাং তখন মানুষের দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা এই আসিল যে, ইহজগতে থাকিয়া পারত্রিকতা অভ্যাস করিতে হইবে। Worldliness-এর মধ্যে বাস করিয়া Other-worldliness লাভ করিতে হইবে। ঐহিক জীবনে থাকিয়া পারলৌকিক সদ্‌গতির উপায় বিধান করিবার ভাব মধ্যযুগে প্রবল।

কিন্তু বর্তমানে এ ভাবও অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এই নবযুগে আমরা আর-এক ভাব প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা এই যে, জনসমাজে থাকিয়াই মানুষ ধর্ম উপার্জন করিতে সক্ষম। এখন মানুষ ভাবে যে, ধর্ম লাভ করিতে হইলে যে জনসমাজ বর্জন করা আবশ্যক তাহা নয়। জনসমাজে বাস করিয়াই ধর্ম পাইতে হয় নতুবা হয় না। দেখ, কত পরিবর্তন। প্রাচীনেরা বলিয়াছিলেন যে, জনসমাজে থাকিয়া ধর্ম হয় না; মধ্যযুগের লোকেরা বলিলেন যে, জনসমাজে থাকিয়াও ধর্ম হয়; নবযুগের লোকেরা বলিতেছেন যে, জনসমাজে থাকিয়াই ধর্ম হয়, জনসমাজ ত্যাগ করিলে হয় না। দেখ, এই তিনে কত প্রভেদ। প্রাচীন কালের

লোকেরা বলিলেন, ধর্মসাধনের ক্ষেত্র জনসমাজের বাহিরে। মধ্যযুগের লোকেরা বলিলেন, জনসমাজ ও বাহির এ উভয়ই ধর্মসাধনের ক্ষেত্র। আর নবযুগের লোকেরা বলিতেছেন, জনসমাজই ধর্মসাধনের স্থান।

এই নবযুগের আদর্শ পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় মূলসূত্র এই ছিল যে, The service of man is the service of God— মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। আমরা এখন সভ্যজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, ধর্মের এই নবভাব, এই মহাভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহার প্রধান প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের প্রধান চেষ্টা, প্রধান সংগ্রাম এই দিকে। এখনকার ধর্মসকলেরই প্রধান উদ্দেশ্য নরসেবা। মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইবার জন্য, মানুষকে শুভকার্যে রত করিবার জন্য সকলেই প্রয়াস পাইতেছেন। সকলেই যেন মনে করিতেছেন যে, ধর্মের প্রধান কার্য মানবের সেবা। নরদুঃখ-কাতরতা এক্ষণে জগতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জগতের জাতিসকল এখন অনুভব করিতেছে যে, তাহারা সকলে এক। এখন আর কোনও এক জাতি আপনাদের স্বার্থ লইয়া ভুলিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এই মানব-হিতৈষণার ভাব এই নবযুগের ধর্মভাবে প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

অতএব আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে চারিটি নবভাব মানবের ধর্ম-ভাবকে অধিকার করিতেছে— সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিকতা, নর-হিতৈষণা। নবযুগের মানবের জন্য যে ধর্মভাব আসিতেছে তাহাতে এই চারিটিই প্রাধান্য লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২ মাঘ ১৮২২ শক। ১৯০১ খ্রী

ধর্মে ভাঙা ও গড়া

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হতে যে-সকল সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমরা অবগত হতে পারছি, শুধু ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় নয়, অন্যান্য দেশেও দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সময়ে সে-সব দেশে liberal religion নামে এক নূতন ধর্ম জেগে উঠছে। Liberal religion-এর অর্থ হচ্ছে—ধর্মেতে যাঁরা স্বাভাবিক চিন্তা অবলম্বন করছেন, যাঁরা অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ ক'রে মানব-চিন্তাকে স্বাভাবিক ধর্মনিয়মের উপরে স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন, মানবের চিন্তাকে অপর সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত ক'রে স্বাভাবিকতার উপরে স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের যে-সকল মত, চিরপ্রচলিত বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজেরা চিন্তা ক'রে যাঁরা ধর্মের তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেন, তাঁদের যে-সকল মত, তাই হ'ল liberal religion।

স্বর্গীয় ডাক্তার মার্টিনো, যাঁর অনেক শিষ্য আমাদের মধ্যে আছেন, যিনি বর্তমান কালে ধর্মজগতে স্বাধীন চিন্তা-জীবীদের একজন প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি একজন liberal religionist ছিলেন। তাঁর একখানা প্রধান পুস্তক আছে, বোধ হয় অনেকে সেখানা প'ড়ে থাকবেন। তার নাম হচ্ছে Seat of Authority in Religion। সেই পুস্তকে ডাক্তার মার্টিনো এই প্রশ্ন তুলেছেন এবং মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন যে, আবহমান কাল হতে ধর্মের যে সব authoritative seat ছিল, বর্তমান কালে সে-সকল আর থাকতে পারছে না। এখন সে সমুদয় উঠে গিয়ে ধর্ম উদার ও স্বাভাবিক ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হতে চেষ্টা করছে। কিন্তু এখন ধর্মে authority

তবে কি হবে? প্রাচীন authority যা ছিল, তা যদি না মান, তবে বর্তমানে কোন্ authoritive seat-এর উপরে মানুষ দাঁড়াবে? এই প্রশ্ন ডাক্তার মার্টিনো তাঁর পুস্তকে তুলেছেন। তুলে বলেছেন যে, মানুষ সেই প্রাচীন মত আবার মানবে তা আর সম্ভব নয়। পুরাতন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে যে মানুষ আপনাকে পুনরায় আবদ্ধ ক'রে রাখবে, তা আশা করা যায় না। কারণ এই যে, জগদীশ্বরের সৃষ্টির এক বিশেষ নিয়ম এই দেখা যায় যে, নূতন নূতন সত্য লাভের সঙ্গে পুরাতন চিন্তা ও ভাব মানবের মন হতে খ'সে প'ড়ে যায়। মানুষ বর্তমান সময়ে বুদ্ধির ও জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে উচ্চ ও নবীন সত্যের সাক্ষাৎকার করছে, সুতরাং ধর্মের যে-সকল পুরাতন ভিত্তি ছিল, তা আর থাকতে পারছে না।

কিন্তু এই একটা গুরুতর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, এখন আর পূর্বের ন্যায় গভীর, নিষ্ঠাবান্ ধর্মজীবন বাহির হতে পারছে না। কেন পারছে না, তা ঠিক ক'রে বলা যায় না; কিন্তু ইহা একটি অতি গভীর প্রশ্ন। আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে যেরূপে নিষ্ঠাবান্ গভীর ধর্মজীবন -সম্পন্ন লোক দেখা গিয়েছিল, এখন আর তা দেখা যাচ্ছে না। যীশুর শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে এমন সকল ধর্মজীবনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, যাঁদের নিষ্ঠা ও ভক্তির কথা স্মরণ করলে আমাদের মন আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন আর তা হচ্ছে না।

এখন অনেক লোক প্রাচীন সংস্কারসকল পরিত্যাগ করেছেন, অভ্রান্ত গুরু এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র এ উভয় বর্জন করেছেন এবং স্বাধীন ভাবে ধর্মের মূল ভাব জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। এ-ভাবাপন্ন লোক এক্ষণে ইংরাজ সমাজে অনেক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে। ইংরাজ সমাজে বর্তমান সময়ে Unitarian নাম নিয়ে যে এক দল উঠেছেন

তাঁদের মধ্যে এমন সকল উদারভাবাপন্ন লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের কোনই প্রভেদ নেই। যেমন এখানে Mr. Williams এসেছিলেন, আমরা দেখেছি তাঁর সঙ্গে আমাদের মতগত কোনওই প্রভেদ ছিল না; তাঁর কথা অনেক ব্রাহ্মেরই মনে আছে। আর-এক দল লোক বর্তমান সময়ে ইংলণ্ডে উঠেছেন, তাঁদের নাম Free Church Christians। আমি ইংলণ্ডে তাঁদের সঙ্গে বাস ক'রে দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মতে কোনওই প্রভেদ নাই। তাঁরা যেন একেবারে ব্রাহ্ম।

কিন্তু একটা জায়গায় এই সব দল হেরে যাচ্ছেন। যাঁরা Orthodox Church-এর লোক অর্থাৎ যাঁরা গোঁড়া খ্রীষ্টান, তাঁদের মধ্যে যে -রকম উৎকৃষ্ট ধর্মজীবন দেখা যায়, এই liberal দলের লোকদের মধ্যে সে রকম লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ কি? এ একটা গভীর ভাবে চিন্তা করবার বিষয়। এই সব liberal দলের যত লোক, তাঁরা জ্ঞানাংশে যত উন্নত হচ্ছেন, চরিত্রাংশে তা হতে পারছেন না। তাঁরা সে রকম চরিত্রবান্ হতে পারছেন না, যে রকম তাঁরা জ্ঞানবান্ হয়ে উঠছেন। জীবনের মহৎ মহৎ বিষয়ে তাঁরা তত বড় হয়ে উঠতে পারছেন না। Culture-এর দিক্ দিয়ে তাঁদের জীবন যত উচ্চ হচ্ছে, অন্যান্য মহৎ-গুণে তা হচ্ছে না। Culture-এতে ইংলণ্ডে Unitarianগণ অগ্রগণ্য, কিন্তু চরিত্রাংশে এঁরা যেন কিছু হীন। মহৎ মানুষ এঁদের ভিতর হতে তেমন উঠছে না যেমন জ্ঞানী লোক বেরুচ্ছে। এর কারণ কি তা বিশেষ করে বলা যায় না।

দুটি বিষয়ে দেখছি এঁরা যেন হেরে যাচ্ছেন। প্রথম, organisation-এর শক্তিতে এঁরা যেন পেরে উঠছেন না। দশজনে মিলে একমন একপ্রাণ হয়ে কাজ করবার শক্তি এঁদের মধ্যে তেমন ফুটে উঠছে না। দ্বিতীয়, প্রাণের উন্নত মহৎ ভাব- সকলকে এঁরা তেমন ফুটিয়ে তুলতে

পারছেন না। উন্নত মহৎ মানুষ হয়ে মানুষের হৃদয়ের মহদ্‌ভাব-সকলকে জাগিয়ে তোলা, তাও এঁরা তেমন পেরে উঠছেন না।

প্রথম, একমন একপ্রাণ হয়ে দশজনে মিলে কাজ করবার শক্তি। এ যে শুধু এঁরা পারছেন না, তা নয়; সব উদারভাবাপন্ন লোকদের মধ্যেই যেন এটা দেখা যাচ্ছে। ধর্মের ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তা হলে এ ভাব আরও পরিষ্কার রূপে দেখতে পাই। মহাত্মা গ্লাডস্টোনের মৃত্যুর পর হতে দেখা যাচ্ছে, একতার ভাব যেন উদারনৈতিক দলের ভিতর হতে একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। মহাত্মা রোজবেরির সঙ্গে হারকোর্ট, হারকোর্টের সঙ্গে মর্লি, মর্লির সঙ্গে ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান— এঁরা সকলে যেন কোনও রকমেই এক হতে পারছেন না। Liberal দলের লোক মিলতে পারে না; কেন যে মিলতে পারে না, তা জানি নে। Conservative দলের মধ্যে কিন্তু এ ভাব নাই। তারা কেমন শান্তিতে আরামে দশজনে এক হয়ে কাজ করতে পারে। আর liberal দল এক-একটা সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে দূরে দূরে স'রে পড়ছে।

Liberal religion-এও এই রকম দেখা যাচ্ছে। মার্টিনোর গ্রন্থ পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি এক-একটা সামান্য সামান্য প্রশ্ন তুলে তার বিচার করতে এত সময় দিয়েছেন যে, তা পড়লে মনে হয় অন্যদের পক্ষে যেন সেরূপ করা একপ্রকার অসম্ভব। সামান্য সামান্য মতভেদ নিয়ে, সামান্য সামান্য মত নিয়ে এক-এক দল এক-একটি group হয়ে পড়েছেন, পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন না। যেমন আমাদের নববিধানী বন্ধুদের মধ্যে দেখা যায়, তাঁরা একমুঠা মানুষ, তার মধ্যে আবার কত দল। তাঁরাও ঐ রকম সামান্য সামান্য মত-

পার্থক্য নিয়ে পরস্পর হতে পৃথক্ হয়ে পড়েছেন। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অতটুকু হয় না। আমরা ঈশ্বর করুণাতে শুভ মুহূর্তে ব'সে একটা constitution ক'রে নিয়েছি, সেইটি আছে ব'লে আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ হ'ক না কেন, আমরা সকলে এসে যেন এক জায়গায় দাঁড়াতে পারছি। এক কাজে আমরা সকলে মিলতে পারছি।

কিন্তু যদিও আমরা মিলতে পারছি বটে, এতে কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট নই। আমাদের মধ্যে যে-সব মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো যদি না থাকত, আমরা যদি সমুদয় ভুলে গিয়ে এক সঙ্গে মিলতে পারতাম, তা হলে আমাদের শক্তি আরও ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারত। যেমন রক্ষণশীলদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের মধ্যে যেন একটা long pull, একটা strong pull আছে, যাতে তাদের সব মতভেদ মিলিয়ে নেয়, তেমনি যদি আমাদের মধ্যে থাকত— যেমন মুটেদের মধ্যে দেখেছি এক-এক সময়ে একেবারে ২০০।৪০০ লোক এক হয়ে একটা ধর্মঘট করে, শত শত লোক এক হয়ে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে মিলে যায়, তেমনি ক'রে যদি আমরা মিলতে পারতাম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি আমাদের মধ্যে এমন শক্তি জেগে উঠত, যার প্রভাব বাঙ্গালা দেশের লোকের এমন সাধ্য ছিল না যে সহ্য করে। মতভেদ নিয়ে আমরাও ছোট ছোট group-এ বিভক্ত হয়ে পড়ছি ব'লে আমাদেরও শক্তি জাগছে না। এই এক মহা অনিষ্ট।

দ্বিতীয়, স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি, প্রচারের উৎসাহ এ-সকল ভাল ক'রে ফুটছে না। ফাদার দামিয়ান কুষ্ঠরোগীদের জন্যে প্রাণ হারালেন, তার পর শোনা গেল, অপর পাঁচজন লোক গিয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করবার জন্য। অন্যান্য স্থানেও এই ভাব দেখা গিয়েছে। Fiji island-এ যখন সর্বপ্রথমে একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক

গেলেন, তাঁকে ত সেখানকার লোকেরা খেয়ে ফেললে। শোনা গেল যে, তারা নরমাংস খায়। অমনি অপর দশজন লোক গিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। বর্তমান সময়ে জগতের বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করলে দেখা যায়, যে-সব স্থানে সভ্য মানুষ পা দিতে সাহসী হয় নাই, সেখানে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা আগে গিয়েছেন। মধ্য আসিয়ার যে সব জঙ্গলময় স্থান, সেখানেও দেখা যায়, সৈন্য যাবার আগে, সভ্য মানুষ সে-সব জায়গায় পা দেবার পূর্বে সেখানে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা গিয়েছেন। তাঁরা সেখানে খেটেছেন, মরেছেন, তার পর সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ লুণ্ঠন করতে গিয়েছে। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ সেই সব দুর্গম, অতি দুর্গম স্থানে আগে গিয়েছেন, তার পর আর যা কিছু সভ্যতার আয়োজন ও স্রোত, সব পরে গিয়েছে। এঁরা যে রকম কষ্ট স্বীকার করেছেন, এঁরা যীশুর নাম প্রচার করবার জন্যে যে রকম দৈন্য বহন করেছেন, তা ভাবলে অবাক্ হতে হয়, হৃদয়মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়।

কিন্তু liberal religion-এর মানুষদের কেন তেমন হয় না? তাঁদের মধ্যে কেন এ ভাবটা আসে না? তাঁদের মধ্যে কেন এ প্রকার স্বার্থ-নাশের শক্তি, এ প্রকার প্রচারোৎসাহ দেখা যাচ্ছে না? এ একটা অতি কঠিন প্রশ্ন। আমি liberal religion-এর মানুষ বলতে কিন্তু এখানে থিওডোর পার্কার, ডাক্তার মার্টিনো এঁদের বুঝাই না। আমি এখন সাধারণ ভাবে কথা বলছি। থিওডোর পার্কারের নাম আমরা সকলেই জানি, তাঁর কথা স্মরণ করলে আমাদের পায়ের নখ হতে মাথার চুল পর্যন্ত ভক্তিতে পূর্ণ হয়। তাঁহাদের জীবন অতি উৎকৃষ্ট, তাঁহাদের চরিত্র, তাঁহাদের যে উন্নত ধর্মভাব, তার কথা স্মরণ করলেও আমাদের মন ভক্তিতে পূর্ণ হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এঁদের মধ্যে সে প্রকার উৎকৃষ্ট ধর্মজীবন প্রস্ফুটিত হতে

পারছে না, যা দেখে মানুষের এই সব ধর্মসম্প্রদায়ের উপরে ভক্তি জন্মাতে পারে। জলন্ত আগুনের মত প্রচারোৎসাহ, উৎকৃষ্ট উন্নত ধর্মজীবন, এ-সকল liberal religion-এর মানুষদের মধ্যে আসতে পারছে না। এ-সব বিষয়ে liberal religion যেন fail করছে। রোমান ক্যাথলিকদের ত কথাই নাই, তাঁদের কাছে এঁরা ত হেরে গিয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য যে-সব ধর্মসম্প্রদায়, তাঁদের কাছেও এঁরা হেরে গিয়েছেন। তবে কি বলব যে, এঁরা যে-সব পথ ধরেছেন তা ভ্রান্ত? এঁরা জ্ঞানাংশে যত বড় হয়ে উঠেছেন, চরিত্রাংশে ততই যেন পশ্চাৎপদ হয়ে যাচ্ছেন। ধর্মে স্বাধীন চিন্তার শক্তি, স্বাধীন ভাবে কাজ করবার প্রবৃত্তি যে পরিমাণে প্রবল হচ্ছে, আত্মসমর্পণের ভাব, প্রচারের উৎসাহ এ-সকল যেন সেই পরিমাণে ক'মে যাচ্ছে। কেন এ রকম হয়?

আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন সেখানে Dr. Stanton Coit ব'লে একজন লোক আমেরিকা হতে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি Ethical Culturist নামে এক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানুষকে নীতিমান্ হতে হলে ধর্মমতে বিশ্বাস করতে হয় না। ঈশ্বর মানা আর না-মানার উপরে এর কিছুই নির্ভর করে না। যীশুর অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করেন, এমন অনেক লোক তাঁদের মধ্যে আছেন। তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। এঁদের নাম হচ্ছে Ethical Culturists। (এঁদের একজন ব্রাহ্মসাধারণের কাছে সুপরিচিত। তাঁর নাম হচ্ছে Moncure D. Conway, তিনি Sacred Anthropology ব'লে বই লিখেছেন। ব্রাহ্ম মাত্রেই তা পড়ে থাকবেন)। যে সময়ে আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন তিনি Hinchbury Chapel-এ উদারনৈতিক উপদেশসকল দিতেন। এখন সেখানে নাস্তিকেরাও উপদেশ দেন। এই Ethical Culturist-সম্প্রদায়ভুক্ত

লোকেরা বলেন, যারা ঈশ্বর মানে না, যারা 'এই জগতের একজন প্রভু আছেন' এ সত্যে বিশ্বাস করে না, তারাও কেন অপর খ্রীষ্টানদের ন্যায় সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ হবে না? তারা কেন চরিত্র বিষয়ে খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা হীন হবে, তারও কারণ এঁরা খুঁজে পান না।

ডাক্তার কয়েট্ আমাকে বলেছিলেন, "ঐ-সকল গুণ কেন আমাদের মধ্যেও আসবে না, তা আমি জানি না।" তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমরা অপেক্ষা কর। দেখ, আমরা এমন আগুন জ্বালব, যাতে লোকসকল নীতিমান্, সত্যপ্রিয় হয়ে উঠবেই উঠবে।"

সে আজ পনর বৎসরের কথা। তার পর এ পর্যন্ত আমি সংবাদ পাই নাই যে, তাঁরা East London-এ বড় কিছু করতে পেরেছেন। East London হচ্ছে গরিব লোকদের জায়গা; গরিব শ্রমজীবী লোক, তারাই সব সেখানে থাকে। সেইখানে খ্রীষ্টানেরা অনেক কাজ করেছেন; গরিবদের জন্য সেখানে তাঁরা পাঠাগার করেছেন, সেখানে Zenruly Hall বলে এক Hall আছে, সেও orthodox খ্রীষ্টানেরা করেছেন। তাদের উন্নতির জন্য যে-সব কাজ তা orthodox খ্রীষ্টানেরাই সেখানে করেছেন। অনেক orthodox খ্রীষ্টান সেখানে আছেন। কিন্তু তাঁরা যা করেছেন, এই উদারনৈতিক দলের লোকেরা তা করতে পারছেন না। Orthodox দলের লোকেরা যে-সব বড় বড় লোক-হিতকর কাজ করছেন, এই সব liberal দলের লোকেরা তা করতে পারছেন না। কেন পারছেন না, তা এক গভীর প্রশ্ন।

আমি যতই চিন্তা করে দেখেছি, ইহার একটি প্রধান কারণ আমার মনে হয়েছে। সেটি ডাক্তার মার্টিনোর একটি কথাতে আমি সর্বপ্রথমে অনুভব করেছিলাম। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, Unitarian এই কথাটা আমি ভালবাসি না। কারণ এই যে, এটা

আমাদের মিলনের ভূমি হতে পারে না, কখনই পারে না। Unitarian কে ? না, যে Trinitarian নয়, যে যীশুর অলৌকিকত্ব ছেড়েছে, যে তাঁর অবতারত্ব মানে না, যে ব্যক্তি কুসংস্কার মানে না, ইত্যাদি। এই যে একটা ভাঙার ভাব, এটা খারাপ। ঐ নামটা এমনি, যাতে ঐ ভাবটা আমাদের মনে এনে দেয়, সেইজন্যে আমি ও নামটা ভালবাসি না।"

ও নামটাই ভাল নয়। ও ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যদি এমন একটা নাম নিতেন, যাতে এই ভাবটা মনে এনে দেয় যে, Unitarian মানে সেই ব্যক্তি যে ঈশ্বরকে চায়, যে সত্যেতে প্রাণ দিয়েছে, যে ঈশ্বরের চরণে আপনাকে দিবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে— এ রকম ভাব যদি আনত, এ রকম ভাব যদি ঐ নামটাতে এনে দিত, তা হলে ভাল ছিল। তা না হয়ে যাতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আমি কি ছেড়েছি, আমি কি বর্জন করেছি, আমি কি পরিত্যাগ করেছি, এ রকম ভাবটা আমাদের মিলনের ভূমি হতেই পারে না। এতে we get spiritually starved ; এ তাঁর ভাষা বলছি। তিনি বললেন যে, "এতে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুকিয়ে যায়। অতএব যারা কুসংস্কার ছেড়েছে, যারা বর্জন করেছে, এ ভাব ভাল নয়। এতে আমাদের Unitarian-ism-এর মহা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।"

মার্টিনোর কথার ভিতরে প্রবেশ করলে মনে হয়, বাস্তবিকই তাই। যে বলে, "আমি ছেড়েছি, আমি ভেঙেছি, আমি কিছু বর্জন করেছি"— এই রকম কথা যে বলে এবং এই ভাবটা যার মনে প্রবল থাকে, তার আধ্যাত্মিক জীবন উন্নত হয়ে ওঠে না। এ ভাবটা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির অনুকূল নয়। এ কথায় মন দিন সকলে। এ ভাব কোনও প্রকারেই মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের সহায় হতে পারে না। কারণ কি ? না, তার মনে এমন কতকগুলি ভাব থাকে, এতে এমন

কতকগুলি ভাব তার মনে এনে দেয়, যে ভাব সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম-ভাবের বিরোধী।

এমন উৎকট ভাব যদি আমাদের মনে থাকে যে, "ওরা যা করে আমরা তা করি না, ওরা যেমন আমরা তেমন নই, ওরা মন্দ আমরা ভাল", এরূপ কোনও উৎকট তীব্র ভাব যদি মনে থাকে, তবে তার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ধর্মভাব জন্মাবার সুবিধা হয় না। তাতে অহংকার আসে, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে অহংকার আসে। বাইবেলে মহাত্মা যীশু একজন pharisee এবং অপর একজন লোক, এই দুইএর দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন বলেছেন।

তিনি বলেছেন, মনে কর, ঈশ্বরের মন্দিরে দুইজন লোক প্রবেশ করল, তার মধ্যে একজন pharisee বা ধর্মযাজক; সে ব্যক্তি ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে বলছে, "হে ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে অপর পাপীদের মত কর নাই, আমাকে ওদের দলে রাখ নাই, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি।" এই একজন বলছে। আর-একজন আছে, সে জানে সে একটা পাপী, সে বলছে, "হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমি তোমাকে ডাকবার অধিকারী নই।" এই একজন বলছে।

যীশু বলেছেন, বল দেখি, ঈশ্বর এই দুইজনের মধ্যে কার কথার অধিক মূল্য দেন? নিশ্চয় ঐ যে পাপী, যে হাত জোড় ক'রে কাঁদছে, আর বলছে, "হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে ডাকবার অধিকারী নই", ঈশ্বর তার কথার বেশি মূল্য দেন। তেমনি যারা বলে, "ওগুলো কুসংস্কারাপন্ন, ওগুলো পৌত্তলিক, ওরা যা করে আমি তা করি না, ওরা যা বলে আমি তা বলি না", এই অহংকারের, এই অবজ্ঞার ভাব যাদের হৃদয়ে, নিশ্চয় তাদের কথায় ঈশ্বর তত মূল্য দেন না, যত ঐ অনুতপ্ত পাপীর কথায় দেন।

এ রকম যাদের মন, তাদের ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইংরাজিতে যাকে বলা হয়েছে combativeness, তাই উৎপন্ন হয়। যেমন খ্রীষ্টান প্রচারকেরা প্রথম প্রথম এই একটা মস্ত ভুল করেছিলেন যে, হিন্দুরা যা কিছু করত, তাঁরা তারই প্রতিবাদ করতেন। যখন হিন্দুরা পরব করত এবং ঠাকুর বিসর্জনের জন্য নিয়ে যেত, তখন তাঁরা তাদের ভ্যাঙাতেন। তাই নিয়ে অভিনয় করতেন, হাত পা জিব বের ক'রে তাদের বিদ্রূপ করতেন ; হয়ত বই বার করলেন— "এই কি না দেবতা ?"

এই যেমন একটা অহংকারের ভাব, "আমি উঁচু, আমি বড়, আমি উন্নত"— এই রকম একটা জ্ঞান, এতে মনের মধ্যে বিবাদ করবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়, হিংসার ভাব মনে এনে দেয়। ইংরাজিতে বলা যায় যে, our ferocious instincts are called forth। এতে আমাদের উগ্র ক'রে তোলে। বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি যে উগ্র হয়েছে, তার একটা কারণ এই যে, অপর জীবদের মেরে, অপরের উপর প্রভুত্ব ক'রে, অপরদের নষ্ট ক'রে, তাদিগকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় ব'লে। অপর প্রাণীদের অভিভূত ক'রে নিরন্তর এই জানোয়ারগুলোকে বাস করতে হচ্ছে ; এইজন্য ওগুলো ও রকম হিংস্র হয়েছে। তেমনি যে মানুষ ক্রমাগত দেখে বেড়ায়, অন্যের সঙ্গে কোন্ জায়গায় তার মেলে না, অন্যেরা কি ছাড়ে নি আর সে কি ছেড়েছে, তার হৃদয় স্বভাবতই উগ্র ও হিংস্র ক'রে তোলে। এতে মানব-চরিত্র উদ্ধত এবং উগ্র ক'রে তোলে। এ ভাবটা থাকা ভাল নয়। এটা ধর্মজীবনের পক্ষে অনুকূল নয়।

আমাদের liberal religion-ভুক্ত লোকদের মধ্যে ঐ ত্যাগের ভাবটা অতিশয় প্রবল। তাঁরা দেখেন, "ঐ কোন্ জায়গায় মেলে না।" "ওরা অভ্রান্ত শাস্ত্র মানে, আমরা তা মানি না ; ওরা অভ্রান্ত গুরু মানে, আমরা তা মানি না।" এই কথার উপরে তাঁরা এত জোর দেন যে,

তাতে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়তে পারছে না। এমন কতকগুলো তীব্র অমিলের ভাব এঁদের মনে আছে, যাতে মানব-চরিত্রের কোমল ভাবসকল এঁদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পাচ্ছে না।

এঁরা এমন একটা নাম নিয়েছেন, যাতে এঁদের ক্রমাগতই মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, এঁরা অন্যদের মত নন। এঁরা কি? না, এঁরা Trinitarian নন। ব্রাহ্মেরা যদি 'ব্রাহ্ম' এই নামটা না নিয়ে 'অপৌত্তলিক' এই নামটা নিতেন, তা হলে যা হ'ত। ও রকম একটা নাম যদি তাঁরা নিতেন, তা হলে তাঁদের ক্রমাগতই মনে হ'ত, ঐ একটা তাঁরা ছেড়েছেন, ঐ একটা ভেঙেছেন, ঐ একটা বর্জন করেছেন। Protestant খ্রীষ্টানদের যেমন হয়েছে। ঐ নামটা নেওয়াতে তাঁদের সর্বদাই মনে হচ্ছে, তাঁরা অন্যদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন। Protestant কে? না, যে রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ ভাবটা ভাল নয়।

'ব্রাহ্ম' নামটা ভালই হয়েছে। এতে তাঁদের মনে এ রকম ভাব আসে না যে, তাঁরা ছেড়েছেন, তাঁরা ত্যাগ করেছেন, তাঁরা বর্জন করেছেন। এ ভাব আসে না। ব্রাহ্ম বলতে মনে হয়, যিনি ব্রহ্মের উপাসক। যেমন, শৈব কে? না, যিনি শিবের উপাসক। শাক্ত কে? না, যিনি শক্তির উপাসক। তেমনি ব্রাহ্ম কে? না, যিনি ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এই 'ব্রাহ্ম' নামটাতে ব্রহ্মের ভাব আমাদের মনে এনে দিচ্ছে। এতে ভাঙার ভাব মনে জাগায় না। ভাঙার ভাবটা ভাল নয়। তাতে ধর্মজীবনের কোমল ভাবসকল প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ ঘটে না। তা মানব-চরিত্রের কোমলকান্ত গুণাবলীর বিকাশের অনুকূল নয়। এজন্যে ও ভাবটা ভালই নয়।

এই যেমন বললাম পশ্চিম দেশের কথা, আমাদের দেশেও দেখতে

পাই, আর-এক ভাবে ভাঙার ভাব কাজ করেছে। তাঁরা বলেন, "ভাঙ।" আমাদের দেশের যে-সব ধার্মিক লোক, বৈরাগ্য হ'ল তাঁদের মতে ধর্মের শ্রেষ্ঠ অবস্থা; তাঁদের ভাব হচ্ছে, "ভাঙ।" কি ভাঙব? মান, মোহ, আসক্তি এই সব ভাঙ। লোকে যে মোহের মধ্যে প'ড়ে ক্লেশ পায়, তারা যে অনিত্যকে নিত্য মনে করে, এই যে অবিদ্যা তা ভাঙ। যে-সকল কারণে মানুষ অনিত্য বস্তুতে আবদ্ধ থাকে তা ভাঙ, ভেঙে তাদের নিত্য যা তাই শিক্ষা দেও। এই তাঁদের ভাব। তাই বলা হয়েছে—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥

তোমার আবার পুত্রই বা কে, তোমার স্ত্রীই বা কে? ও-সব ভাবনা তুমি পরিত্যাগ কর, ও-সব ফেলে দাও।

তার পর আর-এক ভাব, অদ্বৈতমতের শিক্ষা। তাতে বলে, মানবের উপাস্য কেহ নাই। অদ্বৈতবাদীদের মতে উপাসনা কেই বা করে, আর কারই বা উপাসনা করে? মূলেতে সবই ত অভেদ, ভেদজ্ঞান কেবল অজ্ঞ লোকদের! এর একটা ঘটনা মনে হচ্ছে। একবার একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। অনুসন্ধানে জানলাম, তিনি একজন পরমহংস। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর হতে আসছেন। তাঁর সঙ্গে উপাসনার বিষয় কথা তুলতে তিনি বলতে লাগলেন, "উপাসনা করব কার? কার উপাসনা কে করে?" এই ব'লে তিনি হাসতে লাগলেন। তিনি আমাকে ভয়ানক অজ্ঞ ঠাওরালেন। এই ত উপদেশ। ভাঙ, সব ভাঙ। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগ ভাঙ, মানব-সমাজের সঙ্গে যে যোগ তাও ভাঙ। সব ভাঙ। এইরূপে ভাঙতে পারলে তার পর সেই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা

আসবে। তার পর ঐ যে পরমহংসের কথা বলেছি, ঐ পরমহংসের মত উন্নত অবস্থা আসবে। এই সন্ন্যাসের ভাব, এই ভাঙবার স্পৃহা, ইহা হতে অহংকার উৎপন্ন হয়েছে। তাঁরা ভেবেছেন, তাঁরা যা করেছেন তাই উৎকৃষ্ট, আর অন্যেরা যা করে তা সব ভুল। তাঁরা জ্ঞানী, আর অন্যেরা সব অজ্ঞ, অন্যেরা সব ভ্রান্ত।

এই যে ভাব আমাদের দেশের, এতেও মহা অনিষ্ট করেছে, এতেও উৎকৃষ্ট ধর্মজীবন উৎপন্ন করতে পারে নাই। এই যে ভাঙার ভাব এতে ধর্মজীবনের ভিতরকে দৃঢ় করে নাই। ধর্মজীবন বলতে এঁরা বোঝেন, সংসার-ত্যাগ, বনবাস ইত্যাদি। এইজন্য আমাদের দেশের ধার্মিকদের মধ্যে নরসেবার ভাব জন্মাতে পারে নাই। তাঁরা ভাবেন, "সবই ভ্রম, সবই মায়া, দুদিন পরে সবই যাবে, ও-সব ক'রে কি হবে?"

একবার রেলে যাচ্ছি, হঠাৎ এক পরমহংস সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, এত লোক মারা যাচ্ছে, আপনি কেন এদের জন্যে কিছু করেন না? আপনারা মনে করলে ত অনেক কাজ করতে পারেন। এই সব গরিবদের অনেককে বাঁচাতে পারেন। তা কেন করেন না? আপনারা সাধু, ইচ্ছা করলে অনেক লোককে রক্ষা করতে পারেন। শত শত লোক দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে, এ দেখে কি আপনাদের ক্লেশ হয় না?" তা শুনে তিনি বললেন, "আরে, যানে দেও, যাক!" আমি বললাম, "আচ্ছা না খাওয়ান, আপনারা ত লোককে উপদেশ দিতে পারেন"। তিনি বললেন, "উপদেশ দেব কাকে? ওরা সব অজ্ঞ লোক।" এঁরা মানবের দুঃখের প্রতি উদাসীন। এঁরা জ্ঞানাংশে উন্নত, অন্য সকল বিষয়ে এঁরা মনোযোগ করেন না। এই অদ্বৈতপ্রধান ভাব, এতে ধর্মজীবনের উৎকর্ষ হয় নাই। এটা ধর্মের কাজ নয়, ভাঙাটা ধর্মের কাজ নয়।

গূঢ় ভাবে সকলে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, ধর্ম গড়ার জন্য, ভাঙার জন্য নয়। ধর্মের প্রধান কাজ গড়া, ভাঙা নয়। বিধাতার এই রাজ্যে চিরদিনই দেখে আসছি, ধর্ম গড়ে, ভাঙে না; মানব-প্রকৃতিকে গড়ে, মানব হৃদয়কে গড়ে, মানব-সমাজকে গড়ে। প্রতি পদে পদে ধর্ম গড়ে, ভাঙে না। যা কিছু ভাঙে, সেও গড়ার জন্য, সেও গড়ার আর-এক দিক। বিধাতার এই জগতে দেখি, তিনি নিয়তই গড়ছেন, যেখানে তিনি ভেঙেছেন, সে কেবল গড়ার জন্য। এক আকারে ভেঙে তিনি আর-এক আকারে গ'ড়ে নিয়েছেন। তিনি মানব-সমাজকেও গঠন করছেন। এই তাঁর নিয়ম। তিনি গঠন করেন। ধর্ম গঠন করে। মানবের আত্মাকে গঠন করে, মানবের প্রকৃতিকে গঠন করে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। এই এর প্রথম কাজ— মানবের অধ্যাত্ম-জীবন গঠন করা: পাপীকে নবজীবন দেওয়া; যে ঈশ্বর হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে আপনাকে পাপপ্রবৃত্তির বশবর্তী করেছে, তাকে ঈশ্বরের চরণে নিয়ে যাওয়া।

আমরা যে সকলেই পাপী, আমরা যে আপনাদের ভেঙেছি, আপনাদের নষ্ট করেছি। ধর্মের প্রধান কাজ আমাদিগকে তাঁর চরণে নিয়ে যাওয়া। আমরা যখন আপনাদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হই, তখন আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন তাঁর চরণে স্থাপিত হওয়া। ধর্মের এই কাজ, ধর্ম আমাদিগকে তাঁর চরণে স্থাপন করে। পাপী এ জগতে অনেক শাস্তি পায়, তাঁর সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়ে পাপী অনেক শাস্তি পায়, বহু প্রকারের শাস্তি সে ভোগ করে। শারীরিক ক্লেশ, মনের ক্লেশ, জগতের সঙ্গে বিরোধ, মানবের ভালবাসা হতে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেশ সে ভোগ করে, পাপীর মন সর্বদাই ভয়েতে পূর্ণ থাকে। এই সব শাস্তি তার হয়। তার পর যখন তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়,

তখন তার প্রাণে শান্তি আসে। ধর্মের কাজ এইরূপে মানবপ্রাণে শান্তি নিয়ে আসা।

মানুষ সব সইতে পারে, আমাদের আর সব ক্লেশ সহ্য হয়—দারিদ্র্যের ক্লেশ, রোগের ক্লেশ, আর যত কিছু ক্লেশ, সব আমরা সয়ে নিতে পারি ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের যে ক্লেশ, তা আমরা সইতে পারি না। তাঁর সঙ্গে যোগ না হলে আমাদের একেবারেই চলে না। তাঁর সহবাস হতে বঞ্চিত হলে আমাদের আর চলে না। ধর্মের প্রধান কাজ এই— তাঁর সহবাস প্রাণে এনে দেওয়া ; তাঁর আস্বাদন দিয়ে দেওয়া ; তাঁকে ছেড়ে পাপী যে ভয়ানক ক্লেশ পায়, সেই ক্লেশের হাত হতে তাকে বাঁচান। এই হ'ল ধর্মের কাজ, এই তার প্রধান কাজ। এইখানে ধর্ম গড়ে। যে ঈশ্বর হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেওয়া। এই গঠন। এই ধর্মের প্রধান কাজ।

ধর্মরাজ্যে চিরদিন এই কাজ হয়ে আসছে। Atonement.— যীশু যে বলেছেন, atonement, ধর্মরাজ্যের প্রজাদের চিরদিন এই এক কাজ। atone এনে দেওয়া। atone অর্থাৎ at one, ঈশ্বরের সঙ্গে এক ক'রে দেওয়া, তাঁর সঙ্গে মিলন ক'রে দেওয়া। তাঁর যে মিলন, তা যখন পাপীর প্রাণে আসে, তখন পাপীর দুঃখ যায়, তখন তার অনুতাপ যায়।

ধর্ম আমাদের গড়ে, ধর্ম আমাদের প্রাণে এসে আমাদের নূতন জীবন এনে দেয়। আমরা যা আছি, তা আর থাকতে দেয় না। আমাদিগকে অন্য প্রকার ক'রে দেয়। ধর্ম আমাদের নিয়ে যায়, পৃথিবীর পাপতাপ হতে নিয়ে যায়, আমাদিগকে গ'ড়ে তোলে। পৃথিবীর ভগ্ন আত্মা-সকলকে ধর্ম গ'ড়ে তোলে। ধর্ম ঈশ্বরকে পাপীর জীবনে স্থাপন ক'রে দেয়, তাঁর সত্তা অনুভব করিয়ে দেয়।

এই যে ভক্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, যাতে ঈশ্বরকে সত্য ব'লে অনুভব করা যায় এবং যাতে জীবনে তাঁর সাক্ষাৎ শক্তি অনুভব ক'রে মানুষ কৃতার্থ হয়, যাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁতে স্থাপিত হয়, তা যখন মানুষের হয়, আত্মার সেই অবস্থাতে তিনিই প্রাণকে পূর্ণ ক'রে বাস করতে থাকেন, তিনিই সারাৎসার হয়ে তখন জীবনে বাস করতে থাকেন। তাঁর সেই সাক্ষাৎ, উজ্জ্বল, জননীমূর্তি প্রাণে দেখে মানবাত্মা তখন শীতল হয়।

ধর্ম আমাদের গড়ে। ধর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই ত গেল ধর্মের প্রথম কাজ।

তার পর দ্বিতীয় অবস্থা আসে, যাতে মানবাত্মাকে এই জগতের সঙ্গে বাঁধে, এই জগতের সঙ্গে তার যোগ স্থাপন করে। যখন তাঁর দিকে পাপীর মুখ ফিরে যায়, যখন তিনি প্রাণে আসেন, তখন জগতের সঙ্গে তার যোগ হতে থাকে। তখন সে দেখে যে, এই জগতে তিনি, এই প্রকৃতিতে তিনি। তাঁরই দ্বারা এ-সব গঠিত হয়েছে, তাঁরই প্রেমে এ-সব রচিত হয়েছে এবং তাঁর দ্বারাই সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে। জগতের যে এত সৌন্দর্য, এ-সব তাঁরই প্রেমের খেলা, তাঁরই লীলা, এ-সব তাঁরই কাজ। সেই মঙ্গলময় পুরুষ এই জগতের বিধাতা হয়ে আছেন ব'লেই এ জগৎ এমন সুন্দর হয়েছে। তাঁকে দিয়ে এ সৌন্দর্য বুঝতে হয়। যখন সত্যি সত্যি তাঁর সঙ্গে মানবাত্মার যোগ স্থাপিত হয়, তখন মানবাত্মা ব'লে ওঠে, "ও-সব যে আমার সখার সৌন্দর্য। আমার সখা এর ভিতরে আছেন ব'লে এ জগৎ এমন সুখের হয়েছে।" এই সে তখন অনুভব করতে থাকে। এইরূপে জগতের সঙ্গে মানবাত্মার যে বিরোধ ছিল তা ঘুচে যায়।

আমাদের দেশে বহুকাল থেকে এই একটা ভাব চ'লে আসছে যে, এ জগতে যা কিছু আছে, সব মানব-প্রকৃতির বিরোধী ; মানুষকে এর সঙ্গে

বিবাদ ক'রে থাকতে হবে। নতুবা দুঃখ, না হলে ক্লেশ পেতে হবে। খ্রীষ্টীয়ানদের কিন্তু এ ভাব নয়, তাঁরা জগৎকে মানব-প্রকৃতির বিরোধী মনে করেন না, তাঁরা মানবাত্মাকে কারাগারস্বরূপ মনে করেন না। আমাদের দেশের যে অদ্বৈতমত তাতে এই শিক্ষা দিয়েছে ; তাতে বলেছে, এ সব মিথ্যা, এ সবই ছায়া। এ সব মানবের জন্য নয়, মানব-প্রকৃতি এর বিরোধী।

তাঁরা মনে করেছেন, মানব-জীবন যেন একটি কারাগার, পূর্বজন্মের পাপের শাস্তিস্বরূপে আমরা এখানে এসেছি, এই তাঁরা মনে করেন। যেমন কয়েদিরা— কয়েদিরা যেমন পাপ ক'রে শাস্তি ভোগের জন্য জেলে যায়, তেমনি আমরা এসে'ছি। এখান থেকে চ'লে যাওয়াই মুক্তি, যত শীঘ্র পার এর হাত হতে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা কর। এই তাঁদের শিক্ষা ; এ-সব পাপ, যা কিছু দেখ সব পাপ, পাপ, পাপ— এ-সব পাপ, এ জগতের সর্বত্রই পাপ। যদি নিষ্কৃতি পেতে চাও, যদি মুক্তি চাও, তবে এ-সবকে ঘৃণা কর, এ জগৎকে ঘৃণা কর, মানব-সমাজকে ঘৃণা কর, সবকে ঘৃণা কর। তবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে পারবে। এঁদের ভাব হচ্ছে এই যে, **natural man** যেটা, সেটাকে ঘৃণা কর, **natural man** যা চায়, তা সব ঘৃণা কর। **natural man** আমোদপ্রিয়, **natural man** থিয়েটারে যায়, **natural man party** করে, **natural man** আমোদপ্রমোদ ভালবাসে। ও-সব বর্জন করতে হবে। মানব-প্রকৃতি যা কিছু চায় সব ছাড়তে হবে। এই তাঁদের ভাব। এই জগতের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করতে হবে, মানব-সমাজের সঙ্গে যোগ ছাড়তে হবে, আত্মীয়-স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করতে হবে। স্ত্রী পুত্র কেউ কিছু নয়, সবই মায়া। এই তাঁদের ভাব।

একটি গল্প মনে পড়ছে। আমাদের বংশের একজন পূর্বপুরুষ, আমার প্রপিতামহ, তিনি আপনার স্ত্রীকে পাপ ব'লে ডাকতেন; লোককে বলতেন, "এ আমার পাপ। পাপ, পাপ না হলে কি এমন হয়?" কোনও স্থান হতে এসে যদি আপনার স্ত্রীকে ঘরে না দেখতে পেতেন, ছেলেদের বলতেন, "ও ছেলেরা, তোরা আমার পাপকে দেখেছিস? ও নাৎনি, আমার পাপ কোথায় জানিস?" তখন পাড়ার ছেলেরা বলত, "ও ঠাকুরদাদা, ঐ তোমার পাপ ও বাড়ি। ডেকে দেব?— ও ঠাকুরদাদার পাপ, ওগো ঠাকুরদাদার পাপ, ঘরে এস।" এই ব'লে ছেলেরা ডাকত। তিনি ওটা একটা বন্ধন মনে করতেন। এই সংসারে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বাস করা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকা, এ তাঁদের মতে পাপ। তাঁরা মনে করেন, ধর্ম হতেই পারে না, এখানে থেকে মানুষের ধর্ম হবে কি ক'রে? এই সব বন্ধন নিয়ে কি কখনও ধর্ম হয়?

খ্রীষ্টীয় সমাজেও অনেকের মধ্যে এই ভাব কতক পরিমাণে দেখা গিয়েছে। অনেক লোক জনসমাজ ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। এতে খ্রীষ্টীয় সমাজে দুইটি মহা অনিষ্ট হয়েছে। প্রথম, এক অনিষ্ট এই হয়েছে যে, যাঁরা সংসারে থাকলে জনসমাজের কত উপকার হ'ত, কত ভাল লোক, কত নিষ্ঠাবান্ লোক, যাঁদের দ্বারা মানব-সমাজের কত কল্যাণ হতে পারত, তাঁরা সব সংসারে বিরাগী হয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন ক'রে চ'লে গিয়েছেন। এমন কত লোক, যাঁদের ধর্মভাবে জনসমাজের ধর্মভাব কত বর্ধিত হ'ত, তাঁরা সব সংসার ছেড়ে কোথায় চ'লে গিয়েছেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কত লোক দেখতে পাওয়া যায়। এই এক অনিষ্ট হয়েছে। আর-এক দিকে অনেক স্থলে এই এক মহা অনিষ্ট হয়েছে যে, সে বেচারা আরও ডুবেছে। যারা জনসমাজকে পাপের কেন্দ্র মনে ক'রে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল,

বহু বহু স্থলে দেখা গিয়েছে, তারা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে, আরও জঘন্য চরিত্রের লোক হয়েছে। এজন্য সমাজ ছেড়ে সেই সব কারণ আরও তাদের চেপে ধরল। এক দিকে এই রকম degraded হয়ে যাচ্ছে; আর এক দিকে ঐ সব লোক যাওয়াতে মানবসমাজ ধর্মভাব-বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই দেখা যায়, যেখানে মানুষ সংসার ছেড়ে চ'লে গিয়েছে, সেখানেই ধর্মের কোনও না কোনও বিপর্যয় ঘটেছে।

কিন্তু ভক্তির ধর্মের ভাব এ প্রকার নয়। তার ভাব ঠিক এর বিপরীত। ভক্তির ধর্ম মানব-প্রকৃতির এই যে বিরোধ ভাব তা ঘুচিয়ে দেয়। এ কি সম্ভব হয়, এ কি স্বাভাবিক মনে হয় যে, আমরা স্বাভাবিক রূপে যা চাই, তা আমাদের অধোগতির জন্য? এ কি হতে পারে? পতি পত্নীতে সম্বন্ধ থাকবে না, মানবে মানবে সম্বন্ধ হবে না, এ কি সম্ভব? এ-সব যদি হয়, তা হলে আধ্যাত্মিক অধোগতি হবে— এ কথা যারা বলে, তাদের কথা তেমনি মনে হয়, যেমন কেউ যদি বলে যে, জল নীচু দিকে যাবে না, উঁচু দিকে জল যাবে; অথবা যদি কেউ বলে, পা উপর দিকে দিয়ে আর মাথা নীচু দিকে দিয়ে মানুষকে চলতে হবে; অথবা যদি কেউ বলে যে, পা দিয়ে না চ'লে হাত দিয়ে peacock march ক'রে মানুষকে চলতে হবে। এ রকম কথা যদি কেউ বলে, তা যেমন স্বীকার করতে পারি নে, তেমনি যারা বলে, মানুষকে ধার্মিক হতে হলে এ জগতের শোভা ও সৌন্দর্য হতে আপনাকে ছিন্ন করতে হবে, এ জগৎ হতে মানুষকে মুখ ফেরাতে হবে— ঋতুর পর নব ঋতুর আগমনে প্রকৃতি নবসাজে সজ্জিত হবে, দুই মাসের মধ্যে বৃক্ষকুল পুরাতন পত্রসকল ফেলে দিয়ে নবপত্রে সুশোভিত হবে, তা দেখে মানুষ আনন্দিত হবে না -- এ কথা যারা বলে, তাদের কথাও তেমনি মানতে পারি না।

জগতের সঙ্গে মানুষের যোগ ছিন্ন হবে, প্রাতঃকালে পক্ষিগণ বায়ু-হিল্লোলে উড়ে সুমধুর কণ্ঠে গান গায়, সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের সিন্দূরাভ কিরণমালা প'ড়ে পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল হয়, তা দেখে মানুষ আনন্দিত হবে না, এ কি সম্ভব? এ কি স্বাভাবিক? এ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে অস্বাভাবিক কি? এতে যদি কেউ মনে করেন, তাঁর আধ্যাত্মিক অধোগতি হয়ে গেল, এ-সব ভাবকে যদি অধ্যাত্মজীবনের প্রতিরোধী কেউ মনে করেন, তবে তা স্বীকার করতে পারি না। তুমি ফল দেখে সুখী হবে, তুমি মেঘের অপূর্ব শোভা দেখে আনন্দিত হবে, এ ত জগদীশ্বরের নিয়ম, এ ত তাঁর বিধান। প্রেমের ধর্ম যখন মানবের প্রাণে আসে, তখন জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়, প্রেমের ধর্ম আমাদের এই জগতের সঙ্গে মিলিত করে। এই প্রেমের ধর্মের আর এক কাজ। এইজন্যেই বলা হয়েছে, "সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" প্রেমের ধর্মে মানুষ এই জগতের সঙ্গে এক হয়ে যায়, এ মানব-প্রাণের বিরোধ ঘুচিয়ে দেয়, জগতের সঙ্গে মানুষের মিলন করিয়ে দেয়।

প্রেমের ধর্ম আর এক কাজ করে— সে হ'ল মণ্ডলী গঠন। প্রেমের ধর্ম গঠন করে, মণ্ডলী গঠন করে। কি রকম ক'রে করে, তা ঠিক বলা যায় না। প্রেম বর্ধন করে, বাড়িয়ে দেয়। এক ছিল দুই হ'ল, দুই ছিল চার হ'ল, চার ছিল ষোল হ'ল, এই রকম ক'রে বাড়ে, প্রেম এই রকম ক'রে বাড়াচ্ছে। ক্রমাগতই বাড়াচ্ছে। প্রেমেতে দেখি, দুইটি বিন্দু এক হ'ল, তার পর তা হতে চার হ'ল, চার হতে দশজন হ'ল। প্রেম এইরূপ ক'রে বাড়িয়ে বাড়িয়ে জনসমাজ রচনা করেছে এবং করছে। প্রেম আত্মায় আত্মায় যুক্ত করে, ব্যাকুলাত্মা সকলের মিলন করে। প্রেম মিলিত করে, খণ্ড ভাবে থাকতে দেয় না। এইরূপে ধর্মসমাজের গঠন হয়।

ধর্মে ভাঙা ও গড়া

জগতের ইতিহাসে ধর্মসম্প্রদায়সকলের গঠন কিরূপে হয়েছে, তা পাঠ করলে শরীর কণ্টকিত হয়। কিরূপে এক হৃদয়ের প্রেম দশ হৃদয়ে গেল, কিরূপে এক আত্মার ব্যাকুলতা আর-এক আত্মায় সংক্রামিত হ'ল, তা ভাবলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। কিরূপে আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, কিরূপে আমাদের দেশের চৈতন্য সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল, সে-সব অতি আশ্চর্য, অতি অদ্ভুত। অতি আশ্চর্য উপায়ে সে-সব দল গঠিত হয়েছিল। দু-চারজন লোক, তাদের ভিতরে যে আগুন জ্বলেছে, তাদের ভিতরে যে ব্যাকুলতার উদয় হয়েছে, তাই সংক্রামিত হয়ে গেল অপর দশ হৃদয়ে।

আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিবৃত্ত পাঠ করলে দেখতে পাই, মহাত্মা যীশু বারজন মাত্র শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বারজনের মধ্যে এমন কি একটু প্রেমের আগুন দিয়েছিলেন, যা স্ফুলিঙ্গ হয়ে হয়ে উড়ে গেল অপর বহু হৃদয়ে। যখন তাঁকে হত্যা করল ক্রুশকাষ্ঠে, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল বারজন মাত্র মানুষ। কিন্তু সেই বার জনকে অনুসরণ করল কত লোক। ক্রমে সেই বার জন হতে বার শ, বার শ হতে বার হাজার, বার কোটি, এমনি ক্রমে ক্রমে বেড়ে বেড়ে চলেছে। ঐ বারজন লোকের যে ব্যাকুলতা, তাদের যে ভক্তি যীশুর প্রতি, তাতে লেগে গেল অপর কত লোক। চুম্বকে যেমন লৌহ লাগে, তেমনি ক'রে ওদের সঙ্গে মানুষ সব লেগে গেল। এমনি ক'রে দু-জন, চারজন ক'রে ধীরে ধীরে, লোকচক্ষুর অগোচরে, অজ্ঞাতসারে এই সব দল গঠিত হয়েছে, মণ্ডলী হয়েছে।

কিছুদিন হ'ল আমি বৈষ্ণব গ্রন্থসকল পাঠ করছি, এখনও পাঠ করছি। তাতে বড় আশ্চর্য দেখতে পাই, মহাত্মা চৈতন্য যখন বাঙলা দেশ ছেড়ে পুরীতে চ'লে গেলেন, তখন তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ত একেবারে

বিক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে একজন লোক ছিল, তার বাড়ি শান্তিপুরে কি নবদ্বীপে, তা এখন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তার হৃদয়ে কি এক ব্যাকুলতা ছিল, সে যেখানে গেল সেখানেই মানুষের অন্তরে কি এক ভাব দিতে লাগল। ক্রমে তার সঙ্গে মানুষ জুটতে লাগল। ক্রমে এক হতে দশ, দশ হতে বিশ, এমনি ক'রে গড়ে গেল, মণ্ডলী হয়ে গেল।

যেমন অনেক সময় দেখা যায়, সমুদ্রের জলে ফল ভেসে যায়, তা হতে সমুদ্রের কোনও এক দ্বীপে নানাজাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়— একটা ফল ভাসতে ভাসতে কোনও এক দ্বীপে গিয়ে লেগেছে, তা হতে সেখানে একটা গাছ উৎপন্ন হয়েছে, তার পর পক্ষীরা এসে সেই গাছের ডালে বসতে আরম্ভ করেছে, তারা মুখে ক'রে নূতন নূতন ফল এনে সেখানে ফেলেছে, এমনি ক'রে সেখানে নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ হয়েছে; অথবা মনে করুন, যেমন সমুদ্রের স্রোতে ভেসে ভেসে কতকগুলি মাটি সমুদ্রের কোনও এক স্থানে আটকে গিয়েছে, তার পর আরও সব মাটি ভেসে ভেসে তার সঙ্গে এসে মিশতে লাগল, এই রকম ক'রে সেখানে এক দ্বীপ হয়ে গেল, তার পর নানা স্থান হতে প্রাণীরা এসে সেই নবোত্থিত দ্বীপে বাস করতে লাগল, তরুসকল সেখানে দেখা দিল, এমনি ক'রে বিশ ত্রিশ বৎসর ধ'রে ক্রমে ক্রমে সেখানে এক সহর হয়ে গেল, নানাজাতীয় বৃক্ষলতায়, নানাজাতীয় প্রাণীতে সে স্থান আকীর্ণ হয়ে গেল; তেমনি যেন ধর্ম্মমণ্ডলীসকলের ইতিহাসে দেখতে পাই, কেমন ক'রে কোথা থেকে এক-আধজন মানুষ সাধুদের সংস্পর্শে এসে বদলে গিয়েছে। অমনি সেই এক-আধজন মানবের দ্বারা শত শত মানুষ বদলে ভাল হয়ে নবজীবন পেয়ে গিয়েছে। এমনি ক'রে এক-একটা ধর্ম্মমণ্ডলী গঠিত হয়েছে।

কি আশ্চর্য উপায়ে এই পৃথিবীতে চিরদিন ধর্মমণ্ডলীসকল গঠিত হয়ে থাকে! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য বিধান, কেমন ক'রে একটা মানুষ নবজীবন পেয়ে গেল, তা হতে অপর দশটা জীবন উৎপন্ন হল; তার পর সেই দশ হতে বিশ, বিশ হতে চল্লিশ, চল্লিশ হতে একশ, এমনি ক'রে বেড়ে বেড়ে ধর্মমণ্ডলীসকল গঠিত হয়েছে। এমনি ক'রে মণ্ডলীর রচনা হয়েছে। সেই মানুষটার সঙ্গে প্রীতিতে শ্রদ্ধাতে ঐ সব লোক গেঁথে গেল। ইংরাজিতে যাকে reverence বলে, সেই reverence-এর সুতো দিয়ে যেন ঐ-সব মানুষ পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেল, তারা প্রাণে প্রাণে লেগে গেল। চিরদিনই এমনি ক'রে পৃথিবীতে ধর্মমণ্ডলীসকল হয়েছে।

এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এরও ইতিহাসে দেখতে পাই, এর যিনি স্থাপয়িতা, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, তিনি যখন একলা ছিলেন, তখন ত সকলে মিলে তাঁকে নির্যাতন করবার চেষ্টা করতে লাগল। যে দু-চারজন লোক তাঁর সঙ্গে জুটেছিল, তিনি যখন ইংলণ্ডে চ'লে গেলেন, তখন তাদের কেউ কেউ ত ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল। এই অবস্থায় তিনি ত ইংলণ্ডে চ'লে গেলেন। তার পর কে এই ব্রাহ্মসমাজকে জাগিয়ে রাখলে? কে একে এতদিন ধ'রে রক্ষা করল? ঐ যে রামমোহন রায় দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রতি একটুখানি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হৃদয়ে, তা হতে হয়ে গেল। তা হতে এই ব্রাহ্মসমাজ উৎপন্ন হ'ল। তা হতে এই আমরা সব হয়েছি। ঐ যে বিদ্যাবাগীশের হৃদয়ে একটু প্রীতি ছিল রামমোহন রায়ের প্রতি, সেই প্রীতি হতে এই ব্রাহ্মসমাজ হয়েছে। রামমোহন রায় চ'লে গেলেন, তিনি একলা প'ড়ে রইলেন, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে ব'সে তিনি একলা উপাসনা করতে লাগলেন। শুনেছি, একটা প্রদীপ জ্বেলে মানুষ যেমন

শ্মশানে ব'সে থাকে, তেমনি ক'রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনা করতেন। সকলে পরিত্যাগ করেছিলেন, কেউ কখনও যেতেন কি না সন্দেহ, ফি. বুধবার সন্ধ্যার সময় তিনি একলা ব'সে উপাসনা করতেন। অবশেষে একজন মানুষ তাঁর সঙ্গে জুটলেন।

মহর্ষি যখন ব্রাহ্মসমাজে এলেন, তাঁর জীবনচরিত প'ড়ে দেখবেন সকলে, কেমন ক'রে তাঁর প্রাণে ঐ আগুন জ্বলেছিল। এক সময় ছিল, যখন সকলে বলত যে, দেবেন্দ্রনাথকে নষ্ট করলেন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়। তিনি মহর্ষির প্রাণে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত ক'রে দিয়েছিলেন। এইজন্য পথে, ঘাটে, স্কুলে সর্বত্র দেখা হলেই লোকে "দেবেন্দ্রনাথকে বিগড়ে দিলে বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিগড়ে দিলে" এই কথা বলত। বিগড়ে দিলে কি রকম? না, ঐ যে সুতোর কথা বলেছি, তাই দিয়ে গেঁথে দিলেন। ঐ যে শ্রদ্ধার সূত্র, প্রীতির সূত্র, যা দিয়ে বিদ্যাবাগীশকে গেঁথেছিলেন রামমোহন রায়, সেই সূত্র দিয়ে তিনি আবার গেঁথে দিলেন মহর্ষিকে। মহর্ষি আবার সেই সূত্র লাগিয়ে দিলেন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রাণে, তিনি আবার তা দিয়ে গিয়েছেন আমাদিগকে।

এই রকম ক'রে দিয়ে দিয়ে, এমনি ক'রে লাগিয়ে লাগিয়ে, বিশ্বাস-প্রীতি-শ্রদ্ধা এই সব সুতো দিয়ে টেনে টেনে তবে এই ব্রাহ্মসমাজ হয়েছে। এ ব্রাহ্মসমাজ কি সভাসমিতি ক'রে হয়েছে? এ কি resolution পাশ ক'রে হয়েছে? 'যেহেতু' 'অতএব' দিয়ে তবে এই ব্রাহ্মসমাজ হয়েছে? তা নয়। কেমন ক'রে ঐ এক হৃদয়ের প্রেম, ঐ এক প্রাণের ব্যাকুলতা, তা গেল আর-এক হৃদয়ে, তা আবার গেল আর-এক হৃদয়ে, এমনি ক'রে টেনে টেনে, প্রীতি-শ্রদ্ধার সুতো দিয়ে টেনে টেনে, এই ব্রাহ্মসমাজ গ'ড়ে উঠেছে, তা বলা যায় না। এখানে সকলের প্রীতিতে শ্রদ্ধাতে বিশ্বাসে পরস্পর বাঁধা। যেমন ঐ আকাশের তারা-

সকল কি একটা অদৃশ্য আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আকাশে বিরাজমান রয়েছে, তেমনি দেখ, এই আমরা সকলে প্রেম-শ্রদ্ধা-ভালবাসার অদৃশ্য সূত্র দিয়ে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়ে আছি। এরই নাম ব্রাহ্মসমাজ এরই নাম ধর্মমণ্ডলী। এই প্রেমেতেই জগতে ধর্মমণ্ডলীসকলের গঠন হয়েছে, চিরদিন তাই হয়ে আসছে।

তার পর প্রেমের ধর্ম শাস্ত্রসকলকে গঠন করে। শাস্ত্র গঠন করে কি ক'রে? না, ঐ যে reverence, তার নাম যাই দেও না কেন— তাকে শ্রদ্ধা বল, প্রীতি বল, আর যাই কেন বল না— ঐ যে ঈশ্বরের জন্ত ব্যাকুলতা, ঐ যে তাঁর জন্য মানব-হৃদয়ের প্রেম সাধুদের অন্তরে, তা দেখে মানুষের মন এমনি বিনীত হয়ে পড়েছে যে, মানুষ সাধুদের কোনও উক্তি নষ্ট হতে দেয় নি, দিতে পারে নি। ঐ তাঁরা কি দুটো চারটে কথা বললেন, ঐ দুটো চারটে কি বলেছেন, তাই নিয়ে মানুষ যত্ন ক'রে তুলে রেখেছে। তা হতে শাস্ত্র সব রচিত হয়েছে। বেদ বল, কোরান বল, বাইবেল বল, আর যা কিছু বল, সব শাস্ত্রই এমনি ক'রে হয়েছে। তার ভিতরে এমন সব কথা আছে যা পড়লে মনে হয় বালকের উক্তি। মনে হয়, এই সব বালকের কথা, তাকে মানুষ এত যত্ন ক'রে রাখল কেন? ঐ তার ভিতরে যে দুটো চারটে ভাল কথা আছে, ঐ যে দুটো চারটে সত্য আছে, ঐ তার খাতিরে। যেমন খনির মধ্য হতে দেখি মানুষ স্বভাবতই দু-চারটে রত্ন পাবার জন্যে অনেক খাদ খুঁড়ে আনে, অনেক খাদের মধ্য হতে মানুষ দুই-চারিটা রত্ন পায়। তাই যেমন ঐ খাদশুদ্ধ তুলে আনে দুটো চারটে রত্ন পাবার জন্য, তেমনি মানুষ এই পৃথিবীতে সাধুদের মুখ হতে কত খাদ তুলে সঞ্চয় ক'রে রেখেছে, দুই-একটা সত্যের লোভে।

এই কি শুধু রেখেছে? কত উপায় অবলম্বন করেছে, সে-সক মানুষকে জানাবার জন্য। ভেবে দেখ, সে কি রকম ব্যাপার! কত হাজার বৎসর ধ'রে বেদের ঐ-সব উক্তি মানুষের মুখে মুখে ছিল। মানুষ সেগুলো স্মৃতিতে রেখেছে, মুখস্থ করেছে। ঐগুলো মুখস্থ করতে কত সময় লেগেছে, তা একবার ধারণা করবার চেষ্টা কর। আট বৎসর বয়সের সময় ছেলেদের গুরুর কাছে বসিয়ে বিশ বছর, বাইশ বছর পর্যন্ত এই সব তাদের মুখস্থ করান হয়েছে, ঐ-সব বেদের অধ্যায়, পটল, মণ্ডল, সূক্ত, ঐ-সব তাদের মুখস্থ করান হয়েছে। এখনও হয়, এখনও টোলে সমুদয় ভাগবতখানা ছাত্রদের মুখস্থ করান হয়; তার পর আবার তার পরীক্ষা হয়, পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করেন, সমস্ত ভাগবতখানা তাদের মুখস্থ ব'লে যেতে হয়। ভেবে দেখ, কতটা প্রেম থাকলে তবে এপ্রকার হয়। শিষ্যদের প্রেম হতেই সাধুদের ঐসব উক্তি সংগ্রহ হয়েছে এবং তা হতে শাস্ত্র গঠিত হয়েছে; আবার ভেঙে না যায়, তার জন্যই বা কত চেষ্টা!

সাধুরা কিন্তু ইহা জানতেনও না। কোনও সাধু চেষ্টা করেন নি আপনার উক্তিকে immortalize করবার জন্যে। তাঁরা কেউ ভাবেন নি যে, তাঁদের কথার আবার এত দাম হবে। তাঁরা যে দয়া ক'রে short hand দিয়ে লিখিয়ে, তাই আবার ছাপিয়ে বাড়ি বাড়ি বিতরণ করতেন, তা নয়। তাঁরা খবরও রাখতেন না, কেউ সে সব লিখল কি না; নিজেরাও তার এক বর্ণও লিখে যান নাই। এঁদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া জানতেন না। মহাত্মা মহম্মদ, তাঁর সম্বন্ধে এইরূপ শোনা যায় যে, তিনি বর্ণমালা জানতেন না। তবে কেউ কেউ বলেন যে, বোধ হয় তিনি কিছু কিছু জানতেন, অন্তত নাম সই করতেও পারতেন। নইলে কারবার চালাতেন কি ক'রে? মহাত্মা যীশু বোধ হয় যৎসামান্য কিছু জানতেন। চৈতন্য তখনকার মধ্যে একজন প্রধান

পণ্ডিত। কিন্তু তিনি যা কিছু লিখেছিলেন, সব গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি ন্যায়ের টীকা লিখেছিলেন, কিন্তু তা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেছিলেন; এই ভয়ে যে, পাছে পাণ্ডিত্যের অভিমান আসে। মহাত্মা শাক্যসিংহেরও অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু তিনি কখনও এক বর্ণ লেখবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা যা বলতেন, তা যে আবার একজন পাশে ব'সে লিখত, তা ত জানি না। তাঁরা যে বলতেন, "ওহে, লিখে নেও, লিখে নেও। কথাগুলো লিখে নেও।" এমনি ক'রে তাঁরা যে কাকেও দিয়ে লেখাতেন, তা নয়।

তবে মহাপুরুষ মহম্মদের সম্বন্ধে এইরূপ শোনা যায়, তিনি যখন ঈশ্বরের প্রেমে বিহ্বল হয়ে trance অবস্থা প্রাপ্ত হতেন, সেই সময় যে-সব কথা বলতেন, তাই শিষ্যেরা লিখত। আর basket-এ রেখে দিত, বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখত। তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পরে সেই সব chapter ভাগ করা হয়েছিল।

মহাত্মা যীশুর যে-সব উপদেশ তা যে কেউ লিখেছিল, তা ত জানি না। তিনি যে আমাদের মত hand bill বার ক'রে লোক ডেকে বক্তৃতা করতেন, তাও নয়। যেতে যেতে ব'সে পড়লেন একটা মাটির ঢিপির ওপর, কি দুটো চারটে কথা বললেন, তাই হ'ল Sermon on the Mount। নৌকা ক'রে যাচ্ছেন, এক জায়গায় এক বিয়েতে নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে সেখানে দু-একটা কথা কি বললেন, অমনি তাই লোকের চিত্তে ব'সে গেল। প্রাণের উৎসাহ হতে, প্রাণের ব্যাকুলতা হতে স্বভাবতই কি বলেছেন দুটো চারটে কথা, অমনি সেগুলিকে মানুষ মুক্তা ব'লে কুড়িয়ে নিয়েছে। অমনি তুলে রেখে দিয়েছে সেই দুটো চারটা কথা।

দূরেই বা কেন যাই? আমাদের হাতের কাছে রামকৃষ্ণ পরমহংস

মহাশয়, তাঁর বিষয়ে কি দেখতে পাই? তাঁরও এমনি। তিনি ত আর আমাদের মত সাজিয়ে গুজিয়ে বলতে পারেন নাই, কিন্তু ঐ চলিত কথায় যা ব'লে দিতেন। তাঁর নিয়ম ছিল এই যে, হঠাৎ তিনি একটা কথা বলে দিতেন, না ভেবে, না চিন্তে, যা হয় একটা কথা ব'লে দিতেন, তাই এমন হ'ত যে, একেবারে মানুষের হৃদয়কে গিয়ে স্পর্শ করত। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

একজন এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা সংসারে থেকে মানুষ কি ক রে ধর্মেতে মন রাখতে পারে?" তার উত্তরে তিনি বললেন, "মনে কর, একজন স্ত্রীলোক, সে চিঁড়ে কুটছে, চিঁড়ে কুটতে কুটতে সে কি আর কিছু করে না? সে এক হাতে চিঁড়ে নেড়ে দিচ্ছে, আর-এক হাতে ঝাড়ছে, এ দিকে সে আপনার সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছে, আবার মুখে লোকের সঙ্গে গল্প করছে। এতগুলো কাজ সে এক সঙ্গে করছে, কিন্তু তার প্রধান মনটা রয়েছে ঐ চিঁড়ে নেড়ে দেওয়ার প্রতি, যেন হাত ছেঁচে না যায়।" এই কথা ব'লেই বলছেন, "ভাই, তোমরা তেমনি ক'রে সংসারে থেকে ধর্ম কর, দেখ যেন ছেঁচে না যায়।" এই ত যাকে বলে homely instances। আবার একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "জ্ঞান আর ভক্তিতে প্রভেদ কি?" তিনি বললেন, "জ্ঞানটা পুরুষমানুষ, বাইরে প'ড়ে থাকে, আর ভক্তি স্ত্রীলোক, একেবারে ঈশ্বরের অন্তঃপুরে চ'লে যায়। জ্ঞান বাইরের জিনিস, ভক্তি ভিতরের বস্তু।" এই রকম ত কথা! এ যে আবার লেখা হ'ত, সাধুরা ব'লে যেতেন, আর-একজন পাশে ব'সে লিখত, তা ত জানি নে। এ ত এখন দেখছি। তাঁরা কিছু লেখেনও নি, আর লেখবার চেষ্টাও করেন নি।

তবে তাঁরা একটা কাজ করেছিলেন। এমনি ক'রে তাঁরা মানবের প্রেমকে আকর্ষণ করেছিলেন যে, তাই থেকে শাস্ত্রসকল রচনা হয়ে

গিয়েছে। তাঁদের প্রতি মানুষের যে অচলা ভক্তি তা থেকে শাস্ত্রের গঠন হয়েছে। শুধু যে শাস্ত্র হয়েছে তা নয়। অধিক কি, তা হতে স্বর্গরাজ্য পর্যন্ত গঠন হয়ে গিয়েছে। স্বর্গরাজ্য গঠন হয়েছে কি রকম? না, এই যে তাঁদের প্রেম, এই যে তাঁদের ব্যাকুলতা, এই যে তাঁদের ধর্মভাব, এই যে তাঁদের হৃদয়ের দীনতা, এইগুলো একেবারে contagion-এর মত লেগে গিয়েছে মানুষের হৃদয়ে। কেবল কি প্লেগেই contagion হয়? কেবল কি বসন্তই সংক্রামিত হয়? বিশ্বাস, বৈরাগ্য, স্বার্থত্যাগ, ব্যাকুলতা এ-সকল সংক্রামিত হয় না? বিশ্বাসী মানুষের সংস্পর্শে এসে মানুষ বিশ্বাসী হয়, ব্যাকুল আত্মার কাছে এসে মানুষের হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগে।

এমনি ক'রে এক আশ্চর্য উপায়ে চিরদিন পৃথিবীতে ধর্মভাব বিস্তৃত হয়েছে, এমনি ক'রে প্রচার হয়েছে, এমনি ক'রে ধর্মমণ্ডলী গঠিত হয়েছে, পৃথিবীর হাওয়া বদলে গিয়েছে, জনসমাজ উঁচু হয়ে উঠেছে। এইরূপ মণ্ডলী হতেই সমুদয় সদ্‌ভাব, সমুদয় মঙ্গলভাব জগতে এসেছে। যা কিছু সৎ, যা কিছু মহৎ সবই এমনি ক'রে পৃথিবীতে এসেছে। বিশ্বাসী, প্রেমিক, চরিত্রবান্ লোকের সংস্পর্শ হতেই বিশ্বাস প্রেম জগতে এসেছে।

আজ যদি কেউ শোনে, এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে তিনজন martyr হয়েছে, তিনজন লোক ঈশ্বরের খাতিরে জীবন দিয়েছে, তা হলে কি ধর্মপ্রচার হয় না? তা হলে কি সমাজের হাওয়া উঁচু হয়ে ওঠে না? সাধুজীবন হতেই সাধুতা আসে। একজন রামতনু লাহিড়ী হতে বাঙলাদেশের হাওয়া বদলে গিয়েছে। তাঁর মধ্যে কি একটু জিনিস ছিল, তা হতে শত শত লোকের মন বদলে গিয়েছে। এই সব মানুষ অধিক হলেই দেশ বড় হয়ে ওঠে। অকপট, ধর্মপ্রিয়, স্বার্থত্যাগী,

ব্যাকুলাত্মার কাছে এসে মানুষ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যেখানে এইরকম লোক অধিক হয়, সেখানেই কাজ হয়। মনে ক'রো না বিশ্বাস, প্রেম, ব্যাকুলতা এ-সব বৃথা যায়। এ-সব বৃথা যাবার জিনিস নয়। খাঁটি ধর্মভাব, খাঁটি ঈশ্বরানুরাগ, খাঁটি ব্যাকুলতা যেখানে আছে, তার এক কণা বৃথা যেতে পারে না। এক রেণু খাঁটি জিনিস এ সংসারে নষ্ট হয় না, নষ্ট হতে পারে না। এমন একদল মানুষ দেও, যাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-ব্যাকুলতা আগুনের মত জ্বলছে, যারা তাঁর জন্যে ক্ষেপে গিয়েছে, দেখি সমাজের হাওয়া উঁচু হয়ে যায় কি না।

আমাকে অনেক সময় বন্ধুরা এসে ব'লে থাকেন যে, আমাদের সমাজকে আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, তা হ'ল না কেন। আমি বলি, "মাপ কর, মাপ কর, ও-সব কথা ব'লো না। আমাদের মধ্যে সেরূপ বিশ্বাসী মানুষ কই? তেমন স্বার্থত্যাগী, অকৃত্রিম, ধর্মপিপাসু লোক কই?" এই রকম লোক দিয়েই ত সমাজ হয়, এইরূপ লোক দিয়েই ত মণ্ডলী হয়। একেই বলে স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গরাজ্য ধর্ম গঠন ক'রে থাকে। এ কি রকম তার একটা ছবি আমি কল্পনা ক'রে বলছি। মনে কর, আমি এমন এক সহরে গিয়েছি, যেখানে দেখলাম, রাজা রামমোহন রায় রয়েছেন, মহম্মদ আছেন, সকল সাধু ব'সে গিয়েছেন। মনে কর, সেখানে থিওডোর পার্কার আছেন, মিস কব্ প্রভৃতি সকলে আছেন। বল ত, বল ত, সেই সহর আমার পক্ষে স্বর্গরাজ্য হয় কি না? এই সব গঠন ক'রে থাকে ধর্ম।

ধর্ম এই সকলই গঠন ক'রে দেয়। মানবের আত্মাকে গঠন করে, মানব-সমাজকে গঠন করে, এই জগতের সঙ্গে মানুষকে গঠন করে, শাস্ত্র গঠন করে, স্বর্গরাজ্য গঠন করে; এই সব করে। ভাঙে না, ধর্ম গড়তে চায়। গড়তে গিয়ে যা ভাঙে, তা ভেঙেই থাকে।

মহাত্মা যীশু, যিনি এই স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দিয়ে গিয়েছেন, মানুষকে তিনিই বলেছেন, "Woe unto ye Pharisees", ধিক্ থাক তোমাদের কপট ধর্মযাজকগণকে। এইরূপ তীব্র তিরস্কার করেছেন। আবার বলেছেন, "Sabbath is for the man and not man for the Sabbath—কি তোমরা বিশ্রাম বারের জন্য মানুষকে মনে কর? তোমরা জান না মানবাত্মা তার চেয়ে অনেক উঁচু?" এই কথা বলেছেন। মহাপুরুষ মহম্মদ আবার এর চেয়ে কঠোর কথা বলেছেন।

এঁরা যে তিরস্কার করেছেন, সেটা মানুষের ধর্মবিশ্বাসের নয়, সেটা মানুষের কপটতার, সেটা মানুষের কৃত্রিমতার নিন্দা এঁরা করেছেন। যীশু চিৎকার ক'রে বললেন, "ওগো, heavily burdened তোমরা কে আছ, আমার কাছে এস, শান্তি পাবে।" আবার Phariseesদের তিনি নিন্দা করেছেন, বলেছেন, "তোমরা সব hypocrites"। কি আশ্চর্য, একজন পতিতা স্ত্রীলোককে কাছে এনে তাকে তিনি ব'লে দিলেন, "Go, seek the Kingdom of God", আর ধর্মযাজকদের তিনি বললেন, "Woe unto ye Pharisees।" একটা পতিতা নারীর প্রতি তাঁর এত কোমলতা, আর Phariseesদের প্রতি তাঁর এতই তীব্র ভাব ও নিন্দা। মানুষের কপটতার নিন্দা, মানুষের কৃত্রিমতার নিন্দা। ওটা তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি, ওটা তাঁদের প্রাণে সয় নি। তাই তাঁরা মনে করেছেন, সমুদয় প্রাচীনধর্মাবলম্বী লোক কপটাচারী। ধর্মের যেটা অসার অংশ, ধর্মের যেটা শুধু খোসা, সেটাকে এঁরা কতই নিন্দা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা আর একটা কথা বলেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, তোমরা সত্যকে ধর, পবিত্রতাকে ধর, মহৎ যা, তাকে তোমরা আলিঙ্গন কর। তা হলেই হ'ল। পাপ তা হলেই খ'সে যাবে। পাপ

বর্জন করবার জন্য তা হলে তোমাদের আর নতুন ক'রে চেষ্টা করতে হবে না। ভাঙবার জন্যে ভাঙা নয়, গড়বার জন্যে ভাঙা। এ ভাবটা কি, তা আমি ভেঙে বলছি। যেমন মহাত্মা মহম্মদ বললেন, "আল্লা হো আকবর।" মহান্ প্রভু পরমেশ্বর, তাঁকে তোমরা ধর, তাঁতে তোমরা প্রাণ দেও। তা হলেই দেখবে, আর সব হয়ে যাবে। ছোট ছোট দেবদেবী, ও-সব দেখবে তা হলে আপনা থেকে মন হতে খ'সে যাবে। ও-সব আপনা হতে হৃদয় হতে খ'সে পড়বে। সত্যকে ধর, তা হলে অসত্য আপনা হতে খ'সে যাবে। এই কথা তাঁরা বলেছেন।

এর একটা দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে। তাঁরা সন্ন্যাসীদের বড়ই নিন্দা করেছেন, বলেছেন, বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নয়। ওতে কপট বৈরাগ্য আসে। ওতে ঠিক বৈরাগ্য হয় না। বৈষ্ণব গ্রন্থের এক স্থানে তার একটা দৃষ্টান্তই আছে। সেটা কে বলেছেন তা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। বোধ হয় রঘুনাথ হতে পারেন ; রঘুনাথ কি না তা ঠিক ক'রে বলতে পারছি না। তাতে বলেছেন, মর্কট বৈরাগ্য করা ভাল নয়। বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য করা কোনও মতেই উচিত নয়। দেখতে হবে, কোন্ বিষয়ে মানুষের মন লেগে গিয়েছে। যখন কোনও আদর্শে মানুষের মন নিমগ্ন হয়, তখন সে মানুষ তাতে এতই অভিনিবিষ্ট হয় যে বাহিরের আর কোনও বিষয় তার মনে থাকে না। বাহিরের বিষয় সব আপনা থেকে খসে যায়। এই বৈরাগ্যই প্রকৃত স্বাভাবিক বৈরাগ্য।

এ কি রকম, তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একদিন ট্রাম গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, ট্রামখানা আগে ছুটে যাচ্ছে, আমি পেছন থেকে চিৎকার ক'রে বলতে বলতে যাচ্ছি, বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ। এ দিকে গায়ের কাপড়খানা পিছন দিকে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে, সে দিকে আমার

মন নেই। ট্রামের প্রতি মনটা এতই আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে যে, আমার গায়ের কাপড়খানা যে প'ড়ে যাচ্ছে তা দেখবার আমার ফুরসুৎ হচ্ছে না। পেছনের লোক ডেকে বলছে, "ও বাবু, কাপড় প'ড়ে গেল, কাপড় প'ড়ে গেল।"

প্রকৃত বৈরাগ্য ঠিক এই প্রকারের, সে স্বাভাবিক ভাবে আসে। মানুষটার মন ঈশ্বরেতে এমনি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কি খ'সে যাচ্ছে আর কি থাকছে, তা আর দেখবার তার অবসর হচ্ছে না। জগতের লোক বলছে, "ওই যা, ওর খ'সে গেল, ওর বিষয়াসক্তি খ'সে যাচ্ছে, ঐ খসে যাচ্ছে।" এতে মানুষকে বিনয়ী করে। আর "এই আমি ছাড়ছি, এই আমি বৈরাগ্য করছি" এ রকম ভাবে যারা বৈরাগ্য করে, সে প্রকৃত স্বাভাবিক বৈরাগ্য নয়। তাতে অহংকার উৎপন্ন করে। asceticism-এর জন্যে যে asceticism, বৈরাগ্যের জন্যে যে বৈরাগ্য, তাতে মানুষের মনে অহংকার আসে। আমার মন রয়েছে ঐ আদর্শে আমার মন রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি, এতে আমি কি ছাড়ছি, কি ত্যাগ করছি, তা আর আমার মনে আসছে না, আমি ছাড়বার জন্যে ছাড়ি না। এই হ'ল ঠিক অবস্থা। এই ত্যাগ ঠিক ত্যাগ।

যে ত্যাগে কেবলই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে কি ছেড়েছে, সে কি বর্জন করেছে, সে ত্যাগ ঠিক নয়। সেটা প্রেমের লক্ষণই নয়। কেউ কি তার স্ত্রীকে বলে, "দেখ, একবার ১৮৯৩ সালে তোমার জ্বর হয়েছিল, তখন দশদিন আমি রাত জেগে তোমার সেবা করেছিলাম। ১৮৯৪ সালে অমুক দিন তোমার পা মচকে গিয়েছিল, তখন আমি তোমার কত সেবা করেছিলাম।" এ কি কেউ বলে? তা বলে না। প্রকৃত প্রেমের তা লক্ষণই নয়। প্রেমেতে ত্যাগের কথা মনে থাকে না।

প্রেমের ধর্মে ত্যাগ স্বাভাবিক রূপে আসে। কি ছেড়েছে বা কি ভেঙেছে, তা আর তখন মনে আসে না।

ব্রাহ্মেরা যদি খুঁজে বেড়ান, তাঁরা কি ছেড়েছেন, কি বর্জন করেছেন, কি পরিত্যাগ করেছেন— তাঁরা যদি বলেন যে, তাঁরা হিন্দুসমাজ ছেড়েছেন, তাঁরা আত্মীয় স্বজন ছেড়েছেন, পিতামাতাকে পরিত্যাগ করেছেন— তা হলে আমি তা বরদাস্ত করতে পারি না। সেটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, কখনই নয়। আমি ঈশ্বরে প্রাণ দিয়েছি, আমি তাঁতে আমার প্রেমকে অর্পণ করেছি, আমি তাঁর হয়েছি, আমি তাঁর চরণে আপনাকে অর্পণ করেছি, আমি তাঁর চরণে বসেছি— এই ভাব, এই ভাব যখন প্রাণে আসে, তখনই ঠিক হয়। কি ছেড়েছি, কি না ছেড়েছি তা আমি জানি না। আমি ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়েছি, তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে, আমি তাঁকে চাই, আর কিছু চাই না। তোমরা যদি আমাকে মার, তোমরা যদি আমার গলা টিপে ধর, কি করব, আমার তাঁ ভিন্ন আর গতি নাই। এই হ'ল ঠিক অবস্থা।

নইলে একটা উৎকট তীব্র অহমিকার জ্ঞান নিয়ে, একটা উৎকট আত্মম্ভরিতা নিয়ে, একটা উৎকট বৈরাগ্যের ভাব প্রাণে নিয়ে যে ব্রাহ্ম আস্ফালন করে যে, "আমি ছেড়েছি, আমি বর্জন করেছি, আমি ভেঙেছি", এ কথা যে বলে; যে বলে, "ওরা সব পাপী, ওরা সব অধার্মিক, ওরা জাতিভেদ মানে, ওরা দেবদেবী মানে, ওরা কুসংস্কারাপন্ন", এ কথা যে বলে, আমি সে দলের নই। সেরূপ ব্রাহ্মকে আমি ঘৃণা করি। ইহা ধর্মভাবের অনুকূল নয়।

হাঁ, সত্য বটে, তোমরা যদি তাঁকে চাও, তোমরা যদি তাঁতে প্রাণ দিতে চাও, তোমরা যদি তাঁর হাতে প্রাণ সমর্পণ করতে চাও, তোমরা

যদি তাঁর কৃপা প্রাণে অনুভব করতে চাও, তুমি যদি তাঁর সেবাতে আপনাকে অর্পণ করতে চাও, তুমি চল, আর কিছু তোমার ভাববার দরকার নেই। কে তোমার সঙ্গে এল, আর কে এল না, এ আর তোমার ভাববার প্রয়োজন নাই। তুমি বল, "যে যায় যাক, যে থাকে থাক, শুনে চলি তোমারই ডাক।" এই তোমার মন্ত্র হ'ক। তুমি তাঁকেই সার ব'লে জান। তাঁতেই তোমার চিত্ত স্থাপন কর, দেখি তিনি তোমায় রাখেন কি না। দেখি, তিনি তোমার ভার নেন কি না। দেখি, তুমি শান্তি পাও কি না। তুমি তাঁর জন্যে ব্যাকুল হও, আর কিছু ভাববার তোমার প্রয়োজন নাই। সাধুদের এই কথা, ধার্মিকদের এই কথা।

চল তবে, এই কথা শুনে চল। দেও তবে, তাঁর হাতে প্রাণ দেও। কি ভাঙবে আর কি থাকবে সে দিকে দৃষ্টি রেখ না; কে সঙ্গে এল আর কে এল না, তা ভেবে অস্থির হয়ো না। জগদীশ্বর কৃপা করুন, এই ধর্মভাব আমাদের প্রাণে আসুক। আমরা যেন ভাঙবার জন্যে ব্যস্ত না হই। ধর্মের গড়ার দিকে আমাদের মন হ'ক। তাতে যা ভাঙে আর যা গড়ে। তাঁর হাতে আমরা প্রাণ দিই।

১২ মাঘ ১৮২৫ শক। ১৯০৪ খ্রী

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মসমাজের কার্য ও তাহার প্রণালী

কিছুদিন হইল, এক দিবস কোনও স্থানে যাইবার জন্য রেলগাড়িতে উঠি। যে কামরায় আমি ছিলাম, তাহার পার্শ্বস্থ কামরায় দুইজন লোক ব্রাহ্মসমাজ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই আমাকে চিনেন না। একজন ব্রাহ্মসমাজের অনুকূলে, আর-একজন তাহার প্রতিকূলে তর্ক করিতেছেন। একজন বলিতেছেন, আর-একজন তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। তৃতীয় একটি লোক মুখে একখানি কাপড় চাপা দিয়া শুইয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে তিনি নিদ্রিত, কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যখন খুব তর্কবিতর্ক চলিতেছে, তখন তিনি উঠিয়া বলিলেন, "কি হইতেছে?" ব্রাহ্মসমাজের কথা হইতেছে শুনিয়া বলিলেন যে, যখন বৌদ্ধধর্ম এ দেশে প্রবল হইতে পারে নাই, তখন ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির আশা নাই; এই বলিয়া তিনি পুনরায় শয়ন করিলেন। তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আমি তাঁহার সহিত অনেক কথা কহিলাম।

বাস্তবিক যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা একটি গভীর প্রশ্ন যে, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রতিবাদ করিয়া কোনও ধর্ম এ দেশে থাকিতে পারিবে কি না? এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধধর্মও যেমন তিষ্ঠিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মধর্মও সেইরূপ থাকিতে পারিবে না। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের তুলনা সকল বিষয়ে চলে না। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব-সময়ে দেশের যে অবস্থা

ছিল, এখন সে অবস্থা নয়। এখন ইংরাজের রাজত্ব, এখন পাশ্চাত্য জ্ঞান দেশে প্রবেশ করিয়া কুসংস্কার ও অনুদারতার দুর্গ ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এক সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়াও বৌদ্ধধর্মের কেন দুর্দশা হইল, তাহা চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই। চীনদেশীয় পর্যটক ফা হিয়ান বলেন যে, তমলুক নগর সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ছিল, এবং ঐ নগরে তিনি সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তখন বৌদ্ধধর্মের কতই উন্নতি হইয়াছিল।

সে ধর্ম ভারতবর্ষ হইতে কেন চলিয়া গেল? কেহ কেহ বলেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকে ঐ ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, উচ্চজাতীয় লোক গ্রহণ করে নাই, সেইজন্য ঐ ধর্ম তিষ্ঠিতে পারিল না; ক্রমশ ঐ ধর্মে দুর্নীতি প্রবেশ করিল, এবং 'শ্রমণ' কথাটি পর্যন্ত ঘৃণার কথায় পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধগণ একটু একটু হিন্দুভাব গ্রহণ করিলেন, হিন্দুধর্মও বৌদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করতঃ বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আবার কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম স্বাভাবিক ভাবে প্রচারিত হয় নাই, সেইজন্য তিষ্ঠিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল, সন্ন্যাসীর ধর্ম জনসমাজের ধর্ম হইবে কেন? বৌদ্ধধর্মের ভারতবর্ষ হইতে স্থানান্তরিত হইবার এইরূপ নানা কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজন চলিয়া যাওয়াতে যে তাহার কার্য ও জীবনের আবশ্যকতা চলিয়া গেল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

প্রকৃতির সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কার্য আছে, সেই বিধাতার জগতে বাঁচে; যাহার কার্য নাই, সে বিনষ্ট হয়। যাহার কার্য যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সে থাকে; যাহার কার্য ফুরায়, তাহার জীবনের আবশ্যকতাও চলিয়া যায়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তের

প্রয়োজন নাই, সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায়। যতদিন পশু বা পক্ষীর শাবক আপনি আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হয়, ততদিন তাহাদের পিতামাতার স্নেহ প্রবল থাকে। জননীর স্তনদুগ্ধ ততদিন ও সেইভাবে থাকে যতদিন ও যে ভাবে সন্তানের জীবন-রক্ষার জন্য উহার প্রয়োজন হয়। আমের আঁটির কোষ কেমন কঠিন। যখন বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইল, তখন বীজকোষের আবশ্যকতা না থাকায় উহা নষ্ট হইয়া যায়। আর-একদিকে দেখ, যে অঙ্গ বা যে মানসিক শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবে, তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বরের জগতে অন্নজল গ্রহণ করিয়া যে নিষ্ক্রিয় থাকিবে, সেই বিনাশ পাইবে; যে কাজ করিবে সেই থাকিবে, পরমেশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন। যে এমন কিছু দিতেছে, যাহা অন্যের নিকট পাওয়া যায় না, সে নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে।

আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা এই সত্যের যাথার্থ্য হৃদয়ংগম করি। যে পরিমাণে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের কার্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য। তিনি নিরন্তরই এই কথা বলেন, "যে বহে আমার বোঝা, আমি তার বোঝা বই।" যে তাঁহার কার্য করিতেছে, তাহাকে তিনি রক্ষা করিবেনই করিবেন, এই বিশ্বাস যাঁহার আছে, "The Lord will provide", এই ভাব লইয়া যে তাঁহার কার্য করিতেছে, নিশ্চয়ই সে জীবিত থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের এই যে ব্রাহ্মসমাজ, জগতে ইহার কোনও কার্য আছে কি না? যাহা অপরের দ্বারা হইতেছে না, ব্রাহ্মসমাজের এমন কিছু কার্য আছে কি না? যদি থাকে, পরমেশ্বর ইহাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মসমাজ মানব-জীবনের একটি নূতন আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও জীবনে সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে

চলিতেছে, তাহা যদিও বলা না যাইতে পারে, আংশিক রূপে যে উহা হইতেছে, ইহা অবশ্যস্বীকার্য।

হৃদয়ে কেবল ধারণ করিলেই হয় না, সাধন করা আবশ্যক। ধারণা অর্থে সত্যকে উজ্জ্বল ভাবে বুঝা এবং সাধনা অর্থে কার্যে পরিণত করা। দুইই চাই। ধর্মরাজ্যে এমন মানুষ দেখা যায়, যাহার ধারণা হইয়াছে, কিন্তু সাধনা হয় নাই। সে লোক যে সম্পূর্ণ রূপে কার্য করিতেছে না, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হয়। চিত্র আঁকিবার পূর্বে চিত্রকর চিত্রের সমস্ত ভাবটি উজ্জ্বল রূপে ধারণা করেন, পরে মনোভাব বর্ণ দ্বারা পটে চিত্রিত করেন। যিনি মনোভাব পটে যত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে ভাল চিত্রকর হন। কেবল ধারণাশীল চিত্রকরের অবস্থা যেরূপ, সাধনহীন ধারণাশীল আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। গায়কের দৃষ্টান্তেও এ সত্যটির প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি গীতের স্বরলিপি করিতে পারেন কিন্তু কণ্ঠে আনিতে পারেন না, সে গায়ক যেমন, সত্যকে ধারণা করিতে পারে অথচ জীবনে পরিণত করিতে পারে না. সে সাধকও সেইরূপ। ইঞ্জিনিয়ারিং সকল বহি জানা আছে অথচ হাতে কলমে কিছুই আসে না, সে ইঞ্জিনিয়ার যেমন, সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া জীবনে যে আনিতে পারে না, সেও সেইরূপ। যে পর্যন্ত সত্য জীবনে না পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহার শোভা প্রকাশ পায় না। কৃষি ও রসায়ন বিদ্যা-পারদর্শী অথচ ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে পারে না, সে যেমন, সত্য মুখে বলিয়া কাজে যে না করে, সেও তেমনি অপদার্থ। ব্রাহ্মসমাজ আপন আদর্শকে যখন কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন তাঁহার জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে।

ব্রাহ্মসমাজ যে আদর্শ ধারণ করিয়া সাধনের চেষ্টা পাইতেছেন, সে আদর্শ কি? সমুদয় ধর্মই মানব-জীবনকে এক-একটি ভাব দিয়াছেন।

আমি দুইটি ধর্মের কথা বলিব। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম মানব-জীবনকে কি ভাবে দেখেন, আমি সেই কথার উল্লেখ করিব।

আমাদের দেশে মানব-জীবনকে কি ভাবে দেখা হয়? আমাদের দেশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেই মানব-জীবনকে একটি মায়া মোহের ব্যাপার মনে করেন। তাঁহারা মানব-জীবনকে ভবসাগর বলেন। ভব অর্থে জন্ম; জন্মই যত দুঃখের কারণ। সুতরাং মানব-জীবনকে তাঁহারা দুঃখ, বিড়ম্বনা ও বন্ধন বলিয়া বিবেচনা করেন। আমাদের দেশের একটি প্রধান মত পুনর্জন্ম। উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই তাঁহাদের ধর্মের উদ্দেশ্য। এই ভাব থাকিলে জীবনকে কেহ ভালবাসিতে পারে না। এইজন্য নিষ্ঠাবান্ আস্তিক হিন্দু মাত্রেই ভববন্ধনের জন্য দুঃখ করেন। যাঁহারা ইংরাজি পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই ভাব বুঝিতে পারেন না; কিন্তু ইংরাজি-অনভিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের মনের ভাব এইরূপ। আমার একজন আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন পাপ। এ ভাব হৃদয়ে যদি থাকে তবে মানব জীবনের উপর ঘৃণা হয়। এই ত গেল আমাদের দেশের ভাব।

খ্রীষ্টীয় ধর্মের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, আজিকালি এমন অনেক উদারচেতা লোক আছেন, যাঁহাদের মত ঠিক ব্রাহ্মধর্মের মত। তাঁহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টান বলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের আদর্শই তাঁহারা হৃদয়ে ধরিয়াছেন। তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের মত এই যে, মানব-জীবন এক সময়ে নির্দোষ ছিল, কিন্তু কোনও কারণে উহা পতিত ও পাপময় হইয়াছে। এই পাপময় জীবন হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিধাতার নির্দিষ্ট মুক্তির উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। মনুষ্যের সকলই অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, নির্দিষ্ট মুক্তির উপায় ছাড়িয়া প্রার্থনা

করিলেও ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইতে হয়। এইজন্য মধ্যবর্তিতা, গুরুবাদ, অবতারবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা মানুষ যখন আপনাকে হেয় ও ঈশ্বর হইতে দূরীভূত মনে করে, তখন যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী তাঁহাদের আশ্রয় করা ব্যতীত আর উপায় কি ?

ব্রাহ্মধর্ম কি আদর্শ উপস্থিত করিতেছেন ? ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন, এই যে পাপপুণ্যময়, সুখদুঃখময় মানব-জীবন, ইহা বিধাতার লীলাস্থল। মানব-জীবন অতি পবিত্র বস্তু, ভগবান্ স্বয়ং ইহার ভিতর কার্য করিতেছেন। আমাদের মনে হয় বটে যে, আমাদের এই যে পাপতাপ, ইহা ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বর দূরে নহেন। এমন পাপী বা মহাপাতকী কেহ নাই, যাহার নিকট হইতে ঈশ্বর দূরে আছেন। আমাদের জীবনের সহিত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। প্রতিজনের হৃদয়ে, প্রতিজনের ঘরে, প্রতি মুহূর্তে তিনি প্রকাশিত। এমন স্থান নাই, এমন সময় নাই, যে স্থানে বা যে সময়ে তিনি প্রকাশিত নহেন।

ইহা কল্পনার কথা নহে, বিজ্ঞানসম্মত কথা। প্রত্যেক জড়বস্তু যেমন আকাশে অবস্থিত, আকাশ ছাড়িয়া যেমন বাহিরের বস্তু ভাবা যায় না, সেইরূপ আত্মার পরমাকাশ সেই পরমাত্মা। তিনি নিরন্তরই আমাদের আলিঙ্গন, বেষ্টন, ধারণ করিয়া আছেন। তবে আমরা দেখি না কেন ? ইহারও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সূর্যের আলোকের মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি. সূর্যালোক আমাদিগকে আলিঙ্গন ও বেষ্টন করিয়া আছে, অথচ কি আমাদের সব সময়ে মনে থাকে যে, সূর্যালোকের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি ? পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন কে কার্য করিতে পারে ? তাঁহার সহিত আমাদের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ যে, পাপিষ্ঠ ঘোর নারকী যে, তাহাকেও তিনি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন, সাধ্য নাই যে তাঁহাকে

কেহ ছাড়িয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম এই কথা প্রচার করিতেছেন যে, পাপী হও নারকী হও, পরমকরুণাময় পরমেশ্বর তোমাকে প্রেমবাহু-পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার জীবনকে তাঁহার লীলাক্ষেত্র করিয়াছেন।

দেখ ব্রাহ্মধর্ম মানব-জীবনের কি মহত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন! ব্রাহ্মধর্ম বলিতেছেন যে, মানব-জীবন ঘৃণার বস্তু নহে, বিধাতার লীলাস্থল। আর তিনি কি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন, মানব তাঁহার পুত্র ও সহচর। তিনি এমন অধিকার মানবকে দিয়াছেন। নিজ আনন্দের অংশী করিবার জন্য তিনি মানবাত্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যে জ্ঞানানন্দ, সুন্দর জগতের সৌন্দর্য জানিয়া যে আনন্দ, এই জ্ঞানানন্দের কিঞ্চিৎ আমাকে দিবেন বলিয়া আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের নিগূঢ় প্রদেশে বিধাতার চিন্তার পথ যখন অবধারণ করা যায়, তখন মনে কি গভীর আনন্দের উদয় হয়! আকাশের সমুদয় গ্রহ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া জ্যোতির্বিদ হর্শেল তাই বলিয়াছিলেন, "O God, I think thy thoughts after thee"— অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তোমার পশ্চাতে আমি তোমার চিন্তার চিন্তা করিয়া থাকি। যখন পরমেশ্বরের চিন্তার পথ অনুসন্ধান করি, তখন পৃথিবীর পাপ নীচতা দূরে পলায়ন করে। কে বলে, বিজ্ঞান ধর্মের বিবাদী? বিজ্ঞান বিধাতার লীলাক্ষেত্র, বিজ্ঞান বিধাতার কারখানা। বিজ্ঞান দিয়া তিনি আমাদিগকে জ্ঞানানন্দ পান করিতে বলেন।

তাঁর প্রেমধারাও নিরন্তর প্রবাহিত। সামান্য কীটও তাঁহার প্রেমে বঞ্চিত নয়। কত প্রেমব্যয়ে জগত নির্মিত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, রাঁধুনী যদি ভালবাসিয়া মশলা দেয় তবেই রান্না ভাল হয়, চিত্রকর যদি ভালবাসিয়া রঙ দেয় তবেই ভাল

চিত্র হয়। প্রেম খরচ না হইলে ফুল কি কখন এত সুন্দর হইত? জড়েও তাঁহার প্রেমধারা প্রবাহিত। ছেলেপিলে আমোদ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে হয়, খুব যাউক। লোকের সুখ দেখিলে আমরা সুখী হই। আজি ছেলেরা খাইতেছিল দেখিয়া কি সুখ হইয়াছিল! তেমনি আমরা যত সুখ ভোগ করি, তিনি বলেন, "আহা! আরও সুখ ভোগ কর, আরও আনন্দ পান কর।" আপনার প্রেমে তিনি আপনি পাগল এবং বিভোর। মানুষকে সদাই বলিতেছেন, "জগৎকে প্রেম করিয়া আনন্দ ভোগ কর এবং আমার প্রেমানন্দের অংশী হও।"

সেবানন্দেও তিনি আমাদিগকে অংশী করিতে ইচ্ছুক। জগৎকে যে কেবল তিনি প্রেম করেন এমন নহে, তাঁহার মত জগতের পরিচারিকা বা সেবিকা আর কে আছে? গাছের ডালে পাখির ছানা থাকে, মাকে উড়াইয়া আনিয়া কে তাহার মুখে আহার দেওয়ায়? সন্তানের পরিচর্যা করিবার সুখ দিয়া, সন্তানের দুঃখ হরণ করিবার অধিকার দিয়া তিনি কি অপূর্ব আনন্দ সম্ভোগের বিধান করিয়া দিয়াছেন! সেবার অধিকার আমাদের, অন্যায় নিবারণ ও দুঃখ দূরীকরণ করিবার অধিকার আমাদের।

তিনি আমাদিগকে জ্ঞান, প্রেম ও সেবানন্দের অধিকারী করিয়াছেন, সেইজন্যই আমরা তাঁহার পুত্র, আর সকল জীব নীচ দাস ও আজ্ঞাবহ। আপন স্বাধীন ভাবের কণিকা মাত্র মানবকে দিয়া তিনি তাহাকে আপনার সহচর করিয়াছেন। সঙ্গে রাখিবার জন্য মানবের সৃষ্টি; তাঁহার সঙ্গে থাকিব, সঙ্গে বেড়াইব, সঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিব বলিয়া আমাদের জন্ম হইয়াছে। সখা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম বাঁচিয়া থাক্, প্রভু আমাদের সখা ও সহচর। মানব-জীবন কত উন্নত ও মহৎ। মানব-জীবনের এই মহৎ ভাব যে হৃদয়ংগম করিয়াছে, তার

কি আর পাপ করিতে মতি থাকে? আমি তাঁর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞান, প্রেমে প্রেম এবং সেবায় সেবা মিশাইয়া দিব।

এ কি উন্নত আদর্শ! এই আদর্শ কেবল ধারণ করিলে চলিবে না, কার্যে পরিণত করিতে হইবে। জ্ঞান, প্রেম ও সেবা, তিনকেই মিলিত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য, আংশিক ধর্মজীবন লাভ আমাদের লক্ষ্য নহে। ধর্মজীবনের অন্তর্গত সকলই জগতে যত জ্ঞানচর্চা, সাধুতা ও প্রেম আছে, আমাদের জীবনক্ষেত্রে সে সমস্তকেই আনিয়া ফেলিতে হইবে। এ মহদ্‌ভাব সাধন করা কঠিন। ব্রাহ্মসমাজের এই বিশেষ লক্ষ্য যতদিন আছে, ততদিন কার সাধ্য ইহাকে বিনাশ করে? ব্রাহ্মসমাজই এই দেশের উদ্ধার সাধন করিবে।

আমরা ব্রাহ্মধর্মকে আংশিক করিয়া ফেলিয়াছি, উহার পূর্ণাদর্শ আমাদিগকে এখন ভাল করিয়া ধারণ ও কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোনও প্রকার আংশিক সাধন আমাদের লক্ষ্য নহে। সমুদয় আংশিক সাধন বিনাশ করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাধন ও অধ্যাত্মযোগ স্থাপনের চেষ্টাই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ। নরনারী প্রেমোচ্ছ্বাসে মত্ত হইবে, পরোপকার বা জ্ঞানে তাহাদের রুচি থাকিবে না, নীতি পবিত্রতার তাহারা আদর করিবে না, উচ্ছ্বাস ও মত্ততা-পূর্ণ এরূপ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী প্রস্তুত করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে। যে ভাবের মত্ততা বিবেকের উজ্জ্বলতার অভাব, তাহার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রমুক্ত, ব্রাহ্মসমাজ তাহার স্থান নহে। জ্ঞানে মগ্ন ও আত্মতৃপ্ত, যাহারা কাছে যায় দয়া করিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেন, এরূপ লোক প্রস্তুত করা ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য নহে। শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শত শত সন্ন্যাসী-আশ্রম এই জাতীয় লোক প্রস্তুত করিবার জন্য বর্তমান রহিয়াছে। কার্যে ব্যস্ত, উপাসনার সময় নাই, নীরস ও প্রেমবিহীন চরিত্র সৃষ্টি করিতে কি ব্রাহ্মধর্ম

আসিয়াছেন? কখনই না। ঈশ্বরবিহীন প্রেম ও আধ্যাত্মিকতাবিহীন জীবন গঠন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই।

পশ্চিমে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা এই জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর-সিংহাসন-চ্যুত বিজ্ঞান, ঈশ্বর-সিংহাসন-চ্যুত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ব্রাহ্মসমাজ আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। মানব-হৃদয়াসনে, সত্য জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর পরমেশ্বরের আসন দৃঢ় রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত। চিরাগত সংস্কারমূলক অন্ধ বিশ্বাস হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে দেখিয়া চিন্তাশীল মনে নিরাশা আসিয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মধর্ম ঈশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া, জ্ঞান, প্রেম ও সেবা হস্তে লইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। সংগ্রাম দুরূহ বটে, কিন্তু এই সংগ্রামই ব্রাহ্মধর্মের ব্রত। ভারতের প্রাচীন বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে, এই সময়ে ভারতে পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নাম প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কার্য।

আমাদের এই আদর্শ যেমন স্বাভাবিক ও পূর্ণ, প্রণালীও তেমনি স্বাভাবিক ও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। জগৎকে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, আমরা কখনও জ্ঞানতত্ত্বালোচনায়, কখনও বা প্রেমোন্মত্ত নামকীর্তনে, কখনও বা দেহ-মন-প্রাণ দিয়া মানবের সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্গতি দূরীকরণে প্রবৃত্ত। পূর্ণ ও স্বাভাবিক ভাবে যে আমরা ঈশ্বরচরণে বাস করি, ইহা আমাদিগকে জগদ্‌বাসীর নিকট দেখাইতে হইবে। সকল প্রকার সংস্কার, সামাজিক উন্নতি ও দুর্নীতি নিবারণ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা, দেশোন্নতির যে উচ্চ আদর্শের অন্তর্গত, আমরা আপনা-আপনি তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ব্রাহ্মদিগকে এখন আর স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কার প্রচার করিতে হয় না। ব্রাহ্মসমাজের সকল

সামাজিক সংস্কার— বালবিধবার দুঃখহরণ, নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহবারণ, সকল প্রকার দুর্নীতি-উন্মূলন-চেষ্টা, দেশের হিতসাধন, সকলই আমাদের মূল আদর্শের অন্তর্গত। জনসমাজ এই আদর্শ সাধনের উপায়। এই আদর্শ সাধন করিবার এবং এই আদর্শ সাধনে সাহায্য করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি। জীবনের এই লক্ষ্য সাধনের পথে ব্রাহ্মসমাজ সহায়তা করিবেন, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত বলিয়াই নরনারী এখানে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

ব্রহ্মবিনিঃসৃত সত্যবীজ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ-রূপ কোষের প্রয়োজন। পরমেশ্বর যে জীবন্ত সত্য দিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের নরনারী মিলিয়া তাহা ধারণ, সাধন ও উজ্জ্বল করেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। ব্রাহ্মসমাজের নরনারী! বিশ্বাস কর, বিধাতা ঐ তোমাদের সমাজ গড়িতেছেন। এই গঠনকার্যে তোমরা সহায় হও। যাহার দেহ মনে বিধাতা যে শক্তি দিয়াছেন, বিধাতার অভিপ্রায় যে, তিনি তাহাই উক্ত গঠনকার্যের সহায়তায় প্রয়োগ করেন। আপনি আপনার আবরণ হইও না। যখন নরনারীর হৃদয়ে যাহা আছে তাহা ফুটিয়া উঠিবে, তখন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ পূর্ণ হইবে, গঠনও সুচারু রূপ হইবে। যাহার যাহা আছে, তাহা দশগুণ বৃদ্ধি পাইবে। যতদিন দেখিবেন যে প্রাণের ভাল ভাল সামগ্রী প্রভুর কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে না, ততদিন জানিবেন যে ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইতেছে না।

সুচারু রূপে এই সত্যটি ধারণা করিতে গেলে আরও কয়েকটি সত্য আসিয়া পড়িবে। তন্মধ্যে প্রধান সত্য, স্বাধীনতা। সকলকেই স্বাধীনতা দিতে হইবে। এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যেন কাহারও পথে কেহ আবরণ না হন। এই সত্য চিন্তা করিতে গিয়া দেখি যে, ঈশ্বরের অনুগত হইতে হইলে সাধারণতন্ত্রের আবশ্যকতা। যে সমাজের ব্যক্তি-

বিশেষ বলেন, আমি জ্বলি, আর তোমরা নিবিয়া থাক, সে সমাজ বিধাতার ইচ্ছানুগত নহে। কোন্ তারা অন্য তারাকে বলিতে পারে, তুমি আকাশে জ্বলিতে পাইবে না? এখানে এমন কেহই আসেন নাই ঈশ্বর যাহাকে আনেন নাই। স্বার্থসাধনোদ্দেশে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার কথা বলিতেছি না। ঈশ্বর-লাভের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই বিষয় উল্লেখ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমার হাত ধরিয়া এখানে আনিয়াছেন, এবং আমাকে কাজ করাইতেছেন। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমার যে ভাইটিকে কেহ জানে না, ঈশ্বর তাঁহারও হাত ধরিয়া আনিয়াছেন ও তাঁহাকে কাজ করাইতেছেন। ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে, আমরা সকলেই তাঁহার জন্য জ্বলিব, সকল বাতি মিলিত হইয়া এক বৃহৎ মশালে পরিণত হইব। ছোট ছোট আলোক মিলিত হইয়া এক বৃহৎ আলোক রূপে আমরা ব্রহ্মাকাশে জ্বলিতে থাকিবে, তবে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। বিধাতার হস্তে ব্রাহ্মসমাজ। নরনারী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। কে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে? আমরা জ্বালিয়াছি, আমাদের কথায় জ্বলিয়াছে— এ কথা কে বলিবে? ঈশ্বর এই আগুন জ্বালিয়াছেন। এক ঈশ্বর সকল মঙ্গল ভাবের আধার।

বিধাতার সমাজ সাধারণতন্ত্র। ইহার অর্থ এ নয় যে, বিধাতার সমাজে উচ্চ নীচ নাই। ইহার অর্থ এ নয় যে, বার বৎসরের ছেলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মের গলা ধরিয়া তাঁহার সহিত সমবয়স্কের ন্যায় ব্যবহার করিবে। মর্যাদা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি সকলই চাই। তোমরা দেখাও যে, তোমরা যেমন সাধুভক্তি করিতে পার, এমন আর কেহই পারে না। যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্যকে বল যে, এখানে সকলে এস, আমাদের প্রাণে, সমাজে বাস কর। সাধুভক্তির দৃষ্টান্ত, বিনয় কি আমাদের মধ্যে থাকিবে না?

যাহার যাহা আছে, দাও, পরিশ্রম কর। এমন সুযোগ আর পাইবে না। যাঁহার রসনা কীর্তন করিতে চায়, তিনি কীর্তনের লহরী তুলুন; যাঁহার লিখিবার শক্তি আছে, তাঁহার উজ্জ্বল লেখনী অগ্নিময় অক্ষরে প্রভুর যশোগান করুক; যাঁহার প্রেম আছে, তিনি সকলকে আলিঙ্গন করুন। এই প্রণালীতে সকলের শক্তির ব্যবহার হইবে, সব যন্ত্র এক সুরে বাজিবে। কি সুন্দর দৃশ্য! স্মরণে আনন্দ উথলিয়া উঠে। কে ইহার পথে বিঘ্ন রোপণ করে? হায়! হায়! যখন জগতে ঈশ্বরের নাম প্রচার করার এত দরকার, তখন কি না গৃহবিবাদ, অনাত্মীয়তা? কি পরিতাপের ব্যাপার! আজ যদি গৃহ-বিসম্বাদ না থাকিত, তবে কার সাধ্য আমাদিগকে উপহাস করে?

সত্যের আদর কর, ঈশ্বরকে মাথায় রাখ। আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরের সেবায় ভোর হইয়া যাও। তখন আগুন উঠিবে। কার সঙ্গে আমরা সুর বাঁধিব? ঐক্যতান-বাদনে সকল যন্ত্রই একটি যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা হয়। ঈশ্বর সেই যন্ত্র। এস সকলে তাঁহার সঙ্গে আপনাদিগকে বাঁধিয়া ব্রহ্ম-নাম ঝংকার করি। এ দৃশ্য কি তোমরা দেখাইবে না, আনিবে না? আমি ব্রহ্মনাম ঝংকার করিতেছি না। আমাকে ধিক্কার দিই, আমি বাজাইয়াছিলাম, তাই ভাল বাজে নাই, জগৎ মাতে নাই, ভালবাসে নাই। প্রভু একবার বাজান, দেখ জগৎ মাতে কিনা। কি তাঁর আদর্শ! আর আমরা কোথায়! প্রেমময় পবিত্র আমাদের উপাস্য দেবতা, আর তাঁহার উপাসক হইয়া আমরা কি অপ্রেমিক ও মলিন! লজ্জা বোধ কর। এস আজ প্রতিজ্ঞা করি, ঈশ্বরের হাতে বাজিব, বাজিয়া জগৎকে একবার প্রেমের সংগীত শুনাইব। ব্রহ্মনাম প্রচারের জন্য নবযুগ অবতারণের জন্য উৎসাহিত হও। এই প্রার্থনা প্রভু পূর্ণ করুন।

১৩ মাঘ ১৮০৯ শক। ১৮৮৮ খ্রী

'মাঘোৎসবের বক্তৃতা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৪ শক, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসে। বিভিন্ন বৎসরের মাঘোৎসবে শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে-সকল একক বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নয়টি প্রথম সংস্করণে সংকলিত হইয়াছিল।

উহার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী আরও যে কয়টি বক্তৃতা সংগ্রহ করা গিয়াছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলি সংগৃহীত হইল। যে-সকল বক্তৃতা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, তাহার একটি যথাসম্ভব তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

শক	খ্রীষ্টাব্দ		
১৮০৩ ।	১৮৮২	৯ মাঘ	ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনা
		১৩ মাঘ	ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ক্ষেত্রে প্রচার-প্রণালী
১৮১০ ।	১৮৮৯	৭ মাঘ	জীবনের অন্ন
১৮১১ ।	১৮৯০	১৩ মাঘ	সংস্কারের দায়িত্ব
১৮১৩ ।	১৭৯২	৬ মাঘ	মানব-জীবনে দেব ও মানব
১৮১৪ ।	১৮৯৩	১২ মাঘ	যুগধর্মের অভ্যুদয়
১৮২৬ ।	২৯০৫	১৩ মাঘ	ধর্মের ত্রিবিধ কার্য
১৮২৭ ।	১৯০৬	১৩ মাঘ	নবযুগের সূচনা
১৮২৮ ।	১৯০৭	১৪ মাঘ	ধর্মসমাজ ও তাহার কার্য
১৮৩০ ।	১৯০৯	১৩ মাঘ	ধর্ম জাতীয় ও সার্বভৌমিক

১৮৩১ শক, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষে শিবনাথ আরও দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ' এবং 'ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজকে কি দিয়াছেন'

-শীর্ষক সেই দুইটি বক্তৃতা "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র" নামে সেই বৎসরই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বক্তৃতা দুইটির বিষয়বস্তু বর্তমান গ্রন্থের বহির্ভূত বলিয়া উহা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল না।